ভারত পরিচয়



ডক্টর জিতেন্দ্র ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে যাবতীয়
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের **নবম শ্রেণীর** পাঠ্য

[*Vide, Circular D. O. No. 2/50/73 Dated. 19. 7. 73*]

ভারত পরিচয়

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

ডক্টর জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম. এ. (ট্রিপল), পি. এইচ-ডি.

অধ্যক্ষ, কৈবল্যদায়িনী কলেজ, মেদিনীপুর

প্রণীত

রত্না পাবলিশার্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৭২ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামলেন্দু দাশ, বি. এস-সি.
রুবী পাবলিশার্স
১৭২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
১৯৭৪

মুদ্রাকর :
শ্রীদুর্গাদাস পাণ্ডা, এম. এ., বি. টি.
দেবাশীষ প্রেস
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য : পাচ টাকা ষাট পয়সা

অবতরণিকা

বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নবমশ্রেণীর বিদ্যার্থীগণের জন্য এক নূতন পাঠ্যক্রম নির্ধারিত করিয়াছেন। এই নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে 'ভারত পরিচয়' লিখিত হইয়াছে। নূতন পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের পঠন-পাঠনে প্রচলিত পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয় এবং রাজবংশাবলীর তালিকা রচনার গতানুগতিক ধারা ও কালের পারম্পর্য ইহাতে বিন্যস্ত করা হয় নাই। কোন একটি যুগের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনার পরিবেশে সেই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সহিত বিদ্যার্থীগণকে পরিচিত করাইবার প্রয়াস ইহাতে রহিয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থরচনায় আত্মম্ভরী পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই। এজন্য কোন গবেষণার প্রচেষ্টা বা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের সুযোগ এই গ্রন্থে গ্রহণ করা হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকবৃন্দ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার সবগুলিকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। আমার উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রয়োজন সিদ্ধি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সহায়তা। সহৃদয় সামাজিকের বিবেচনায় তাহা সফল হইলে কৃত-কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থের উৎকর্ষসাধনের জন্য সহকর্মী শিক্ষাব্রতীগণের নিকট হইতে সকল প্রকার পরামর্শ লাভের আশা করি।

নিবেদনমিতি

জিতেন্দ্র কুমার ঘোষ

১০এ শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট, কলি—৪

২৪-১২-৭৩

SYLLABUS FOR CLASS IX

HISTORY OF INDIA UPTO THE MIDDLE OF THE 19th CENTURY

I. Geography: Its influence on the country, its people and History. Elements of India's population—Evolution of composite culture—Fundamental unity.

II. Source material: Ancient, medieval and modern period.

III. Antiquity of India and her civilisation: Indus Valley Civilisation. Coming of the Aryans, Civilisation and religion as revealed in the Vedas and the Upanishads.

IV. Growth of Jainism and Buddhism.

V. (i) Foreign Invasions: Persian, Greek (Macedonian and Bactrian) Scythian (Saka-Parthians, Kusanas and Huns).
(ii) General nature of resistance. Impact of foreign inroads on the social and cultural life. Re-disposition of Indian Society: Rise of the Rajputs.

VI. Bid towards Imperial Unity: its different phases: Under (Magadha: (i) From Bimbisara to Asoka.
(ii) Chandragupta I to Skandagupta.
Under Kanauj: From Pusyabhuti Harsha to Pratihara Mahendrapala.
Under Gauda: From Sasanka to Devapala.

VII. Society and Culture (in North and South India) from the 4th Century B.C. to the 14th Century A.D.

VIII. Indian Culture and Civilization beyond India.

IX. (a) Rise, growth and decline of Turco-Afghan Power.
(b) Rise, growth and decline of Mughal Power in India.

X. Impact of Mahomedan rule on social and economic life, on art, architecture, literature, language and religion. Religious reformers.

XI. (a) The Mahrattas: From Sivaji to Baji Rao-II (in outline).
(b) The Sikhs: from Nanaka's successors to Ranjit Singh (in outline).

XII Advent of the Europeans: Their rivalries: Emergence of the English—From Trade to Political domination.

XIII. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie (References to wars with the Sikhs, in outline).

XIV. (i) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Ripon and Dalhousie.
(ii) Social, cultural and religious reforms under Indian initiative. Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, Brahma Samaj leader. Iswar Chandra Vidyasagar, Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj. Dayananda, Ramkrishna Paramhansa.

XV. Reaction against British rule. Background of the Mutiny and Revolt of 1857—Causes, Progress, Nature. Its outcome. End of the rule of the East India Company. India on the threshold of a new era.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় | ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ

পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষের চরিত্র, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা তাহার পরিবেশের দ্বারা বহুলাংশে নিয়মিত হয়। এই পরিবেশ প্রধানতঃ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর গড়িয়া উঠে। সুতরাং মানুষ যে ইতিহাস রচনা করে তাহার উপরে তাহার দেশের প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার সময় ভারত নামে পরিচিত দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও তাহার ভূ-প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়া লইতে হয়।

সীমানা

ভারতের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে। হিমালয় পর্বতমালা ইহার উত্তর সীমা রচনা করিয়াছে। উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা, পূর্বে আরাকান পর্বত এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগর ভারতবর্ষকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। তবে স্বতন্ত্র হইলেও ভারতবর্ষ এশিয়ার মূল ভূখণ্ড হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। উত্তর পশ্চিমের গিরিপথগুলির দ্বারা মধ্য প্রাচ্য, হিমালয়ের গিরিপথে তিব্বত এবং পূর্ব দিকের পর্বতগুলির অবকাশে ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব এশিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগ রহিয়াছে।

ভারতের ভূ-প্রকৃতি বিচিত্র। কোথাও দুর্গম তুষার মৌলি পর্বতমালা, কোথাও দুস্তর মরুপ্রান্তর, কোথাও সুদীর্ঘ নদী উপনদী, কোথাও বিশাল অরণ্য, কোথাও বা মালভূমি এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়াছে। আর এই প্রাকৃতিক ব্যবধানের আড়াল লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে নানা সমাজ নানা রাজ্য।

ভৌগোলিক বিভাগ

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ভারতবর্ষ পাঁচটি সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত ১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা যমুনা-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ নদী বিধৌত সমতলভূমি, (৩) মধ্যভারতের মালভূমি, (৪) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (৫) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল।

ভারতভূমির জনসমাজ ও ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব ঃ

হিমালয়ের দান ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য

উত্তরে হিমালয় যেমন ভারতের সীমান্তকে সুদৃঢ় করিয়াছে, তেমনি হিমালয় হইতে নির্গত জলধারা উত্তরাপথকে অজস্র শস্য সম্পদের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। কৃষি প্রধান ভারতভূমিতে বারিপাতের পরিমাণ ও প্রকৃতি হিমালয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। সুপ্রচুর বারিপাতে পুষ্ট হইয়া ভারত ভূমি অরণ্য ও কৃষি সম্পদে ধনী হইয়াছে। প্রকৃতির আনুকূল্যে উর্বর ভূমিতে অন্ন সংস্থান সহজ হওয়ায় এদেশের অধিবাসী কঠোর এবং নিরন্তর কায়িক শ্রমের

দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া মানসিক ক্ষেত্রে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে অতিপ্রাচীন কালেই এদেশে ধর্ম-সাহিত্য ও শিল্পের সুচারু বিকাশ হইয়াছিল।

সম্পদের সুফল

নিসর্গের বিচিত্র ও নিরাবরণ রূপ, উদার উন্মুক্ত আকাশ এ দেশের কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তুষারমৌলি নাগাধিরাজ হিমালয় ভারতীয় ঋষির ধ্যানলোক, কবির কল্পনার স্বর্গ এবং পৌরাণিক কাহিনীর উৎস হইয়াছে।

ভৌগোলিক বিচারে ভারতবর্ষ একাধিক অঞ্চলে বিভক্ত হইলেও ইতিহাসের পটভূমিতে ভারত দুই অংশে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল এই দুই অংশ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উত্তরে হিমালয়ের কোল হইতে সিন্ধু গঙ্গা যমুনার ধারা বিধৌত সমতলভূমি এবং মধ্যভারতের

বিন্ধ্যাচলের গুরুত্ব

মালভূমি লইয়া উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত। আর বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণবর্তী ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র অংশ লইয়া দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। বিন্ধ্যাচল আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যেন বিভেদের প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর। তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত ভারতভূমির সুদীর্ঘ উপকূল রেখার নানা স্থানে বাণিজ্য বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদূর দক্ষিণের অধিবাসীরা সাগর পাড়ি দিয়া দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে, ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন

সমুদ্রের প্রভাব :
বন্দর ও বাণিজ্য সমৃদ্ধি

করিয়াছে, সেখানে ছড়াইয়া দিয়াছে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প। সমুদ্র পথেই অতি প্রাচীনকালে রোম, আফ্রিকার উপকূলবর্তী দেশ সমূহ, সিংহল, চম্পা, কম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য বিনিময় সম্ভব হইয়াছিল। সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া লইয়া এক বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে নৌবাহিনী গঠন করিতে হইয়াছিল। চোল রাজেরা নৌবলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এক বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নদীবহুল বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ নৌসাধনোন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসের মধ্যযুগেও মারাঠাদের শক্তিশালী নৌবহর ভারতের পশ্চিম উপকূল রক্ষা করিত। সমুদ্র যেমন ভারতকে ঘিরিয়া স্বাভাবিক সুরক্ষার সুযোগ দিয়াছে, তেমনি সমুদ্রপথেই ইউরোপবাসী বণিকেরা এদেশে আসিয়াছিল এবং কালক্রমে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল।

সমুদ্র বেষ্টিত হওয়ায় দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণ যেমন সমুদ্রযাত্রা-প্রবণ হইয়া উঠিয়া

সমুদ্র ও গিরিপথে
বিদেশের সঙ্গে
যোগাযোগ

ছিল, উত্তর ভারতের জন সাধারণ তেমনই স্থলপথে বাণিজ্য বিস্তারে পটুত্বলাভ করিয়াছিল। উত্তর পশ্চিমের গিরিপথগুলি এশিয়ার পশ্চিম ভূখণ্ডের দেশগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। এই পথেই ভারতে কতশত বিদেশী আসিয়া ভারতের জনধারাকে পুষ্ট

করিয়াছে। আবার এই পথেই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে, চীন এবং তিব্বতে বিস্তৃত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার খোটান, ইয়ার খন্দ, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে



ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। হিমালয়ের গিরিপথেই ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বত ও চীন দেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

চারিদিকে সমুদ্র পর্বতে বেষ্টিত হওয়ায় ভারতবর্ষ একদিকে যেমন একটি নিজস্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তেমনি স্থল ও জলের সরণি বাহিয়া বিশ্বের সহিত সংস্কৃতি বিনিময়ের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির অজস্র অকৃপণ দান ভারতকে যেমন সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি সম্পদলোভী মানুষের দলকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহারা ভারতের ইতিহাসে কত আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরিণামে ভারতীয় জনধারায় লীন হইয়া ভারতবর্ষকে মহামানবের মিলনতীর্থে পরিণত করিয়াছে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ফলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

এই বিরাট উপমহাদেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাবে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রাও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও উত্তুঙ্গ পর্বত এবং নিবিড় অরণ্যানী। এই দুর্গম অঞ্চলগুলি আদিম বন্য জাতির আবাস। তাহাদের জীবিকা শিকার, পশুপালন ও দস্যুবৃত্তি। সভ্য জনপদের মানব সমাজের সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর দুস্তর ব্যবধান। কোথাও নদনদী বিধৌত সুফলা সমতল ভূমি। এখানে কৃষি-শিল্প বাণিজ্য সহায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ধিষ্ণু জনপদ ও নগর সভ্যতা। সমুদ্র উপকূলে, বন্দরে বন্দরে ভিড় করিয়াছে কত বিদেশী জাতির মানুষ। কেহ বাণিজ্য, কেহ বা রাজ্য সন্ধানে আসিয়াছে। বাণিজ্য লক্ষ্মীর বরে উপকূলবাসী সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

আঞ্চলিক বিভাগ রাজনৈতিক ঐক্যের অন্তরায়

কিন্তু ভারতের নদনদী পর্বতের আধিক্য এই দেশে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে। নদী পর্বতদ্বারা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে ও ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ভৌগোলিক কারণে উৎপন্ন দৃঢ় ঐক্যবোধের অভাবের জন্যই ভারতবর্ষ বারে বারে বিদেশীর আক্রমণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা কখনই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করেন নাই।

ভারতের জনসমাজঃ ভারতের জনসমষ্টি কোন একটি বিশেষ জাতি বা নরগোষ্ঠীর বংশসম্ভূত নহে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরিক মিলনে ও মিশ্রণে ভারতের জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজা শঙ্কর গুহের মতে ছয়টি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর দৈহিক ও মানসিক উত্তরাধিকার বর্তমান ভারতবাসী বহন করিতেছে। এই ছয়টি নরগোষ্ঠী হইল—


নেগ্রিটো

(১) নেগ্রিটো—এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাদের গায়ের বর্ণ কালো, মাথার চুল পশমের মত কুঞ্চিত, নাক চেপটা এবং গড়ন খর্বাকার। বর্তমানে অবশ্য এই জাতির বিশুদ্ধ কোন নমুনা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

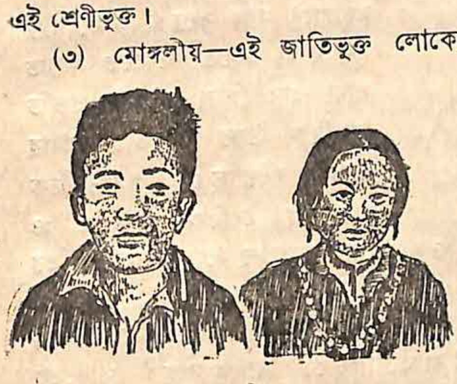
কেবলমাত্র আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, আসামের আঙ্গামী নাগা গোষ্ঠীর মধ্যে, দাক্ষিণাত্যের ইরুম্বা, কুরুম্বা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো জাতির বংশধরগণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

(২) আদি-অষ্ট্রেলীয়—অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সদৃশ এই জাতির বংশধর-গণকে ভারতের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য ভারতের কোল, ভীল, মুণ্ডা, দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুব, যেরুব প্রভৃতি লোকেরা, এই নরগোষ্ঠীর বংশধর। বিষ্ণুপুরাণে বর্নিত নিষাদ জাতি ইহারাই। রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতালেরা ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষীরা এই শ্রেণীভুক্ত।



আদি অষ্ট্রেলীয়

(৩) মোঙ্গলীয়—এই জাতিভুক্ত লোকেদের প্রধানতঃ চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, সিকিম ও ভুটানে দেখা যায়। ইহাদের গায়ের বর্ণ পীত, চোখ তেরছা, নাক চেপটা। হিমালয় এবং গারো পাহাড়ে ইহাদের বসবাস। আসামের নাগারা এই শ্রেণীভুক্ত।



মোঙ্গলীয়

(৪) ভূমধ্য অঞ্চলীয়—ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সদৃশ দীর্ঘ মুণ্ড এক জাতির লোককে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর প্রদেশ, গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। কোচিনের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ও নায়ার,



ভূমধ্য অঞ্চলীয়



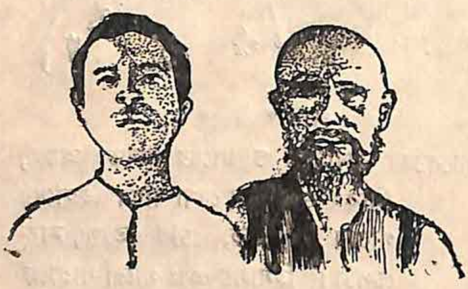
আলেপা-দিনারিক

পাটনায় বিহারী ব্রাহ্মণ এবং বাংলায় কায়স্থদের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর ধারা বহমান।

(৫) পশ্চিমা গোলমুণ্ড—প্রধানতঃ বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, গাঙ্গেয় উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিলগিট, চিত্রল প্রভৃতি

অঞ্চলে গোলমুণ্ড নরজাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর নরগোষ্ঠীর ধারা পাওয়া যায়—(ক) আলিপনয়েড, (খ) দিনারিক এবং (গ) আর্মানী। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মধ্যে গোল ও মধ্যম আকৃতির মুণ্ড; তীক্ষ্ণ ও উন্নত, মধ্যম আকৃতির নাক এবং মধ্যম দৈর্ঘ্যের দেহ লক্ষণযুক্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আলেপা-দিনারিক নরগোষ্ঠীর বংশধর। গুজরাটের বেনিয়া, আমেদাবাদের পার্শী মহিলা, এবং রেওয়ার বাঘেল রাজপুতদের মধ্যে আলেপা-দিনারিক ধারা বর্তমান।

(৬) নর্ডিক বা আর্য—ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের অধিকাংশই এই নরগোষ্ঠীর বংশধর। ইহাদের গায়ের বর্ণ গৌর, নাক উন্নত এবং আকৃতি দীর্ঘ। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পাঠানদের মধ্যে ইহাদের অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির বংশধরেরা প্রধানতঃ পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রে বাস করে। আর্যগোষ্ঠীর মূল ভাষা হইতেই ভারতে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দী, বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক উত্তর ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। উত্তর প্রদেশ, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের মধ্যে নর্ডিক জাতির রক্তধারা বহমান।



নর্ডিক বা আর্য

উল্লিখিত ছয়টি জাতির বংশধরগণকে লইয়া ভারতের বর্তমান জনসমষ্টি গঠিত। তবে কোন জাতিরই বসবাসের এলাকা স্থির নির্দিষ্ট বা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের সকল অঞ্চলেই ইহারা কালক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং একে অন্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষেই জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ভারতবর্ষে ইহার ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে।

মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব

বৈচিত্রের মধ্যে একতা ঃ ভারতের ভূভাগ ও জনসমাজের মধ্যে বহু বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই দেশ ও তাহার জনসমষ্টির মধ্যে এক অন্তর্গূঢ় ঐক্য রহিয়াছে। আর্য ঋষিগণ এই দেশের ভৌগোলিক ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উল্লেখ করিয়া বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তদ্ ভারতং নাম, ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥" যে ভূভাগ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত, তাহার নাম ভারতবর্ষ এবং তাহার অধিবাসিগণ ভারতীয়। বাস্তবিক পক্ষে 'ভারতবর্ষ' এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আসমুদ্র হিমাচল এক বিশাল দেশের ধারণা জাগিয়া উঠে।

ভৌগোলিক ঐক্য

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিশ্রণজনিত ঐক্য

ভারতের গৌরব কথা বলিতে গিয়া কবি গাহিয়াছেন "নানা দেশ, নানা ভাষা, নানা পরিধান। বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।" প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনসমষ্টি বহু জাতি ও জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে রক্তের মিশ্রণে এক নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখিয়াছেন—"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন। শক হূনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।" ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও হিন্দী, বাঙলা, উড়িয়া, গুজরাটি প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান আধুনিক ভাষাগুলি বৈদিক আর্যভাষা হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। ভাষার অন্তর্নিহিত ঐক্যের কারণেও ভারতবাসীর মনে ঐক্যভাব সঞ্চারিত হইয়াছে।

ভাষা ও ধর্মের মূল ঐক্য

তাহা ছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্মমতের মধ্যে আপাতভাবে বিভিন্নতা দেখা গেলেও বিশাল হিন্দুধর্মের মধ্যে উহাদের সকলেরই স্থান হইয়াছে। ধর্ম সম্পর্কে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর সহিষ্ণুতা ধর্মমতের বিরোধকে অনেক পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় যে, মুসলমান পীরের দরগায় বা খ্রীষ্টান সাধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাইতে ধার্মিক হিন্দু কুণ্ঠাবোধ করে না।

জীবনযাত্রার একতা

জাতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির প্রত্যক্ষ বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে আর একটি কারণে পরোক্ষে ঐক্যবোধ জন্মিয়াছে। প্রায় একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাদ্য পানীয়, একই ধরনের পরিবেশ এই ঐক্য বোধকে পুষ্ট করে।

রাজনৈতিক ঐক্য

রাজনৈতিক কারণেও ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের রাজারা 'সম্রাট' ও রাজ চক্রবর্তী হইবার আকাঙ্খা পোষণ করিতেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রজাই এক সম্রাটের শাসনে থাকিবার ফলে তাহাদের মনে পরোক্ষে একতাবোধ অনুভূত হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে শাসনগত ঐক্যের কারণেই ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরাজ বিদেশী—আর আমরা বাঙালী, পঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, জাঠ, শিখ, হিন্দু, মুসলমান সকলেই ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ, এই সুগভীর ঐক্যবোধ একদিনে উদ্ভূত হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঐক্যের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান ছিল। বিচিত্র, বিভিন্নের মধ্যে মূল ঐক্যের সন্ধান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনন্য বিশিষ্টতা। ইহাই ভারতের প্রকৃত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় | ভারত-ইতিহাসের উপাদান

ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান :

ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উহারা হইল ১) গ্রন্থে লিখিত বিবরণ, (২) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, (৩) উৎকীর্ণলিপি এবং (৪) মুদ্রা। ইতিহাসের উপাদানগুলিকে আবার (ক) প্রাচীন, (খ) মধ্যযুগীয় এবং (গ) আধুনিক —এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) প্রাচীন উপাদান :

(১) গ্রন্থে লিখিত বিবরণ : প্রাচীন আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদ এবং বৈদিক সাহিত্য হইল ভারতের ইতিহাস রচনার পক্ষে আদি উৎস। বশিষ্ঠ, বৌধায়ণ, আপস্তম্ব, মনু প্রভৃতির ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলি হিন্দুভারতের সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য উপাদান। সংস্কৃত পুরাণগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস রচনার উৎস। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে সাতটিতে রাজন্যবর্গের বংশানুচরিত লিপিবদ্ধ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'ভুবনকোষ' অংশে প্রাচীন ভারতের বিস্তৃত ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ন এবং মহাভারত এই দুই মহাকাব্যে প্রাচীন ভারতের রাজবংশাবলী এবং সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক রীতিনীতি বর্ণিত আছে। শুক্রনীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। পুরাণ এবং মহাভারতেও রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে।

বেদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য,

বৌদ্ধ যুগ হইতে ভারত-ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধের সমসাময়িক উত্তর-ভারতের ষোলটি রাজ্যের বিবরণ আছে। জাতক কথাগুলিতে বহির্ভারতের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ আছে। জৈনগ্রন্থ উপাঙ্গপন্নবণা এবং আচারাঙ্গসূত্রেও ইতিহাসের কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। পালি ভাষায় লিখিত 'দীপবংশ' এবং 'মহাবংশ'-নামক দুইটি গ্রন্থে সিংহল ও ভারতের ইতিহাস এবং মৌর্যরাজবংশের কিছু কাহিনী বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ

বিদেশী দূত অথবা পর্যটকগণ রচিত বিবরণ হইতেও মৌর্যযুগ এবং তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস এবং মৌর্যরাজসভায় আগত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস প্রভৃতির গ্রন্থে ভারতের বিবরণ আছে। দেইমেকোস, দিওনিসাস প্রভৃতি গ্রীক দূতগণও কিছু বিবরণ দিয়াছেন। গ্রীক চিকিৎসক তেসিয়াসের বিবরণে প্রাচীন ভারতের বর্ণনা আছে। জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'পেরিপ্লাস' নামক

বৈদেশিক বিবরণী

গ্রন্থে এবং রোমান লেখক প্লিনীর বিবরণে ভারতের উপকূলবর্তী বন্দর ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সংবাদ আছে।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পর বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই সকল পরিব্রাজকগণের মধ্যে সুং-উন, হ্বেইসেং, ও-কুং প্রভৃতির বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ফা-হিয়েন, হুয়েনসাঙ্ এবং ই-সিং-এর বিবরণ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে ফা-হিয়েন এবং সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হুয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত তিব্বতীয় লামা তারানাথের গ্রন্থে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম, শিল্প এবং বাঙলার পাল সম্রাটগণের ইতিহাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের সহিত মুসলমান মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আরব লেখকগণের রচনায় ভারত ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায়। বণিক সুলেমান, পর্যটক আল মাসুদী এবং ইবন খোরদাদ ভারতের সম্পদ, সমাজ ও বাণিজ্য বিষয়ে বহু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক কাব্য

প্রাচীনযুগের শেষভাগে ভারতীয় লেখকগণ কয়েকখান ইতিহাস-কাব্য রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট 'হর্ষ চরিত' রচনা করেন। একাদশ শতাব্দীতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেন। এই কাব্যে বাঙলার পালবংশ এবং কৈবর্ত বিদ্রোহের কাহিনী আছে। প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কবি বাকপতি রচিত 'গৌড়বহো' কাব্যে কাশ্মীর ও বাঙলার ইতিহাসের কিছু অংশ বর্ণিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে কাশ্মীরের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান আছে।



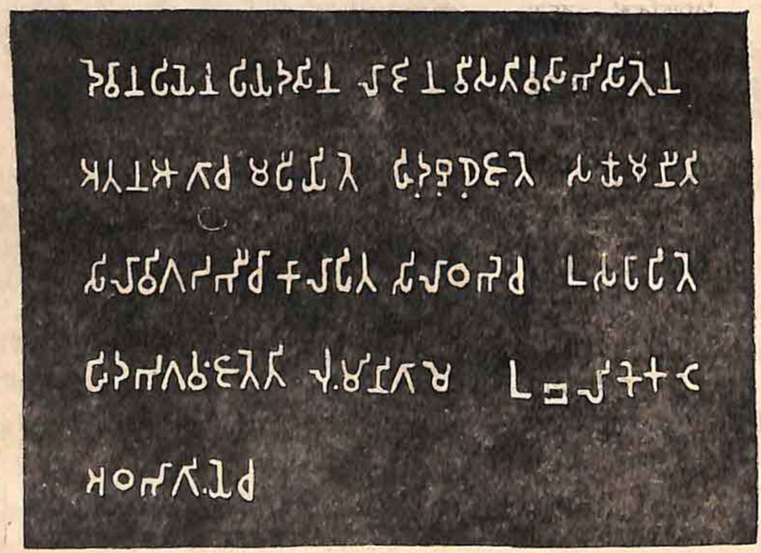
জেতবনের ভাস্কর্য

(২) প্রত্নতাত্ত্বিক ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রাচীন নগর অথবা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, স্থাপত্য কিম্বা ভাস্কর্যের নিদর্শন, দেবদেবী অথবা মানুষের মূর্তি ইতিহাস রচনায় প্রভূত সাহায্য করে। সিন্ধু উপত্যকায়, সাঁচী ও সারনাথে,

পাহাড়পুরে, পাটলিপুত্রে, নালন্দায়, তাম্রলিপ্তিতে ভূগর্ভ খননের ফলে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খননকার্যের ফলে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় যে উন্নত ধরনের নগর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হইয়াছে ভারতের আদি ইতিহাস পৃথিবীর অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতা বিশেষতঃ মিশর, ব্যাবিলন এবং আসিরীয় দেশের মতই সুপ্রাচীন! সাঁচী ও সারনাথে খননকার্যের ফলে মৌর্যযুগের ইতিহাসের বহু উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। তক্ষশিলা, নালন্দা এবং পাহাড়পুরে খননের ফলে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দির এবং গুহাচিত্র, প্রাচীন ভারতের শিল্পের ইতিহাস রচনার উপাদান। তাম্রলিপ্তিতে যে সকল তৈজসপত্র, মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রাচীন বাঙলা দেশের সহিত অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশের যোগাযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে ভারত ইতিহাসের অনেক অংশ পুনরায় লিখিতে হইয়াছে এবং হইতেছে।

নগর, প্রাসাদ, ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ স্তূপ, স্তম্ভ, মূর্তি, তৈজসপত্র ইতিহাস রচনার উপাদান

(৩) উৎকীর্ণলিপি ঃ প্রাচীনযুগে এখনকার মত কাগজের ব্যবহার ছিল না। তখন রাজা-মহারাজা ও সম্রাটেরা পাথর অথবা ধাতুর পাতের উপর তাঁহাদের আদেশ, অনুশাসন, দানপত্র ইত্যাদি খোদাই করিয়া দিতেন। খোদাই করা এই সকল লেখ বা



রুম্মিনদেই স্তম্ভে অশোকের শিলালিপি

লিপি হইতে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। এই লিপিগুলি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ হইত। মৌর্যসম্রাট অশোক

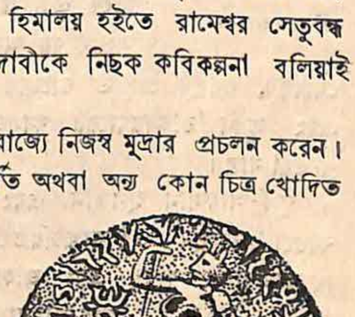
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্বতগাত্রে এবং শিলাস্তম্ভে তাঁহার অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। বহু শত বৎসর পরে আধুনিককালের পণ্ডিতেরা অশোকের এই অনুশাসনগুলি পাঠ করিয়া মৌর্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদান লাভ করিয়াছেন। এলাহাবাদের এক স্তম্ভে খোদিত লিপি হইতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী জানিতে পারা যায়। জুনাগড় পর্বতে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে শকরাজা রুদ্রদামনের ইতিহাস জানা যায়। ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির এক গুহায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে কলিঙ্গরাজ খারবেলের রাজত্বের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

শিলা লিপি

প্রাচীনযুগের রাজারা তাঁহাদের দানপত্র এবং প্রশস্তি তামার পাতে খোদাই করাইতেন। ইহাকে বলা হয় তাম্রপত্র বা তাম্রশাসন। এইরূপ শতশত তাম্রশাসন ভারতের বহু রাজ্যের ও রাজার নাম ও তাঁহাদের কীর্তিকলাপের পরিচয় দেয়। তবে তাম্র ও শিলালিপি হইতে সকল সময়েই প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে একই যুদ্ধের ফলাফল দুই পক্ষের রাজার প্রশস্তি লিপিতে ভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লিপিগুলিতে অতিশয়োক্তি দোষও দেখা যায়। বাঙলার পালসম্রাট দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত এক লিপিতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান ঐতিহাসিকেরা এই দাবীকে নিছক কবিকল্পনা বলিয়াই মনে করেন।

তাম্রশাসন

(৪) **প্রাচীন মুদ্রা ঃ** প্রত্যেক রাজাই তাঁহার রাজ্যে নিজস্ব মুদ্রার প্রচলন করেন। সাধারণতঃ মুদ্রায় রাজার নাম, সন এবং তাঁহার মূর্তি অথবা অন্য কোন চিত্র খোদিত থাকে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রাপ্ত মুদ্রা হইতে ভারতে বাহ্লীক, গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী রাজার ইতিহাস জানা যায়। শকরাজগণের মুদ্রা হইতে, তাঁহাদের নাম এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে তাঁহাদের রাজত্বের সময় জানা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রার উপর দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত থাকে। তাহা হইতে সেই সময়কার প্রচলিত ধর্মের আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীন মুদ্রা হইতে এমন বহু রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, যাঁহাদের অস্তিত্বের অন্য কোন প্রমাণ নাই। এই কারণে মুদ্রা হইল ভারতবর্ষের প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ। মুদ্রা নির্মাণে ব্যবহৃত ধাতুর প্রকার ও পরিমাণ দেখিয়া রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থান অনুমান করা যায়। রাজকোষে অর্থাভাবহেতু মুহম্মদ তুঘলক তাম্রমুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।



কুষাণ মুদ্রায় শিবমূর্তি

(খ) মধ্যযুগীয় ঃ ভারতে মুসলমানদের রাজত্বকালকে ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই যুগে লিখিত ঐতিহাসিক উপকরণের কোন অভাব

নাই। সরকারী দলিল, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্রাদি হইতে এযুগের ইতিহাস রচনা করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকালে প্রসিদ্ধ আরবীয় পণ্ডিত অলবিরুণী এদেশে আসিয়াছিলেন। অলবিরুণী রচিত 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থে হিন্দুদের আচার, আচরণ, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। দিল্লীর সুলতানগণ তাঁহাদের রাজত্বের ধারাবিবরণী রক্ষার জন্য ইতিহাস লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখকগণের মধ্যে তুর্ক-আফগানযুগে মীনহাজ, জিয়াউদ্দীন বারানী, আমীরখসরু, মোগলযুগে ফেরিস্তা, হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদন, আকবরের সভাসদ নিজামউদ্দীন, আবুলফজল, বদাউনী, শাহজাহানের সভাসদ আবদুল হামিদ লাহোরী, সুজন রায়, ঔরঙ্গজীবের সমকালীন মুহম্মদ হাসিম (ছদ্মনাম খাফি খাঁ) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মীনহাজের 'তবাকৎ-ই-নাসিরী,' আবুলফজলের 'আকবর নামা' এবং 'আইন-ই-আকবরী' ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দিল্লী দরবারের ঐতিহাসিকগণ

মুসলমান যুগে বাদশাহের ফরমান বা সরকারী আদেশ, কর্মচারী নিয়োগপত্র, বিজ্ঞপ্তি, সরকারী চিঠি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজের নকল রাখিবার নিয়ম ছিল। তবে এগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে এবং উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সামান্য কিছু অংশ যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের সংগ্রহ শালায় এখনও রক্ষিত আছে। পারসিক এবং তুর্কী রাজদরবারের কাগজপত্রেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

দলিল দস্তাবেজ

তুর্ক-আফগান সুলতান, এবং মোগল সম্রাটগণের মধ্যে অনেকেই আত্মচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই আত্মচরিতগুলি সম-সাময়িক ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। ফিরোজশাহ, বাবর এবং জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরনামা, বাদশাহনামা, আলমগীরনামা প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থগুলিও ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত হিন্দী ভাষার কবি চান্দ বরদাই রচিত "পৃথীরাজ রাসৌ" নামক জীবনী-মূলক কাব্যে প্রখ্যাত রাজপুত নৃপতি পৃথ্বীরাজ এবং চৌহানবংশের অনেক কাহিনী আছে।

আত্মজীবনী ও জীবনী গ্রন্থ

মুসলমান যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল। ধর্মের প্রভাবে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। বাঙলাদেশের মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যচরিত প্রভৃতি এবং মুসলিম সুফী সাহিত্য, নানকের 'জপজী', শিখদের গ্রন্থসাহেব, কবীরের দোহা, তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' প্রভৃতি গ্রন্থ সমসাময়িক সমাজ ও ধর্ম চিন্তার ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য। মহসান ফানী ষোড়শ শতাব্দীতে 'দবিস্তান' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তৎকালীন ভারতের সমস্ত ধর্মের বিবরণ আছে।

ধর্মগ্রন্থ, কাব্য-সাহিত্য

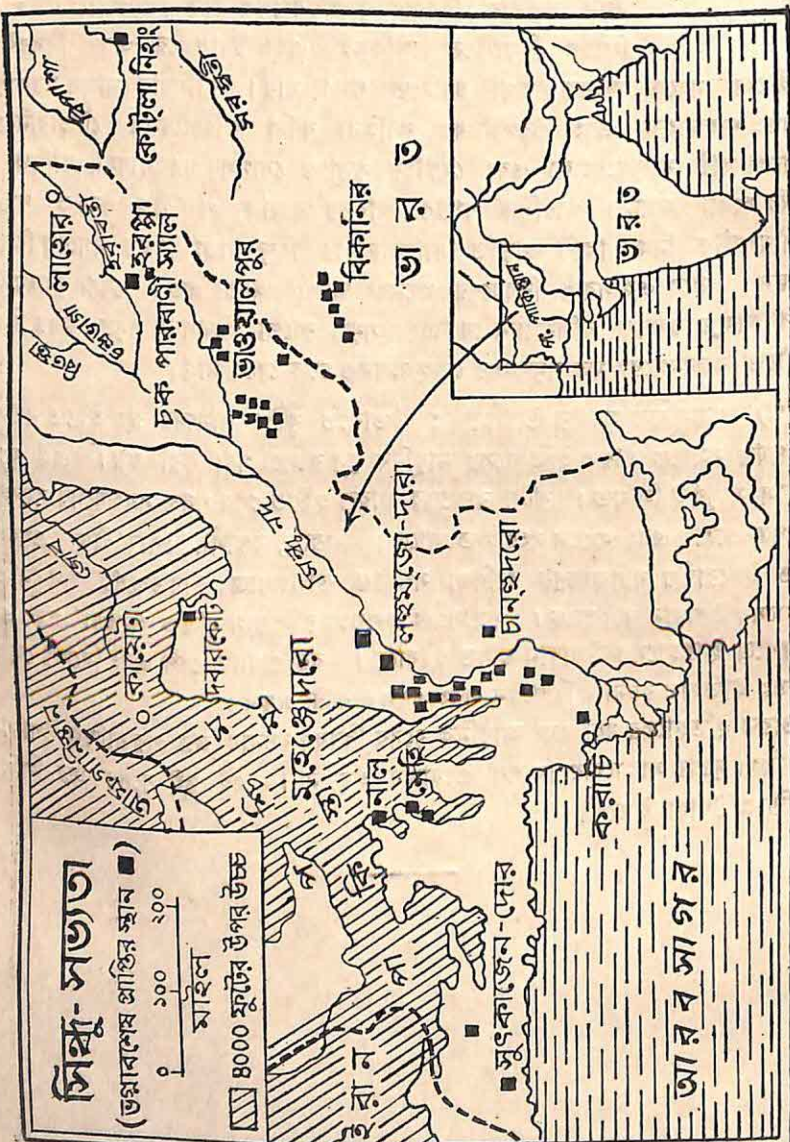
মধ্যযুগেও বহু বিদেশী পণ্ডিত, পর্যটক, ধর্মপ্রচারক, চিকিৎসক এবং বণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বৈদেশিক বিবরণী

ইবন বতুতার বিবরণে তুঘলকবংশের ইতিহাস আছে। রালফ ফিচের বিবরণীতে আকবর এবং টমাস রো'-এর বিবরণীতে জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বার্ণিয়ার মোগল দরবারের বিশেষতঃ শাহজাহান এবং ঔরঙ্গজীবের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। টেভারনিয়ের, নিকোলো কন্টি মার্কোপোলো এবং মেনুচির বৃত্তান্তে মোগলযুগের ব্যবসা, বাণিজ্য ও ঐশ্বর্যের সংবাদ আছে। পারসিক পর্যটক আবদুর রজ্জাক, পর্তুগীজ পর্যটক পাএজ ইতালীয়পর্যটক নিকলোকন্টি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্য বিজয় নগরের বিবরণ দিয়াছেন। তবে এই সকল বিবরণের অনেক অংশই অতিরঞ্জিত। যেমন বিজয়নগর সম্পর্কে আব্দুর রজ্জাক বলিয়াছেন যে "এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যে তিনশত সমুদ্র বন্দর ছিল। পৃথিবীতে বিজয়নগরের মত সমৃদ্ধনগর কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই।"

(গ) আধুনিক যুগের উপকরণ ঃ ভারতে বৃটিশ শাসনের সুরু হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে ভারত ইতিহাসের আধুনিক যুগ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ ই লিখিত। বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্রযুগের সরকারী দলিলপত্র এদেশে এবং লণ্ডনে সংরক্ষিত আছে। ইংরাজ, ফরাসী, পোতু´গীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজপত্রে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বৃটিশযুগে মুদ্রিত অসংখ্য গ্রন্থ এবং সংবাদপত্রে ইতিহাসের উপাদান সুলভ হইয়াছে। বহু প্রখ্যাত দেশী এবং বিদেশী লেখক ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

ভারত ইতিহাসের মধ্য এবং আধুনিক যুগের বিবরণ রচনার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, লিপি কিম্বা মুদ্রার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এই দুই যুগের জন্য লিখিত সাহিত্যিক উপাদানই যথেষ্ট।


সিন্ধু-সভ্যতা
(ভগ্নাবশেষ প্রাপ্তির স্থান ■)
০ ১০০ ২০০
মাইল
৪০০০ ফুটের উপর উচ্চ
আরব সাগর
করাচি
মহেঞ্জোদড়ো
চান্হুদড়ো
হরপ্পা
লাহোর
বিকানির
ভারত
কোটলা নিহাং
সরস্বতী

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

সিন্ধু সভ্যতা ঃ সুদূর অতীতে সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব ছিল নদী-জলধারা সিঞ্চিত উর্বর ভূমি, সুতরাং কৃষি ও পশুপালনের উপযুক্ত স্থান। অনুমান হয় যে খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলে সুসভ্য মানুষ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এই সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধু নদের প্রাচীন খাতের পার্শ্বে একস্থানে একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের খনন কার্য আরম্ভ করেন। একটি উঁচু টিলার উপর এই স্তূপটি অবস্থিত ছিল। স্থানীয় লোকেরা এই টিলাটিকে বলিত মহেঞ্জোদারো অর্থাৎ মৃতের স্তূপ। খননের ফলে বৌদ্ধ স্তূপটির তলদেশে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ভারত ইতিহাসের এক বিস্মৃত যুগ সহসা আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পর খনন কার্যের ফলে পঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পা, বালুচিস্তানের চানহুদারো ও অমরি, গুজরাটে আহমেদাবাদের নিকটে লোথাল এবং নর্মদা উপত্যকায় একই ধরনের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান হায়দ্রাবাদে, করাচীর উত্তর পূর্বে গুজো, বিজনো, জাকোবাবাদ প্রভৃতি স্থানে এবং স্যার অরেল ষ্টীন সিন্ধুর পশ্চিম তীরে দাবরকোট, উত্তর বালুচিস্তানে পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, দক্ষিণ বালুচিস্থানে কুল্লি এবং মোহিতে আরও কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। সিন্ধু, পঞ্জাব, কাথিয়াবাড়, উপকূল অংশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপত্যকা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অংশ বিশেষে এই সভ্যতার নিদর্শন মিলিয়াছে। পণ্ডিতেরা এই সভ্যতার নাম দিয়াছেন সিন্ধু সভ্যতা। কারণ সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে এই সভ্যতার নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ ছয়টি—(১) সুপরিকল্পিত নগর নির্মাণ ও উন্নত পৌর জীবন, (২) তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত অস্ত্র শস্ত্র, তৈজসপত্র ও মুদ্রা ব্যবহার, (৩) চক্রের সাহায্যে মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং পরিবহনের জন্য চক্রবাহিত যান ব্যবহার, (৪) পোড়া ইটের দ্বারা গৃহ নির্মাণ, (৫) চিত্র লিপির ব্যবহার এবং (৬) সোনা, রূপা, পাথর ও শঙ্খের অলঙ্কার ব্যবহার।

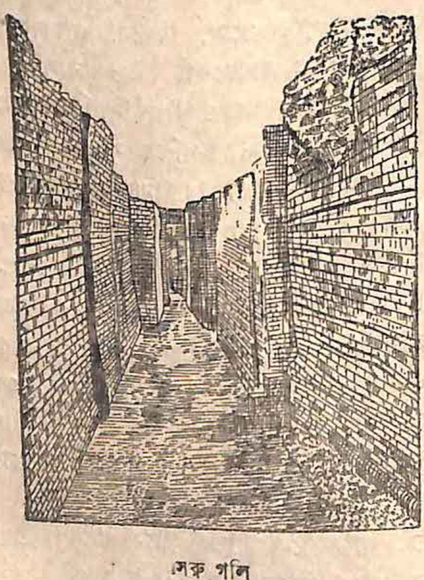
সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিক ফেয়ার সার্ভিস পশ্চিম পাকিস্থানে বিভিন্ন স্থানে খনন করিয়া বালুচিস্তানের লাবেলা জেলায় পোরলি নদীর তীরে আনুমানিক খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে নির্মিত আরও দুইটি জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এখানকার

গৃহগুলির প্রস্তরনির্মিত ভিত্তি এবং চার পাঁচ ফুট উচ্চ প্রাচীর এখনও খাড়া আছে। রাজপথ, গৃহের দরজা, সিঁড়ি, কূপ ইত্যাদি স্পষ্টই দেখা যায়। সমগ্র এলাকায় চিত্রিত পাত্র, অলঙ্কার, পাথরের সামগ্রী, মাটির মূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলির সহিত হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সামগ্রীর মিল আছে। এই জনপদ দুইটির ধ্বংসাবশেষ প্রায় আট মাইল এলাকায় বিস্তৃত। চতুর্ভুজ, আয়ত এবং বৃত্তাকার ঘেরা প্রস্তর নির্মিত কয়েকটি স্থান দেখা গিয়াছে। এই স্থানগুলি কি জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা অনুমান সাপেক্ষ। ফেয়ার সার্ভিস মনে করেন যে, এগুলি সেকালের ধর্ম বা সামাজিক উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত সরস্বতী নদীর তীরেও সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রাজপুতানার রঙ্গমহল-এর নিকটবর্তী এবং হনুমানগড় ও সুরতগড়ের মধ্যবর্তী স্থান কালিবঙ্গ গ্রামে প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। কালিবঙ্গ নগরীর নির্মাণ রীতি হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মতই সুপরিকল্পিত। ইহার রাজপথ, গলি রাস্তাগুলি, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য কূপ, গৃহগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবধান উন্নতধরনের নগর স্থাপত্যের নিদর্শন। একটি সমাধির অভ্যন্তরে একটি পুরুষ, একটি নারী ও দু'টি শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। বেদীর মত গঠিত একটি স্থান দেখিয়া মনে হয় যে এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হইত।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নগর নির্মাণ প্রণালী ঃ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নগরীগুলি নির্মিত হইয়াছিল। নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত প্রধান পথগুলি ছিল সরল এবং প্রশস্ত। নগরে সরু গলিও ছিল। ইটের তৈয়ারী বাড়ীগুলি রাস্তার দুইধারে সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত। রাজপথের পার্শ্বে মাটির নীচে পাথরে বাঁধান নর্দমা। জল নিকাশের এই সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া বোঝা যায় যে পৌর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নগরবাসী সচেতন ছিল। ক্ষুদ্র দুই কক্ষের গৃহ হইতে বিরাট প্রাসাদের চিহ্ন নগরে বর্তমান। গৃহগুলিতে গবাক্ষ থাকিত। সিঁড়ির অবস্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল বা আরও উচ্চতল বিশিষ্ট ছিল। পাথর বসাইয়া সিঁড়ি, গৃহের অঙ্গন এবং মেঝে সুন্দর



সরু গলি

ভাবে সজ্জিত হইত। গৃহের দেওয়ালগুলি ছিল মসৃণ। প্রায় প্রতি গৃহেই শয়ন-কক্ষ, রন্ধনশালা, স্নানাগার, কূপ ও নর্দমা ইত্যাদি ছিল। মহেঞ্জোদারোতে বিশাল স্তম্ভযুক্ত একটি বৃহৎ কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐটি রাজপ্রাসাদ, মন্দির অথবা সভাগৃহ ছিল।

সুপ্রশস্ত রাজপথ, উত্তম জল নিকাশ ব্যবস্থা
সুসজ্জিত বহুতল গৃহ



পাথরে বাঁধান নর্দমা

এই নগরীতে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্নানাগার নির্মিত হইত। এইরূপ একটি স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট, প্রস্থে ১০৮ ফুট। এটি ৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই স্নানাগারের ভিতরে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা এবং তাহার মধ্যস্থলে ৩৯ ফুট দীর্ঘ, ২৩ ফুট প্রশস্ত এবং ৮ ফুট গভীর একটি জলাধার, স্নান ও সন্তরণের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

সাধারণের জন্য স্নানাগার

আঙ্গিনার চারিধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। একটি কক্ষের মধ্যস্থিত কূপ হইতে মোটা নলের মত পথে জলাধারে জল ভরা হইত। জল গরম করিবার ব্যবস্থাও ছিল। নর্দমা দিয়া জলাধার হইতে জলনিকাশ করা হইত।



মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার

হরপ্পা নগরীটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। ইহাতে মনে হয় নগরীকে দুর্গের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। মহেঞ্জোদারোতে এই রূপ প্রাচীরের নিদর্শন পাওয়া

যায় নাই। হরপ্পায় একস্থানে পাশাপাশি কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, এগুলি শ্রমিকগণের বাসস্থান ছিল। প্রাচীন হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ন্যায় নগর নির্মাণের এত উন্নত প্রণালী সমসাময়িক পৃথিবীর আর কোনও দেশে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

জীবনযাত্রা: নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে সেই যুগের নাগরিকদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনুমান করিয়া লওয়া যায়। রন্ধনশালায় পাত্রের মধ্যে গম, যব, খেজুর, মাছের কাঁটা ও পশুর অস্থি পাওয়া গিয়াছে। মৎস্য ধরিবার বঁড়শিও পাওয়া গিয়াছে। গম ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জীবজন্তুর কঙ্কাল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি এবং সীল মোহরে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, কুকুর, হাতী প্রভৃতির আকৃতি দেখিয়া মনে হয় সেগুলি ছিল গৃহপালিত পশু। মহেঞ্জোদারোতে একখণ্ড কার্পাস বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। পশমের বস্ত্র, সূতা ও সূচের ব্যবহারের নিদর্শন আছে। মূর্তি ও চিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে নগরীর অধিবাসীরা কাপড় পরিত, চাদর গায়ে দিত। পুরুষেরা দাড়ি রাখিত, কিন্তু গোঁফ রাখিত না। স্ত্রীলোকেরা নানা ছাঁদে কেশ বিন্যাস করিত। নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করিত। সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষ হার, চুড়ি, বালা প্রভৃতি অলঙ্কার পরিত। মেখলা, নথ, কানের দুল, পায়ের মল নারীদের মধ্যেই ব্যবহারের রীতি ছিল। অলঙ্কারগুলির কারিগরি অতি সুন্দর।

খাদ্য

বস্ত্র

বেশভূষা



সিন্ধু সভ্যতার যুগে অলঙ্কার

সোনা, রূপা, তামা, গজদন্ত, শঙ্খ, ঝিনুক এবং নানা প্রকার মূল্যবান পাথর অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহার করা হইত।

গৃহস্থেরা রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, চীনামাটি ও মাটির নানা প্রকার বাসনপত্র ব্যবহার করিত। মাটির পাত্রগুলি নানা প্রকারে চিত্রিত করিবার রীতি ছিল। পোড়ামাটি, চীনামাটি ও অস্থিখণ্ড দিয়া সূতা কাটিবার জন্য তকলি বা টাকু প্রস্তুত হইত। অস্থিখণ্ড

বা গজদন্ত দিয়া সূচ ও চিরুনী ; তামা এবং ব্রোঞ্জ দিয়া কুঠার, বর্শা, ক্ষুর, ছুরি, বঁড়শি প্রভৃতি তৈয়ার হইত। নানা প্রকার খেলনা, পুতুল, চাকা লাগান ছোট ছোট ঠেলাগাড়ি, খাট, চেয়ার প্রভৃতি শিশুদের খেলার জন্য তৈয়ার হইত। মনে হয় নাগরিকেরাও গৃহে খাট, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব এবং পরিবহনের জন্য ঠেলাগাড়ি বা পশুবাহিত গাড়ি ব্যবহার করিত। পারিবারিক জীবনে শিশুদের খুবই আদর ছিল সন্দেহ নাই।

তৈজসপত্র

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অলঙ্কারের প্রাচুর্য দেখিয়া এবং বৃহৎ ও বহুতল গৃহের নিদর্শন দেখিয়া অনুমান হয় যে এখানকার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন। গম, যব, তুলা, ফলমুল উৎপাদনের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রমশিল্পেও বহুলোক নিযুক্ত থাকিত। কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি নানাশ্রেণীর শিল্পীশ্রমিকের কর্মদক্ষতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে এখানকার অধিবাসীরা যে রীতিমত দক্ষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলাদণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের কতকগুলি শিলাখণ্ডের আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি বাটখারা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই অঞ্চলে কোন খনির চিহ্ন নাই। অথচ বিভিন্ন প্রকার ধাতু নির্মিত দ্রব্যের ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, টিন, তামা ও মূল্যবান রত্নাদি অবশ্যই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় কিছু সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সম্ভবতঃ বণিকেরা ব্যবহার করিত। দুইটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখিয়া বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌচালনা জানিত। মহেঞ্জোদারোর কয়েকটি সীলমোহর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। আবার সেই অঞ্চলের কয়েকটি সীলমোহর মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ছিল। সুমের অঞ্চলের একটি শ্বেতপাথরের সীলমোহর এবং একটি খোদাই করা পাথরের পাত্র সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ষাঁড়ের পায়ের অনুকরণে তৈয়ারি পায়াওয়ালা টুল, দীপাধার প্রভৃতি কয়েকটি মিশরীয় তৈজসপত্রও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে সুমের এবং মিশরের সহিত সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। মহেঞ্জোদারোর বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মনে হয় যে নগরীটি বাণিজ্য কেন্দ্ররূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহেঞ্জোদারো হইতে হরপ্পা কয়েকশত মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও নদীপথেই এই দুই নগরীর মধ্যে যোগাযোগ সহজ ছিল। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যও চলিত। লোথালের সুনির্মিত বন্দর ও পোতাশ্রয় সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্য আশ্রিত সমৃদ্ধ নগর-জীবনের প্রমাণ।

আর্থিক অবস্থা

বহির্বাণিজ্য

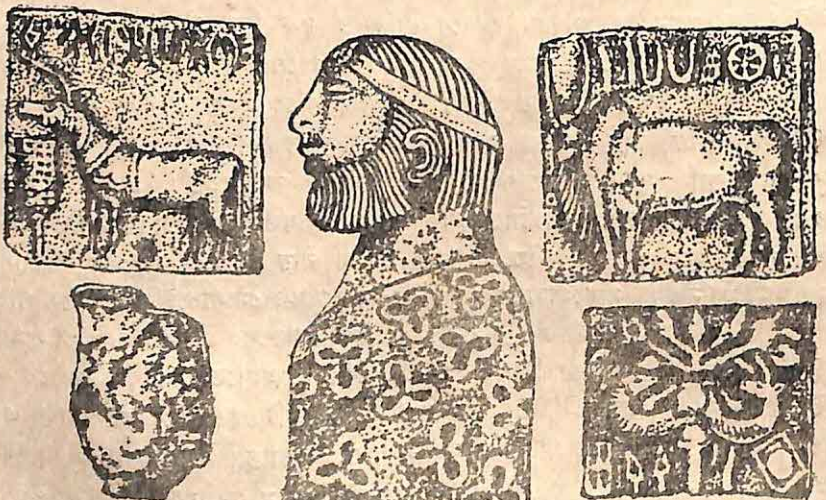
সিন্ধু সভ্যতার অধিকারীরা যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা ধনৈশ্বর্য সংগ্রহ করে নাই। সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে পাওয়া যায় নাই। হরপ্পায় একটি

সামরিক নিদর্শনের স্বল্পতা

দুর্গের আভাস দেখা যায় এবং নগরীটি প্রাচীর ঘেরা হওয়ায়, মনে হয় প্রতিরক্ষার কিছু ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড এবং মারাত্মক যুদ্ধের উপযোগী তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র, তরবারি কিংবা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বর্ম এবং ঢাল জাতীয় কোন সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায় নাই। তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার, গদা এবং পাথর ছুড়িবার জন্য দড়ির যন্ত্র, ফিঙ্গা প্রভৃতি মামুলি অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রগুলি তামা, ব্রোঞ্জ অথবা পাথরে নির্মিত।

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার অধিবাসীদের প্রকৃত গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের শিল্পকলায়। মহেঞ্জোদারোতে পাঁচশতেরও বেশী মৃৎলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি খুব শক্ত এঁটেল মাটিতে প্রস্তুত। সিন্ধু উপত্যকায় প্রায় দুই হাজার সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। সীলমোহরের উপর অঙ্কিত পশুর প্রতিকৃতি এমন জীবন্ত যে প্রাচীন শিল্পে তাহার তুলনা নাই। পালিশ করা চীনামাটির পাত্রের গায়ে ফুল, পাতা, পাখী, হরিণ প্রভৃতি পশুর চিত্র অপূর্ব দর্শন। মহেঞ্জোদারোতে যে সকল মনুষ্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কমনীয়তা

শিল্প



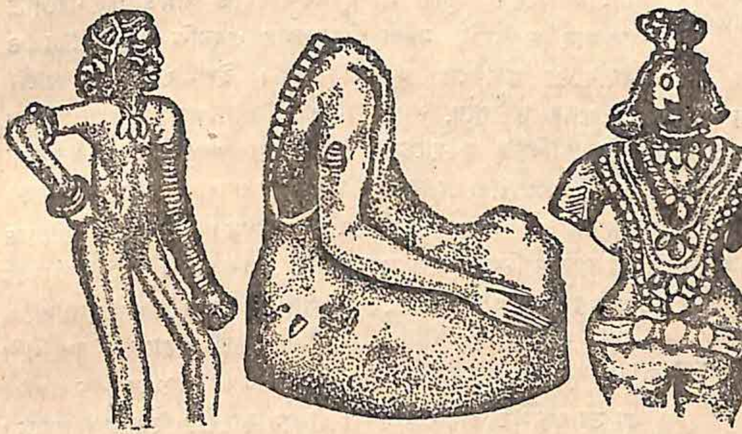
মহেঞ্জোদারোর চিত্রকলা, মৃৎলিপি ও ভাস্কর্য

উচ্চপ্রশংসাযোগ্য। পশু এবং মনুষ্যের প্রতিকৃতিগুলি দেখিলেই বোঝা যায় যে, সে যুগের শিল্পীদের শারীরতত্ত্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল। হরপ্পায় এমন কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার ভাস্কর্য যে কোনও যুগের শিল্পীর ঈর্ষার সামগ্রী।

সিন্ধুসভ্যতার অধিকারীরা যে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য তাঁহারা যে লিপি ব্যবহার করিতেন, এখনও পর্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার করা যায় নাই বলিয়া এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে তাঁহাদের বাস্তুবিদ্যা, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সেকালের শিক্ষার

শিক্ষা

উচ্চমানকেই সূচিত করে। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি ব্রোঞ্জের নর্তকীমূর্তি হইতে অনুমান হয় সেকালে নারীদের মধ্যে নৃত্যকলার চর্চা হইত।



সিন্ধু সভ্যতার যুগে শিল্প নিদর্শন

সিন্ধু উপত্যকায় প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কিছু অনুমান করিয়াছেন। কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কতকগুলি মূর্তি দেখিয়া মনে হয় তখন মাতৃকাপূজা প্রচলিত ছিল। একটি মৃৎলিপি দেখিয়া মনে হয় যে সেটি পশুপতি শিবের প্রতিমূর্তি। বর্তমানকালের শিবলিঙ্গের মত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। জীবজন্তু এবং বৃক্ষ পূজাও সম্ভবতঃ সেকালে প্রচলিত ছিল। মৃতদেহ দাহ করা এবং কবর দেওয়া উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। সকল দিক বিবেচনা করিলে বর্তমান হিন্দুধর্মের সহিত সিন্ধু সভ্যতার অধিকারীদের ধর্মের সুস্পষ্ট যোগসূত্র লক্ষ করা যায়।

ধর্ম



পশুপতি

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ঃ সিন্ধু সভ্যতা কাহারা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মীমাংসা আজও হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, ভূমধ্য সাগর অঞ্চল হইতে আগত দ্রাবিড়ভাষী এক নরগোষ্ঠী এই সভ্যতার স্রষ্টা। ইহারা ভারতে আসিয়া সিন্ধু উপত্যকায়, বালুচিস্তানে

এবং উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বালুচিস্তানের এক উপজাতি ব্রাহুই নামে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর এক ভাষা আজও ব্যবহার করে। ভূমধ্য সাগর অঞ্চল হইতে আগত এই নরগোষ্ঠী কালক্রমে গুজরাটে, নর্মদা উপত্যকায় এমনকি দাক্ষিণাত্যে ও আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ইদানীংকালে গুজরাটে, নর্মদা উপত্যকায়, বাঙলাদেশের দুর্গাপুরে, হুগলী এবং চব্বিশপরগনায় মহেঞ্জোদারোর অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের নরগোষ্ঠীর বংশধারা যে বিদ্যমান নৃতত্ত্ববিদেরা তাহা স্বীকার করেন। মাতৃকাপূজা ও শিবোপাসনা এসকল অঞ্চলে আজও প্রচলিত। পশ্চিম এশিয়াতেও প্রাচীনকালে মাতৃকাপূজার প্রচলন ছিল। সুতরাং পশ্চিম এশিয়ার সহিত সিন্ধু উপত্যকার এবং ভারতের উল্লিখিত অঞ্চলগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রমাণিত হয়। কিন্তু মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় যে লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, ঐরূপ লিপি আর কোথাও প্রচলিত দেখা যায় নাই। অতএব সিন্ধু সভ্যতা যে দ্রাবিড় সভ্যতার সৃষ্টি তাহা স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা আছে। এইজন্য স্যার হুইলার বলেন যে, সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ভারতের বাহির হইতে আসে নাই, তাহারা স্থানীয় কোন নরগোষ্ঠী। কিন্তু কোন নরগোষ্ঠী? মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আদি অষ্ট্রেলীয়, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলীয়, আলপাইন এবং মোঙ্গোলীয় এই চার নরগোষ্ঠীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন একটিমাত্র নরগোষ্ঠীকে এই সভ্যতার স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিবার মত উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড়-ভাষী কোন জাতির সৃষ্টি

দ্রাবিড় প্রভাব স্বীকারে আপত্তি

তবে সিন্ধুসভ্যতা যে বৈদিক আর্যদের সভ্যতা হইতে পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক আর্যগণ নগরে বাস করিতেন না। তাঁহারা গ্রামে বাস করিতেন। বৈদিক আর্যেরা লৌহের ব্যবহার জানিতেন। তাঁহারা অশ্বারোহণ করিতেন। কিন্তু হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে লৌহের ব্যবহার ছিল না। অশ্ব সেখানে অপরিচিত পশু ছিল। অন্যান্য পশুর প্রতিকৃতি ও কঙ্কাল পাওয়া গেলেও অশ্বের কোন কঙ্কাল বা কোন প্রতিকৃতি পাওয়া যায় নাই। বৈদিকযুগে মূর্তিপূজা ছিল না। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। অতএব বৈদিক আর্যগণ সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা হইতে পারেন না।

সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক আর্য

কেহ কেহ বলেন সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের পূর্বেই বৈদিক সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে সিন্ধু সভ্যতাই পূর্ববর্তী। ডঃ পুশলকর অনুমান করেন যে, চিত্র অঙ্কিত সীলমোহর ও মুদ্রা, ওজন করিবার বাটখারা, মাটির খেলনা, পশুপতি শিবের মূর্তি ও পূজা ইত্যাদি সিন্ধু সভ্যতা হইতেই ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আর্যগণের ভারতে আগমন ঃ আর্যসভ্যতা ঃ

আর্যজাতির যথার্থ পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। তাহাদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। কাহারও মতে আর্যজাতির আদি নিবাস ভারতবর্ষ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন আর্যেরা মধ্য অথবা পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথের মধ্যদিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতে তখন আদিম অধিবাসীরা বসবাস করিত। তাহাদের পরাজিত করিয়া আর্যেরা সিন্ধুবিধৌত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে তাহারা উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে এবং এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম দেয় আর্যাবর্ত।

আর্যগণের ভারতে আগমন

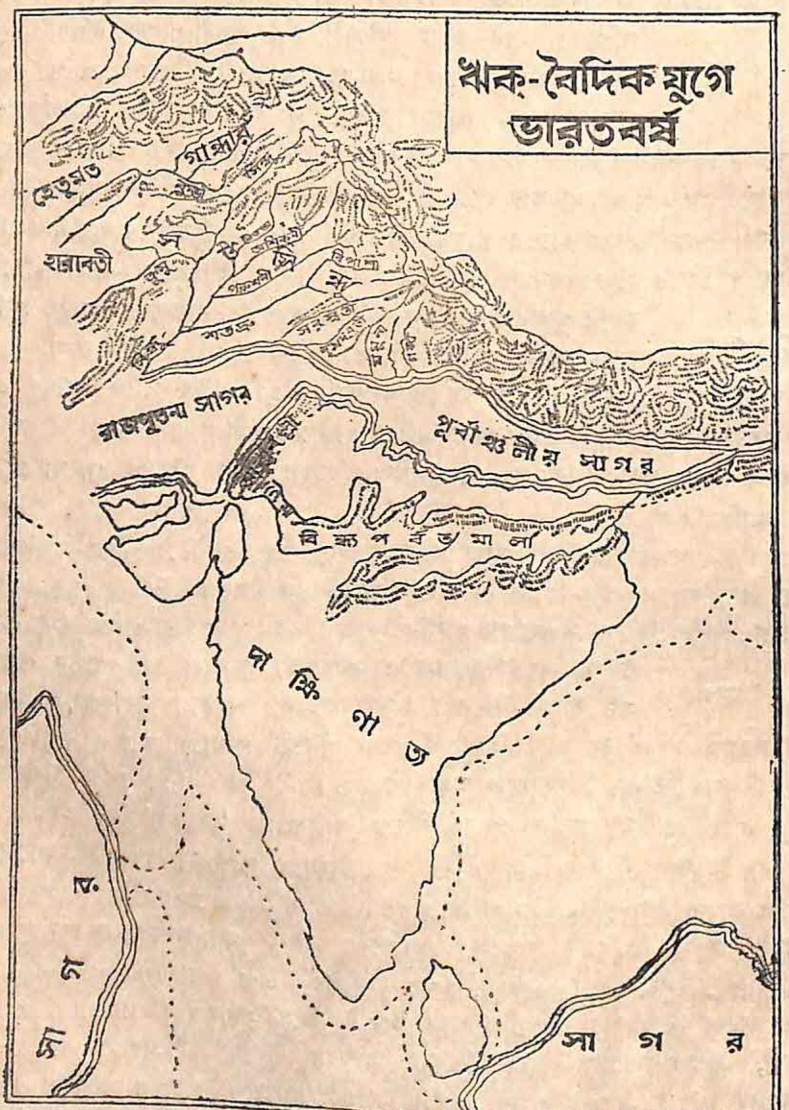
আর্যেরা কোন সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও সঠিকভাবে বলা যায় না। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আর্যগণ আনুমানিক দুই হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সম্প্রতি এশিয়া মাইনরের বোঘাজ-কোই নামক স্থানে একটি লিপিতে বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ এবং নাসত্যের উল্লেখ দেখিয়া প্রমাণিত হয় যে আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আর্যগণ এই অঞ্চলে বসবাস করিত অথবা এই অঞ্চলের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল। আর্যগণ সকলেই একসঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে নাই। বহুযুগ ধরিয়া বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী ভারতে আসিয়াছিল।

আগমন কাল

ভারতীয় আর্যগণের আদিগ্রন্থ ঋক্‌বেদে তাহাদের বাসস্থানের পরিবেশ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা ও বিভিন্ন নদনদীর নামের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে ভারতে আর্যগণের বসতি বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তাহারা প্রথমে সিন্ধু এবং উহার সাতটি উপনদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। এই সাতটি উপনদী হইল বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু, সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী। ইহাদের প্রথম পাঁচটি পাঞ্জাবে আজও রহিয়াছে। শেষ দুইটি রাজপুতানার মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে এই অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু এবং প্রাচীন পারসিকগণের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় 'হপ্তহিন্দু' বলা হইয়াছে। পারসিকগণ উল্লিখিত এই হিন্দু নাম হইতেই পরবর্তীকালে ভারতের অধিবাসী আর্যেরা হিন্দু এবং ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান নামে পরিচিত হয়। আর্যগণ ক্রমে ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, ব্রহ্মর্ষিদেশ অর্থাৎ গঙ্গাযমুনার অববাহিকায় কুরু (দিল্লী), শূরসেন (মথুরা), মৎস্য (জয়পুর) এবং পাঞ্চাল (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) এলাকায় বসতি বিস্তার করে। ক্রমে কোশল (অযোধ্যা), বৎস (প্রয়াগ), কাশী (বারাণসী) এবং বিদেহ (বর্তমান উত্তর বিহার) আর্যগণের অধিকারভুক্ত হয়। মগধ (দক্ষিণ বিহার) এবং বঙ্গদেশে আর্যগণ বহুকাল পরে অনুপ্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকে আর্যগণ অবন্তী (মালব), সুরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) এবং সৌবীর (সিন্ধুর মোহনা অঞ্চল) পর্যন্ত বসতিস্থাপন করে। কালক্রমে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত আর্যবসতি

বসতি বিস্তার

আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হয়। বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যগণ প্রাগজ্যোতিষ (আসাম) এবং দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভ (বেরার), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), দণ্ডক (নাসিক)



এবং অশ্মক ও মূলক (গোদাবরী নদীর অববাহিকা) অঞ্চলে প্রবেশ করে। আর্যসভ্যতা কিন্তু উত্তরভারতের ন্যায় গভীরভাবে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

আর্য সাহিত্য—বেদ ঃ ভারতীয় আর্যগণের রচিত প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থ হইল বেদ। 'বেদ' শব্দের মৌলিক অর্থ হইল 'জ্ঞান'। হিন্দুগণের বিশ্বাস, বেদ কোন মানুষের রচনা নহে। এইজন্য ইহাকে অপৌরুষেয় বলা হয়। সৃষ্টির প্রথম হইতেই বেদের বাণী নিত্যসত্যরূপে জগতের সহিত জড়িত ছিল। প্রাচীন আর্য ঋষিগণ ধ্যাননেত্রে এই সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহা ভাষায় প্রকাশ করেন। ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট সত্য প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না। শিষ্যগণ গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া তাহা শিক্ষা করিত। এই জন্য বেদের অপর নাম হইল শ্রুতি। বেদের চারিটি শাখা—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। প্রত্যেকটি বেদ আবার চারি অংশে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা অংশ বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ছন্দে রচিত কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত এবং যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত বিধির বর্ণনা। ব্রাহ্মণ অংশের পরিশিষ্টের নাম আরণ্যক। আর্য ঋষিগণ বাণপ্রস্থে জীবনযাপনকালে ব্রাহ্মণ অংশে উল্লিখিত যাগযজ্ঞাদির যে সকল দার্শনিক ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতেন, তাহা আরণ্যক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। উপনিষদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরণ্যকের অংশ মাত্র। আর্যগণের দার্শনিক চিন্তার পূর্ণ পরিচয় উপনিষদে পাওয়া যায়। উপনিষদগুলি সমগ্রভাবে বেদান্ত নামে পরিচিত। কারণ ইহারা বেদের অন্ত বা শেষ অংশ।

চারিবেদ

চারি বেদের মধ্যে ঋক্ বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার ১০২৮টি মন্ত্র দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। সামবেদ যজ্ঞকালে সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইত। মাত্র ৭৫টি ব্যতীত সামবেদের সবগুলি মন্ত্র ঋক্‌বেদ হইতে সংগৃহীত। যজুর্বেদে মন্ত্র ছাড়াও গদ্যরচনা আছে। যজ্ঞ করিবার সময় যজুর্বেদের মন্ত্রগুলির ব্যবহার হইত। অথর্ববেদ ৭৩১টি মন্ত্রের সমষ্টি। ইহাতে বহু অপদেবতা ও উপদেবতার উপাসনার ইঙ্গিত আছে। চিকিৎসার মন্ত্র, শত্রু বশ ও নাশ করিবার মন্ত্র, সৃষ্টি রহস্য, পৃথিবীর স্তব প্রভৃতি বহু বিষয় অথর্ববেদে আছে। এইজন্য অনেকে অথর্বকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না।

আর্যদের ধর্ম ঃ প্রথম যুগে বৈদিক আর্যগণের ধর্ম ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও শক্তিকে আর্যেরা দেবদেবী রূপে কল্পনা করিয়া তাহাদের উপাসনা করিতেন। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আকাশের দেবতা দৌঃ, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বায়ুর দেবতা মরুৎ, আলোকের দেবতা মিত্র বা সূর্য, তেজের দেবতা অগ্নি। বাগ্‌দেবী সরস্বতী, প্রভাতের দেবী ঊষা, পৃথিবী প্রভৃতি দেবীর উল্লেখও আছে। বৈদিক যুগে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। আর্যগণ বহু দেবদেবীর উপাসনা করিলেও উপনিষদে একেশ্বর তত্ত্বের আভাস আছে। দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, মাংস, সোমরস প্রভৃতি খাদ্য ও পানীয় যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত। যজ্ঞকালে অগ্নি জ্বালিয়া মন্ত্র পাঠ, হোম এবং সামগান করা হইত। যজ্ঞকালে পশু বধ করা হইত। পরবর্তী যুগে মূর্তিপূজা প্রচলিত হয় এবং যাগযজ্ঞাদি জটিল হইয়া উঠে। রুদ্র, শিব এবং বিষ্ণুর উপাসনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়।

আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা ঃ ভারতীয় আর্যগণের সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং পরিবার ভিত্তিক। গৃহস্বামী ও তাহার সন্তান সন্ততি লইয়া পরিবার গঠিত হইত। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলারক্ষা তিনিই করিতেন। পরিবারের সকলের উপর তাঁহার ক্ষমতা ছিল অবাধ। হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহিত স্বামী স্ত্রী ছিল পরিবারের ভিত্তি। স্বামীর সহধর্মিণীরূপে স্ত্রী বৈদিক যজ্ঞ ও ধর্ম কর্মে অংশ গ্রহণ করিত। মাতাপিতার প্রতি অচলা ভক্তি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা ছিল সকলের অবশ্য কর্তব্য।

পরিবার ও পারিবারিক আদর্শ

কালক্রমে একই পূর্বপুরুষের সন্তানেরা অনেক পরিবারের সৃষ্টি করিলে এই সকল পরিবারের মধ্যে একটি গোত্র বা বংশের বন্ধন স্থাপিত হয়। পূর্বপুরুষের নামে ঐ গোত্র পরিচিত হইত। কতকগুলি গোত্র মিলিয়া আবার একটি গোষ্ঠী গঠিত হইত।

প্রাচীন আর্যগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা না থাকিলেও বর্ণ বিভাগ ছিল—গৌরবর্ণ আর্য এবং কৃষ্ণকায় অনার্য দাস। কালক্রমে ভারতের আদি আধিবাসীদের সহিত মিশ্রণ ও মিলনের ফলে এবং সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে প্রাচীন বর্ণবিভাগের সার্থকতা থাকিল না। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং বিস্তারের ফলে, নানা ধরনের জীবিকা এবং বৃত্তির উদ্ভব হইলে সমাজের বর্ণবিভাগের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্তের একটি শ্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। গীতায় উল্লেখ আছে যে গুণ এবং কর্ম অনুসারে ভগবান চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন সমাজে শ্রমবিভাগের কারণেই প্রাচীন বর্ণবিভাগ হইতে জাতি ভেদের উদ্ভব হইয়াছিল। যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ এবং পুরোহিতের কার্য করিতেন তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। আর্যগণের রাজ্যবিস্তারের ফলে প্রতিরক্ষা এবং প্রজাশাসনের জন্য একদল যোদ্ধার প্রয়োজন হইল। ইঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে আখ্যাত হইলেন। যাহারা কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন এবং শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকিত তাহারা হইল বৈশ্য। আর আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে যাহারা সমাজে দাসরূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং যাহারা ভৃত্যের কর্ম করিত তাহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইল।

বর্ণবিভাগ ঃ জাতিভেদের উৎপত্তি

বৈদিক আর্যসমাজে এই বর্ণভেদ জন্মসূত্রে স্থির হইত না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ হইত। কিন্তু মনুসংহিতার যুগে এই বর্ণভেদ ক্রমে জাতিভেদে পরিণত হয় এবং জন্মসূত্রে নির্ধারিত হইতে থাকে। অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

আর্যগণের ব্যক্তিজীবন চারিটি 'আশ্রম' বা জীবনযাত্রার পর্যায়ে বিভক্ত হইত। শূদ্র এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত প্রত্যেক আর্যকে যথানিয়মে আশ্রম জীবন যাপন করিতে হইত। আশ্রমগুলির নাম হইল যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং যতি বা সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আর্যবালক গুরু গৃহে বাস করিত এবং সংযমী ও সদাচারী হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে আর্যযুবক

চতুরাশ্রম

বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে পরিবার প্রতিপালন করিত। প্রৌঢ় বয়সে গৃহস্থ তাহার উপযুক্ত সন্তানগণের উপর সংসারের ভার দিয়া একাকী অথবা সস্ত্রীক বনবাসী হইয়া বাণপ্রস্থ আশ্রমে তপস্বীজীবন যাপন করিত। তাহার পর বৃদ্ধ বয়সে আর্য পুরুষ শেষ আশ্রমে সন্ন্যাসী হইয়া পরমাত্মার ধ্যানে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইত। কেহ বা পরিব্রাজকরূপে তীর্থ এবং দেশভ্রমণ করিত। কেহ ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পরই সন্ন্যাসী হইয়া আজীবন সংসার ত্যাগী হইতে পারিত।

আর্যপরিবার ও নারী

বৈদিক আর্যপুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত। সকলেই কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তান কামনা করিত। তবে নারীর মর্যাদা স্বীকার করা হইত। বালিকারা পিতৃ গৃহে শিক্ষালাভ করিত। সেযুগের নারী অস্ত্র চালনাও শিক্ষা করিত এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধও করিত। ইন্দ্রসেনা, অপালা প্রভৃতি নারী তাঁহাদের স্বামীর সহিত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সেকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। স্ত্রীলোকেরাও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিত। সকলপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় নারীর অধিকার ছিল। লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, ঘোষা নারী হইলেও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। শাস্ত্র আলোচনায় গার্গী এবং মৈত্রেয়ী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্ত্রী তাহার স্বামীগৃহের কর্ত্রী হইত। যজ্ঞাদি ধর্মকার্যে স্ত্রী স্বামীর সহযোগিতা করিত বলিয়া তাহাকে সহধর্মিণী বলা হইত। মনুসংহিতার যুগে অবশ্য নারীজাতির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

বেশভূষা : আহার্য : আমোদ প্রমোদ

বেশভূষায়, আহারে এবং আমোদ প্রমোদে আর্যদের জীবনে বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। কার্পাস, রেশম ও পশমের বস্ত্র এবং অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। দেহের উর্ধাংশের জন্য উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গের জন্য নীবী বা অন্তর্বাস এবং বাস বা পরিধেয় ব্যবহৃত হইত। নারী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিত। মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করা হইত। নারীরা কেশ বিন্যাস করিত।

আর্য গৃহস্থ প্রতিদিন অগ্রে দেবতাকে নিবেদন করিয়া তবে ভোজন করিত। যব, গম, মৎস্য, মাংস, শাকসবজি দ্বারা আহার প্রস্তুত হইত। দুগ্ধ এবং দুগ্ধ জাত নানাপ্রকার খাদ্য, মধু এবং পিষ্টক তাহাদের প্রিয় ছিল। ধর্মানুষ্ঠানে সোমরস এবং সুরা নামক মাদক পানীয় গ্রহণ করা হইত। রথ চালনা. দাবা ও পাশাখেলা, শিকার, নৃত্যগীত, বীণাবাদন প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের প্রধান অঙ্গ ছিল। আর্যসমাজে মৃতদেহ দাহ এবং সমাধিস্থ করা উভয় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বৈদিক সংহিতার যুগে আর্যসভ্যতা ছিল গ্রাম ভিত্তিক। তাহাদের তুলনায় সেকালের অনার্যদের সভ্যতা ছিল নগর কেন্দ্রিক। ঋক্‌বেদে কৃষ্ণকায় অনাস (অর্থাৎ খর্ব বা চেপ্টা নাসিকা) "দাস" এবং "দস্যু"দের নির্মিত নগর এবং দুর্গের পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি এবং পশুপালন। কৃষির জন্য জলসেচের প্রথা প্রচলিত ছিল। লাঙ্গল ও গরু দিয়া জমি চাষ হইত। গো-ধন ছিল আর্যদের

কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিকা

প্রধান সম্পদ। গৃহপালিত অন্যান্য পশুর মধ্যে অশ্ব, মেষ, কুকুর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আর্যদের প্রতিটি গ্রামেই পশুচারণের জন্য গ্রামবাসীদের যৌথ অধিকারভুক্ত একখণ্ড জমি থাকিত। বিস্তৃত অরণ্য হইতে মৃগ প্রভৃতি বন্যপ্রাণী আর্যদের আহার এবং চর্ম জোগাইত।

বৈদিকযুগে বিভিন্ন শিল্প ও বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছিল। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন হইত। প্রাচীন আর্যেরা কাষ্ঠ এবং বৃক্ষপত্রে নির্মিত গৃহে বাস করিতেন। সূত্রধর, চর্মকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিত। যজন-যাজনের জন্য পুরোহিত, রাজ্য রক্ষার জন্য সৈনিক এবং চিকিৎসার জন্য বৈদ্য প্রভৃতির বৃত্তিও বিশেষ প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগে স্থলযান, জলযান, এমন কি আকাশ-যানেরও উল্লেখ আছে।

ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিময় প্রথা

সংহিতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। গাভী এবং বৃষ বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। বৈদেশিক বাণিজ্যে 'মনা' এবং 'নিষ্ক' নামে মুদ্রা অথবা স্বর্ণখণ্ড বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। সেযুগে "বলি," "শুল্ক" এবং "ভাগ" এই তিনপ্রকার রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত।

রাজনৈতিক জীবন ঃ প্রাচীনযুগে আর্যদের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার লইয়া গঠিত হইত গ্রাম। গ্রাম ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। গ্রামের

রাষ্ট্রের ভিত্তি গ্রাম

কর্তাকে বলা হইত গ্রামণী। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি "বিশ" বা "জন" গঠিত হইত। আদিযুগে ভরত, পুরু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্বাসা এই পাঁচটি জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি যুদ্ধের ফলে 'ভরত' জন সর্বপ্রধান হইয়া উঠে এবং তাহাদের নামেই দেশের নাম হয় ভারত। জন বা বিশের অধিপতিকে বলা

নিয়মতান্ত্রিক রাজা

হইত বিশপতি বা রাজন্। বৈদিকযুগের সুরুতে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম দিকে রাজা নির্বাচিত হইতেন। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইত 'সভা' এবং জনগণকে লইয়া গঠিত হইত 'সমিতি'। রাজ্যশাসন ব্যাপারে রাজাকে সভা ও সমিতির পরামর্শ লইতে হইত।

পরবর্তীকালে রাজপদ বংশানুক্রমিক এবং রাজশক্তি নিরঙ্কুশ হইয়া যায়। অবশ্য অভিষেককালে রাজাকে শপথ করিতে হইত যে, তিনি স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হইবেন না।

বৈদিকযুগের শেষভাগে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সাম্রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হয়। একরাট, সম্রাট, রাজচক্রবর্তী হইবার আকাঙ্খা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে বৈদিকশাস্ত্রে 'রাজসূয়',

রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের উদ্ভব

'বাজপেয়' এবং 'অশ্বমেধ' যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি আছে। এই সকল যজ্ঞ করিয়া বিজয়ী রাজা নিজের সার্বভৌম অধিকার ঘোষণা করিতেন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিত, সেনানী বা সেনাপতি এবং গ্রামণী ছিল প্রধান। সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকিত। ধনুর্বাণ, কুঠার, তরবারি ও বর্শা ছিল সে যুগের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়

বৈদিক যুগের শেষভাগে বর্ণাশ্রম প্রথার কঠোরতা জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত আচার ক্রমে অত্যাচারে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানাপ্রকার সামাজিক বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ এই ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উপনিষদের অধ্যাত্ম আলোচনা শিক্ষিত হৃদয়বান ব্যক্তির মনে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ করিয়াছিল। নিষ্ঠুর পশুবলির পরিবর্তে অহিংসার প্রতি লোকের মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকে। চার্বাকের শূন্যবাদ এবং আজীবক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য বিরোধী বহু মতবাদ প্রচারিত হয়। আচার-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী এই সকল মতবাদের মধ্যে দুইটি মতবাদ বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে। তাহারা হইল জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মমত।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

জৈনধর্ম ঃ প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষ এই ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রথম জনের নাম ঋষভ এবং শেষ দুইজনের নাম যথাক্রমে পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর। ঐতিহাসিকগণের মতে পার্শ্বনাথ হইলেন জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। "জৈন" নামটি অবশ্য মহাবীরের 'জিন' অর্থাৎ জয়ী উপাধি হইতে উৎপন্ন। মহাবীর অজ্ঞতাকে জয় করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 'জিন' নামে অভিহিত হইতেন।

উৎপত্তি

পার্শ্বনাথ কাশীর এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পার্শ্বনাথ



মহাবীর

মহাবীর ঃ পার্শ্বনাথের তিরোধানের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে মহাবীর আবির্ভূত হন। সংসার জীবনে তাঁহার নাম ছিল বর্ধমান। তিনি প্রাচীন বৈশালীর

(বর্তমানে বিহার প্রদেশের মজঃফরপুর জেলার বেসার গ্রাম) উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সিদ্ধার্থ। তিনি জ্ঞাতৃক নামে এক ক্ষত্রিয় বংশের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। মহাবীরের মাতা ত্রিশলা ছিলেন বৈশালীর লিচ্ছবিবংশের রাজকন্যা। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বর্ধমান সাধারণ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল যশোদা। তাঁহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মাতাপিতার মৃত্যুর পর বর্ধমান সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তী জৃম্ভিকগ্রামে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মহাবীর এবং জিন অর্থাৎ রিপুজয়ী। মহাবীর তাঁহার জীবনের পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কাল ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। বুদ্ধদেবের লোকান্তর প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পরে বাহাত্তর বৎসর বয়সে বর্তমান পাটনা জেলার পাবা নামক গ্রামে মহাবীর আনুমানিক ৪৬৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে দেহত্যাগ করেন।

জৈন ধর্মমত ঃ পার্শ্বনাথ তাঁহার শিষ্যগণকে "চাতুর্যাম" বা চারিটি বিষয়ে সংযম বা চারিটি নিয়ম পালন করিবার উপদেশ দিতেন। এই চারিটি "যাম" হইল—(১) অহিংসা—কাহাকে হিংসা করিও না, (২) অনৃত—কখনও মিথ্যা কথা বলিও না ; (৩) অস্তেয়—চুরি করিও না, এবং (৪) অপরিগ্রহ—সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে ; কেহ স্বেচ্ছায় দান না করিলে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। পার্শ্বনাথের এই চারিটি উপদেশের সহিত মহাবীর আর একটি নিয়ম যোগ করেন—ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা "ইন্দ্রিয় জয় করিবে।'

জৈনেরা বেদকে অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত এবং নিত্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বৈদিক যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করেন না। জৈনেরা বলেন যে বস্তুমাত্রেরই আত্মা আছে। বৃক্ষলতা, পুষ্প, নদী, পর্বত সকলই প্রাণময়। সুতরাং কেবলমাত্র প্রাণী বলিয়া পরিচিত জীবদের ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রে অহিংসা পালন অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেন যে, অনন্ত স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর এই বিশ্বের স্রষ্টা এবং ঈশ্বরই জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। জৈনেরা এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন না। জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক মানবাত্মাই পূর্ণশক্তির আধার। জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষের মধ্যেই মানবাত্মার অনন্তশক্তির পরম বিকাশ হয়। তীর্থঙ্করেরা এইরূপ সিদ্ধ এবং জিন পুরুষ ছিলেন। অতএব তাঁহাদের পূজা করা উচিত। জৈনেরা অবশ্য হিন্দুদের মতই জন্মান্তর ও কর্মবাদে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে জন্মান্তর ও কর্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের নাম মুক্তি। কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা এই মুক্তিলাভের পথ সুগম হয়।

জৈনধর্মের প্রসার ও সংগঠন ঃ মহাবীর স্বয়ং মগধ, অঙ্গ, মিথিলা এবং কোশলে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যেও জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। তবে বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে প্রসারিত হয় নাই। বর্তমানকালে জৈনধর্ম প্রধানতঃ রাজপুতানা এবং গুজরাট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় মহীশূর অঞ্চলে জৈনদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ

বিহারে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তখন ভিক্ষু ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে বহু জৈন দক্ষিণভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

পার্শ্বনাথ অহিংসা এবং ভিক্ষুব্রতের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। এইজন্য জৈনেরা রাত্রে আগুন জ্বালাইতেন না, পাছে কোন কীটপতঙ্গ পুড়িয়া মরে। যাহাতে কোন পোকা-মাকড় মুখের মধ্যে যাইতে না পারে এইজন্য তাঁহারা মুখে কাপড় বাঁধিয়া রাখিতেন। এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ভিক্ষুগণ শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন।

মহাবীর ইন্দ্রিয় জয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি যাহাতে আসক্তি জন্মিতে না পারে তাহার জন্য তিনি পরিধেয় বস্ত্রটিও ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকারে বন্ধনহীন বা নির্গ্রন্থ হইবার উপদেশ তিনি দিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পাটলিপুত্রে জৈনগণের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জৈনদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত হইতে বিহারে প্রত্যাগত জৈনগণ এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হন এবং বস্ত্র ত্যাগ সম্বন্ধে মহাবীরের নির্দেশ লঙ্ঘন করেন। যাঁহারা মহাবীরের মতই উলঙ্গ থাকিলেন, তাঁহাদের বলা হইল "দিগম্বর"। আর যাঁহারা পূর্বের ন্যায় শ্বেতবস্ত্র পরিধানের পক্ষপাতী হইলেন, তাঁহাদের বলা হইল "শ্বেতাম্বর"। বর্তমানে অবশ্য দিগম্বর সম্প্রদায়ও বস্ত্রাদি পরিধান করেন। জৈনদের মধ্যে এখন ভিক্ষুর সংখ্যা খুবই কম, গৃহীর সংখ্যাই অধিক।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর

জৈনধর্মগ্রন্থ ঃ মহাবীর প্রচারিত ধর্মমত ও বাণী চৌদ্দটি অংশে বিভক্ত এক সঙ্কলনে গ্রথিত করা হইয়াছিল। ইহাকে বলা হইত "পূর্ব" অর্থাৎ প্রাচীন সঙ্কলন। পাটলিপুত্র সম্মেলনে ভিক্ষু স্থূলভদ্র এই চৌদ্দটি পূর্বের মধ্যে দশটিকে উপস্থিত করেন এবং এই দশটি 'পূর্ব' অবলম্বনে দ্বাদশটি 'অঙ্গ' রচিত হয়। তৎকালে প্রচলিত জৈনধর্মের শিক্ষাসমূহ এই 'অঙ্গ' গুলিতে নিবদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুজরাটের বলভীনগরে জৈনদের আর একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বাদশ "অঙ্গ"টি তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব এগারোটি অঙ্গ অবলম্বনে জৈনধর্মগ্রন্থ নূতন ভাবে রচিত হয়। এই সম্মেলনে জৈন ধর্মগ্রন্থকে 'অঙ্গ', 'উপাঙ্গ', 'মূল' এবং 'সূত্র' এই চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। জৈনদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অর্ধমাগধী নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

পূর্ব- অঙ্গ- উপাঙ্গ- সূত্র

বৌদ্ধধর্ম ঃ জৈনধর্মের মতই বৌদ্ধধর্ম বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদ রূপেই উদ্ভূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এই ধর্মমত প্রচার করেন বলিয়া ইহাকে বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি, ইন্দোচীন, চীন, জাপান, তিব্বত এবং মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। মৌর্য সম্রাট অশোক, কুষাণরাজ কণিষ্ক, থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধন, বাঙলাদেশের পাল রাজগণ

উৎপত্তি ও প্রসার

প্রভৃতির আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব না থাকিলেও ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণভূমি, সিংহল এবং জাপানে এখনও বৌদ্ধধর্মই প্রধান ধর্ম।

গৌতম বুদ্ধ: বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন গৌতম। তাঁহার অপর নাম ছিল শাক্য সিংহ সিদ্ধার্থ। তাঁহার পিতা শুদ্ধোধন নেপাল তরাই অঞ্চলের শাক্যবংশীয়দের গণরাষ্ট্রের নায়ক ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন শাক্যরাষ্ট্রের দেবদহ নগরের রাজকুমারী মায়াদেবী।



বুদ্ধমূর্তি

শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী বনে গৌতমের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের সন তারিখ অজ্ঞাত হইলেও তিনি যে মগধরাজ বিম্বিসার এবং জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। রাজপ্রাসাদের বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হইলেও বাল্যকালেই গৌতমের মনে ধর্মভাব এবং অহিংসার উন্মেষ হইয়াছিল। কৈশোরে তিনি ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষাত্রজনোচিত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য রাজা শুদ্ধোধন অল্পবয়সেই পুত্রের বিবাহ দেন। বিবাহকালে গৌতমের বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল গোপা বা যশোধরা। গৌতমের বয়স যখন উনত্রিশ বৎসর তখন তাঁহার পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ করে। ইতিপূর্বেই গৌতমের মনে সাংসারিক সুখের প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল। কি ভাবে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় অহোরহ সেই চিন্তাই তিনি করিতেন। এখন গৌতমের মনে আশঙ্কা হইল পুত্রবাৎসল্য তাঁহাকে নূতন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। অতএব সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে একদিন গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই গৃহত্যাগ বৌদ্ধ ইতিহাসে "মহাভিনিষ্ক্রমণ" নামে পরিচিত।

মহাভিনিষ্ক্রমণ

বোধিলাভ

গৃহত্যাগের পর গৌতম বৈশালী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। রাজগৃহে দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কৃচ্ছ্রসাধনে রত হন। কিন্তু ইহার দ্বারা তিনি অভীষ্ট শান্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। তখন একদিন তিনি গয়ার নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা বা বর্তমান ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত উরুবিল্ব নামক স্থানে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে গভীর ধ্যানে বসিলেন। পরম সত্য এইবার তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইল; তিনি বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। বোধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার



ছয় বৎসর তপস্যান্তে

তপস্যার স্থান পরবর্তীকালে বুদ্ধগয়া নামে খ্যাত হইল এবং যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন তাহার নাম হইল বোধিদ্রুম।



বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ

বোধি লাভকালে গৌতমের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর। বুদ্ধ হইবার পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি কাশী, কোশল, মগধ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন। রাজগৃহ, কপিলাবস্তু এবং শ্রাবস্তী নগরীতে বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বারাণসীর নিকটবর্তী ঋষিপত্তন বা বর্তমানের সারনাথ গ্রামের মৃগদাব বা মৃগবনে বুদ্ধদেব তাঁহার পাঁচজন শিষ্যকে

প্রথম উপদেশ দান করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে এই ঘটনা "ধর্মচক্র প্রবর্তন" নামে খ্যাত। আশী বৎসর বয়সে প্রাচীন কুশীনগরে বা বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার কাশিয়া নামক গ্রামে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের দেহত্যাগকে "মহাপরিনির্বাণ' বলা হয়।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

বুদ্ধের ধর্মমত ঃ বুদ্ধদেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করা। এ বিষয়ে তিনি চারিটি আর্যসত্য বা মহান সত্য নির্দেশ করেন। এই চারিটি সত্য হইল—(১) জগতে দুঃখের অস্তিত্ব রহিয়াছে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের আকর। (২) দুঃখের কারণও আছে। মানুষের কামনা, বাসনা ইত্যাদি হইল দুঃখের কারণ। (৩) দুঃখের নিবৃত্তি করা যায়। বাসনা নিরোধ করিলে দুঃখের কারণ বিনাশ হয়। (৪) দুঃখের কারণ বিনাশের উপায় হইল সুমহান পন্থা অবলম্বন। দুঃখের নিবৃত্তি হইলে মানুষ মুক্তিলাভ করে। ইহাকে বলা হয় "নির্বাণ"।

আর্যসত্য

নির্বাণলাভের জন্য বুদ্ধদেব আটটি সুমহান পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাদের অষ্টমার্গ বলা হয়—(১) সম্যক দৃষ্টি অর্থাৎ চারিটি আর্যসত্যের উপলব্ধি (২) সম্যক সংকল্প অর্থাৎ নির্বাণ লাভের জন্য সংকল্প গ্রহণ। সর্বজীবে করুণা ও প্রেম ইহার উপায় (৩) সম্যক বাক্ অর্থাৎ ভদ্র, প্রিয় এবং সত্য বাক্য বলা (৪) সম্যক কর্মান্ত অর্থাৎ দুষ্কর্ম হইতে বিরত থাকিয়া সৎকর্ম করা (৫) সম্যক আজীব অর্থাৎ সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা (৬) সম্যক ব্যায়াম অর্থাৎ নির্বাণলাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা। পাপের বিনাশ, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান এবং ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের উৎকর্ষ সাধন (৭) সম্যক স্মৃতি অর্থাৎ দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের উপাদান ও প্রকৃতি সম্যকরূপে বুঝিয়া তাহা মনে রাখা এবং (৮) সম্যক সমাধি অর্থাৎ সদাপ্রসন্ন এবং সচেতন অবস্থায় জগতের প্রতি আসক্তি শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে জীবন যাপন করা। এই আটটি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে। অষ্টমার্গে চলিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অহিংসা। অহিংসাব্রত পালনই বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিক্ষা।

অষ্টমার্গ

বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরুষেয়তা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের সার্থকতা স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। তবে বৌদ্ধেরা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং সংগঠন ঃ বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের বোধগম্য স্থানীয় কথ্যভাষায় মৌখিক প্রচার করিতেন। তিনি তাঁহার মত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই বা তাঁহার জীবিতকালে এবিষয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় সম্মিলিত হইয়া বুদ্ধের উপদেশাবলী পালিভাষায় গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করেন। ইতিহাসে ইহাই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল তাহার নাম

হইল ত্রিপিটক, কারণ ইহা তিনভাগে বিভক্ত। (১) সুত্তপিটক—ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণী (২) বিনয় পিটক—ইহাতে আছে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের পালনীয় কর্তব্যের নির্দেশ এবং আচার আচরণ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ (৩ অভিধর্মপিটক—ইহাতে আছে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা।

ত্রিপিটক

বুদ্ধদেব সন্ন্যাসব্রত পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। নারী এবং পুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করিবার অধিকারী। বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের বলা হইত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যশিষ্যাগণকে সংগঠিত করিবার জন্য সজ্ঘ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে এই সজ্ঘ বৌদ্ধ ধর্মের এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। বৌদ্ধেরা যে ত্রিশরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইল—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্ঘ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধর্মের চার অঙ্গ হইল মৈত্রী, মুদিতা অর্থাৎ সর্বজীবে সম অনুভূতি, করুণা এবং উপেক্ষা অর্থাৎ জাগতিক বস্তুতে অনাসক্তি।

সজ্ঘ এবং ধর্ম

পরবর্তীকালে বুদ্ধের নির্বাণলাভের দুইশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ দূর করিবার জন্য আরও তিনটি সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। প্রথম সঙ্গীতির একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয়, সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ কণিষ্কের সময় কাশ্মীর বা জলন্ধরে চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। মতভেদের ফলে বৌদ্ধগণ প্রাচীনপন্থী "হীনযান" এবং নব্যপন্থী "মহাযান" এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। কুষাণ যুগে মহাযান মত পরিপুষ্টি লাভ করে।

মহাযান ও হীনযান

হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের তুলনা ঃ উপনিষদের চিন্তাধারাকে মূলতঃ অনুসরণ করিয়াই জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। উভয় ধর্মের প্রধান কথা হইল অহিংসা। তবে জৈনেরা কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাস করেন। বুদ্ধদেব তাহা করিতেন না। পূর্ণভোগ ও পূর্ণত্যাগ তিনি এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃত জৈন ধর্ম পালন করা এক মাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে সংসারত্যাগ অপরিহার্য নহে। সজ্ঘ বৌদ্ধধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ কিন্তু জৈন ধর্মে তাহা নহে। উভয় ধর্মই জাতি ভেদ, বেদের অপৌরুষেয়তা এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না।

হিন্দুধর্মের সহিত জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিরোধ নাই। কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদে তিন ধর্মই বিশ্বাসী। অহিংসাব্রত হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দু ধর্মও ইন্দ্রিয় জয়ের আদর্শে বিশ্বাস করে। কালক্রমে হিন্দুধর্ম উদার হইয়া জৈন এবং বৌদ্ধধর্মকে আপন করিয়া লইয়াছে। বুদ্ধদেব ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। জৈন-তীর্থঙ্করগণকে হিন্দুরাও অবতার জ্ঞানে পূজা করেন। বর্তমানে জৈনরাও গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দুদেবদেবীর পূজা করেন। আচরণগত কিছু বাহ্যিক বিভিন্নতা ব্যতীত এই তিন ধর্মের মধ্যে মূলগত প্রভেদ অতি সামান্য।

(ক) বিদেশী জাতির অভিযান

পারসিক অভিযান: খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিপথে ভারতের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিদেশী জাতি অভিযান পরিচালনা করে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস, তেসিয়াস প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে পারস্যের সম্রাট কাইরুস বা কুরুষ পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধুনদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন গান্ধার, কাম্বোজ এবং মদ্র এই তিনটি রাজ্য প্রধান ছিল। তেসিয়াসের বিবরণ মতে গান্ধার রাজ্য আক্রমণ করিবার সময় এক ভারতীয় সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে কাইরুসের মৃত্যু হয়। রোমক ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন যে, কাইরুস গান্ধার জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজান্দারের নৌসেনাপতি নিয়ারকাস জানাইয়াছেন যে, কাইরুসের ভারত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

কাইরুস

কাইরুসের পৌত্র দারিয়ুস বা দারয়বৌসও ভারত আক্রমণ করেন। তিনি গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করিয়া ঐ দুই অঞ্চলকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করেন। সম্রাট দারিয়ুস এই ভারতীয় প্রদেশের জন্য ক্ষত্রপ উপাধিধারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র পারসিক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ এই ভারতীয় প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। তিনি বহু ভারতীয় প্রজাকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করিয়া ছলেন।

দারিয়ুস

দারিয়ুসের পুত্র জারেক্সিস বা ক্ষয়র্শের আমলেও উত্তর-পশ্চিম ভারত পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্ষয়র্শ গ্রীসদেশ আক্রমণ কালে ভারত হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরবর্তী পারসিক সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুস গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের নিকট পরাজিত হন। ইহার ফলে ভারতে পারসিক সাম্রাজ্যের অধিকার লোপ পায়।

ক্ষয়র্শ

গ্রীক অভিযান: গ্রীসদেশের মাসিদনের রাজা আলেকজান্দার পারস্যজয়ের পর ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা অভিসার, অস্মক, ক্ষুদ্রক, গান্ধার, তক্ষশিলা, পুরু প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম করিয়াছেন। গান্ধারের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল তক্ষশিলা রাজ্য। ঝিলম এবং চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পুরুর রাজ্য। আলেকজান্দার ভারতের প্রবেশ পথে কতকগুলি পার্বত্য জাতিকে বিধ্বস্ত করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে নৌ-সেতুর সাহায্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধেই আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

কিন্তু পুরু রাজ বহু সৈন্য এবং হস্তী লইয়া আলেকজান্দারকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। গ্রীক সম্রাট রাত্রির অন্ধকারে গোপনে ঝিলম অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে পুরুকে আক্রমণ করিলেন। পুরু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আলেকজান্দার পুরুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। তাহার পর তিনি বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবাহিনী ভারতের মধ্যে আরও অগ্রসর হইতে অসম্মত হওয়ায় অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া বালুচিস্তানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। আর একদলকে জল পথে পারস্যে প্রেরণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গ্রীক বীর নির্মমভাবে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক জাতিগুলি ধ্বংস করেন।


আলেকজান্দার

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। সিরিয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন সেলুকাস। আলেকজান্দার ভারতের বিজিত অঞ্চলে কয়েকটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই সকল উপনিবেশ সেলুকাসের শাসনাধীন হইল।

সেলুকাস

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অগ্রসর হইয়া গ্রীক উপনিবেশগুলি জয় করিয়া লইলেন। সেলুকাস তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সসৈন্যে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। বরং আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার ও হিরাটপ্রদেশ এবং বালুচিস্তানের মাকরানপ্রদেশ মৌর্য সম্রাটকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মৌর্যসম্রাট এবং গ্রীকরাজের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইল। গ্রীক-ভারতীয় এই মৈত্রী পরবর্তী মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্ব কালের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম ভারত পুনরায় গ্রীক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত মগধ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সেখানে

বাহ্লীকদেশীয় গ্রীক

ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশ হইতে আগত গ্রীকগণ নূতন রাজ্যস্থাপন করে। হিন্দুকুশ পর্বত এবং অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের নাম ছিল বাহ্লিক। প্রথমে সেলুকাসের বংশধর রাজা তৃতীয় আন্তিওকস ভারতসীমান্ত আক্রমণ

জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজান্দারের নৌসেনাপতি নিয়ারকাস জানাইয়াছেন যে, কাইরুসের ভারত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

দারিয়ুস

কাইরুসের পৌত্র দারিয়ুস বা দারয়বৌসও ভারত আক্রমণ করেন। তিনি গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করিয়া ঐ দুই অঞ্চলকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করেন। সম্রাট দারিয়ুস এই ভারতীয় প্রদেশের জন্য ক্ষত্রপ উপাধিধারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র পারসিক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ এই ভারতীয় প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। তিনি বহু ভারতীয় প্রজাকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করিয়া ছলেন।

ক্ষয়র্শ

দারিয়ুসের পুত্র জারেক্‌সিস বা ক্ষয়র্শের আমলেও উত্তর-পশ্চিম ভারত পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্ষয়র্শ গ্রীসদেশ আক্রমণ কালে ভারত হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরবর্তী পারসিক সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুস গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের নিকট পরাজিত হন। ইহার ফলে ভারতে পারসিক সাম্রাজ্যের অধিকার লোপ পায়।

গ্রীক অভিযান : গ্রীসদেশের মাসিদনের রাজা আলেকজান্দার পারস্যজয়ের পর ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা অভিসার, অশ্মক, ক্ষুদ্রক, গান্ধার, তক্ষশিলা, পুরু প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম করিয়াছেন। গান্ধারের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল তক্ষশিলা রাজ্য। ঝিলম এবং চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পুরুর রাজ্য। আলেকজান্দার ভারতের প্রবেশ পথে কতকগুলি পার্বত্য জাতিকে বিধ্বস্ত করেন এবং গ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে নৌ-সেতুর সাহায্যে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধেই আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

পথে পারস্যে প্রেরণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গ্রীক বীর নির্মমভাবে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক জাতিগুলি ধ্বংস করেন।



আলেকজান্দার

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। সিরিয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন সেলুকাস। আলেকজান্দার ভারতের বিজিত অঞ্চলে কয়েকটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই সকল উপনিবেশ সেলুকাসের শাসনাধীন হইল।

সেলুকাস

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অগ্রসর হইয়া গ্রীক উপনিবেশগুলি জয় করিয়া লইলেন। সেলুকাস তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সসৈন্যে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। বরং আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার ও হিরাটপ্রদেশ এবং বালুচিস্তানের মাকরানপ্রদেশ মৌর্য সম্রাটকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মৌর্যসম্রাট এবং গ্রীকরাজের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইল। গ্রীক-ভারতীয় এই মৈত্রী পরবর্তী মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্ব কালের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম ভারত পুনরায় গ্রীক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত মগধ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সেখানে

বাহ্লীকদেশীয় গ্রীক

ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশ হইতে আগত গ্রীকগণ নূতন রাজ্যস্থাপন করে। হিন্দুকুশ পর্বত এবং অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের নাম ছিল বাহ্লিক। প্রথমে সেলুকাসের বংশধর রাজা তৃতীয় আন্তিওকস ভারতসামান্ত আক্রমণ

করেন। কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ না করিয়া তিনি ফিরিয়া যান। তাহার পর তাঁহার জামাতা বাহ্লীকের রাজা দিমিত্রিয়ুস আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০ অব্দে অশোকের পরবর্তী সপ্তম মৌর্যরাজ বৃহদ্রথের রাজ্য আক্রমণ করিয়া আফগানিস্তান, পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের বহু অংশ অধিকার করেন। দিমিত্রিয়ুস যখন ভারত-যুদ্ধে ব্যস্ত তখন বাহ্লীক রাজ্য ইউক্রেতাইদিস নামে এক গ্রীকের হস্তগত হয়। তাহার পর হইতে দিমিত্রিয়ুস এবং ইউক্রেতাইদিসের বংশধরগণ অক্ষু হইতে পঞ্জাব-পর্যন্ত ভূ-ভাগ শাসন করিতে থাকেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাহ্লীক হইতে আগত গ্রীকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় কুড়িজন গ্রীক রাজা একশত বৎসরের কিছু বেশীকাল এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই নাম কেবলমাত্র মুদ্রা হইতে জানা যায়। তাঁহাদের বিষয়ে অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রীক রাজাদের মধ্যে মিনান্দার সমধিক প্রসিদ্ধ। কাবুল হইতে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।


মুদ্রায় মিনান্দারের মূর্তি

মিনান্দার

মিনান্দার পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শাকল বা বর্তমান শিয়ালকোট। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "মিলিন্দপঞ্হো" অর্থাৎ "মিলিন্দের প্রশ্ন" নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে মিনান্দারকে "মিলিন্দ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মিনান্দার সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০ হইতে ১৬০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

শক, পহ্লব, কুষাণ আক্রমণ ঃ

গ্রীকদের পর শকগণ ভারতে প্রবেশ করে। এই যাযাবর জাতি প্রথমে মধ্য-এশিয়ার সিরদরিয়া নদীর তীরে বাস করিত। ইউচি নামে আর এক যাযাবর জাতির আক্রমণে শকগণ তাহাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করে এবং ক্রমে বাহ্লীক এবং পারস্যের পূর্বদিকস্থ পার্থিয়া বা পারদ রাজ্য অধিকার করে। পরে তাহারা হিন্দুকুশ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রাপ্ত লিপি হইতে শক রাজগণের মধ্যে যাঁহার নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায় তিনি হইলেন মৌয়েস বা মোগা। তক্ষশিলা এবং পঞ্জাবে তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, মৌয়েসের পর আজেস বা অয়স রাজত্ব করেন। তিনি পূর্ব-পঞ্জাবের গ্রীক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মৌয়েসকে পারদবংশীয় রাজা বলিয়া মনে করেন। শকেরা ক্রমে উত্তরে তক্ষশিলা ও মথুরায় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম ও দক্ষিণের শকগণ ক্ষরাট এবং কার্দমক এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিল।

শক

ক্ষরাট শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান (১১৯-১২৪ খ্রীঃ)। তিনি মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কার্দমক শাখার শক রাজগণের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান

ছিলেন রুদ্রদামন (১৩০-১৯৫ খ্রীঃ)। জুনাগড় শিলালিপিতে তাঁহার কীর্তি বর্ণিত আছে। তিনি মালব, সৌরাষ্ট্র, গুজরাটের একাংশ এবং কোঙ্কন অধিকার করিয়া "মহাক্ষত্রপ" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রুদ্রদামনের নিকট সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী পরাজিত হইয়াছিলেন। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর পুত্র পুলুমায়ির সহিত রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ হইলে দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ভারতের শকরাজগণ ক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিতেন। শক ক্ষত্রপগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শকরাজ্য পহ্লবদের আক্রমণে ধ্বংস হয়। উজ্জয়িনীর শকরাজ্য ধ্বংস করেন গুপ্তবংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

পার্থিয়া বা পারদ হইতে আগত পহ্লবগণ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হিরাট এবং কান্দাহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক অধিকার হইতে গান্ধারের একাংশ জয় করিয়া লয়। পহ্লবগণ ক্রমে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং পঞ্জাব অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করে। পহ্লব রাজগণের মধ্যে গন্দোফারনেস সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিলেন। প্রবাদ আছে যে তাঁহার রাজত্বকালে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সন্ত থমাস ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। গন্দোফারনেস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। ইহার পর কুষাণদের আক্রমণে পহ্লব শাসনের অবসান হয়।

পহ্লব



গন্দোফারনেস-এর মুদ্রা

কুষাণেরা ছিল ইউচিজাতির এক শাখা। তাহারা প্রথমে চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বাস করিত। সেখান হইতে তাহারা বর্বর হূণদের দ্বারা বিতাড়িত হয়। পরে তাহারা অক্ষু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ রাজা কুজুল কদফিস হিন্দুকুশের দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণ আধিপত্য স্থাপন করেন। কুজুল কদফিসের পুত্র বিম কদফিস গান্ধার হইতে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ অধিকার করেন।

কুষাণ



বিম কদফিসের মুদ্রা

বিম কদফিসের পর কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন কণিষ্ক। তিনি এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর-ভারতের বারাণসী পর্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। তাঁহার তিনটি রাজধানী ছিল—একটি ভারতে পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ারে, একটি বর্তমান আফগানিস্তানের জালালাবাদের নিকটে 'হাড্ডা' নগরে এবং আর একটি বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরে 'বামিয়ান' নগরে। তুর্কিস্তানের কাশগড়, ইয়ারখন্দ এবং খোটান তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কাবুল, পঞ্জাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, সৌরাষ্ট্র এবং সম্ভবতঃ

কণিষ্ক



কাশ্মীর তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে



কণিষ্কের মুদ্রা

কণিষ্ক বিখ্যাত হইয়া আছেন। তিনিই সর্বশেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন।

কণিষ্কের পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি রাজত্ব করেন। পরবর্তী কুষাণ রাজগণ দুর্বল হইয়া পড়েন এবং কুষাণদের রাজ্য শুধুমাত্র পঞ্জাবের পশ্চিমে ও আফগানিস্তানের পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

হূণ আক্রমণ ঃ কুষাণদের পর বর্বর হূণ জাতি ভারতে প্রবেশ করে। হূণদের আক্রমণের ফলেই ইউচিরা তাহাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণেরা ভারতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের চেষ্টায় তাহারা সফল হইতে পারে নাই। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূণ জাতি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। হূণনেতা তোরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া মালব পর্যন্ত অগ্রসর হন। তোরমানের



মিহিরগুল

তোরমান ও মিহিরগুল

পুত্র মিহিরগুল গোয়ালিয়র পর্যন্ত হূণ রাজ্য বিস্তৃত করেন। হূণেরা অত্যন্ত নৃশংস ও রক্তলোলুপ জাতি ছিল। হুয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্য হূণনেতা মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া মধ্যভারত হূণ শাসনমুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরও মিহিরগুল নিবৃত্ত হন নাই। অবশেষে মান্দাসোর বা মালবের রাজা যশোধর্মা মিহিরগুলকে অতি শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। মিহিরগুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিহিরগুল ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শিয়ালকোট। মিহিরগুলের মৃত্যুর পর হূণশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

(খ) বৈদেশিক অভিযানের ফলাফল ঃ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে যখন একের পর এক বিদেশী জাতির আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ ঘটিতেছিল, তখন ঐ অঞ্চল বহু ক্ষুদ্র এবং খণ্ডরাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কতকগুলিতে রাজতন্ত্র, আবার কতকগুলিতে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত অপর সকলেই বিনাযুদ্ধে বিদেশী আক্রমণকারীকে অনুপ্রবেশ

করিতে দেয় নাই। বিদেশী শত্রুর সৈন্যসংখ্যার তুলনায় নিজেদের লোকবল নগণ্য হইলেও, সমরোপকরণ নিতান্ত স্বল্প হইলেও, অধিকাংশ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রাণপণে বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধা দিয়াছিল এবং নিতান্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সামর্থ্যে এবং বীরত্বে ভারতবাসী কোন বিদেশীর তুলনায় হীন ছিল না। ভারতীয় সৈন্যের অস্ত্রাঘাতেই ভারত আক্রমণকারী পারসিক সম্রাট কাইরুসের মৃত্যু হইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিবিরাজ্য আক্রমণকালে ভারতীয় সৈন্যের নিক্ষিপ্ত তীরবিদ্ধ হইয়া গ্রীকবীর আলেকজান্দার মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা পুরুর বীরত্বে আলেকজান্দার মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং পুরুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রতিরোধের প্রকৃতি

তবুও ভারতভূমি পরাধীন হইয়াছিল। কারণ ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সমগ্রভাবে কোন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। আঞ্চলিক দেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধ যে ছিল না এমন নহে। বরং আঞ্চলিক মনোভাব প্রবল হওয়ায় তাহা বৃহত্তর ঐক্যের জন্য, ক্ষুদ্র, স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি ত্যাগ করিবার প্রবণতা গড়িয়া উঠিতে দেয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন বিদেশীর সমকক্ষ হইলেও সমষ্টিগত ভাবে কোন বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার অভ্যাস তাহাদের ছিল না। এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলেই এক নরগোষ্ঠী সম্ভূত না হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক জাতিবৈর সৃষ্টি হইত। তাহার ফলে বৃহত্তর পরিবেশে ব্যাপক ভাবে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠে নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই এককভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রবল বিদেশী বাহিনীর বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার উপর ছিল তক্ষশিলার রাজা অম্ভির মত ক্ষুদ্র আত্ম-স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাজাদের দেশবৈরিতা। সুযোগ্য নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। পুরুর তুলনায় আলেকজান্দার যে অধিকতর রণদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিদেশী আক্রমণকারিগণের সংখ্যাধিক্য এবং হিংস্রতা ভারতবাসীকে বিশেষভাবে পর্যুদস্ত করিয়াছিল। শক, হূণ প্রভৃতি রক্তলোলুপ হিংস্রজাতির বর্বর আক্রমণকে বারংবার প্রতিরোধ করা সুসভ্য ভারতবাসীর পক্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্ভব হয় নাই। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসাব্রতের প্রভাব এবং সম্রাট অশোকের রণবিমুখ রাষ্ট্রনীতি ভারতবাসীর মধ্যে যুদ্ধে উদ্যমহীনতা পরোক্ষে সঞ্চার করিয়াছিল। যে সুদৃঢ় সাম্রাজ্যশক্তির ভয়ে আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ী গ্রীক সেনা পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া ভারতের আরও অধিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই, সেই সুসংহত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে শক এবং হূন জাতি ভারতের অঞ্চলবিশেষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

প্রতিরোধের ব্যর্থতার কারণ

যে কোন যুদ্ধই লোকক্ষয় করে। সুতরং বারংবার বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতে প্রভূত লোকক্ষয় হইয়াছিল। মাত্র দুই বৎসরে আলেকজান্দার সিন্ধু ও পঞ্চনদের কত জনপদ ধ্বংস এবং কত অধিবাসী, কত নারী ও শিশু হত্যা করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

গ্রীকদের বিবরণমতে কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই আশীহাজার ভারতবাসী আলেকজান্দারের আক্রমণের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। পারসিক, বিশেষতঃ গ্রীক আক্রমণের ফলে স্থানীয় রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অসংখ্য ভারতবাসী বন্দী হইয়া দাসদাসীরূপে বিদেশে বিক্রীত হইয়াছিল। আবার শক, পহ্লব এবং কুষাণ আক্রমণের ফলে ভারতীয় গ্রীক রাজ্য উন্মূলিত হইয়া গিয়াছিল। হূণ আক্রমণের ফলে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

ক্ষয়-ক্ষতি

কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ পরোক্ষে কতকগুলি সুফলও লাভ করিয়াছিল। সুসভ্য পারসিক এবং গ্রীক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি লাভবান হইয়াছিল। অপরপক্ষে এই সকল দেশ ভারতবর্ষ হইতে বহু বিষয় শিক্ষা করিয়াছিল এবং সেই শিক্ষা ক্রমে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় সভ্যতাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। পারসিক সম্রাট দারিয়ুস ভারতে খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক তাঁহার শিলা অনুশাসনে এই লিপি ব্যবহার করেন। গান্ধার-শিল্প, জ্যোতিষ শাস্ত্র, মুদ্রা ও প্রতিমা নির্মাণে গ্রীক প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। বাহ্লীকদেশীয় গ্রীক রাজগণের গোলাকার মুদ্রার একপৃষ্ঠে রাজার মূর্তি, অপর পৃষ্ঠে কোন দেবমূর্তি বা অন্য কোন চিত্র অঙ্কিত হইত। তাঁহারা মুদ্রার পৃষ্ঠে নিজেদের নাম উৎকীর্ণ করিতেন। গ্রীকগণের এই মুদ্রা নির্মাণ রীতি অনুসরণ করিয়া ভারতের মুদ্রানির্মাণ পদ্ধতিও উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। পারসিকগণের এবং আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের ফলে ভারত ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভারত ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াতের পথ আবিষ্কৃত হয়। এই সকল দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ধর্ম-সাহিত্য ও শিল্পের ভাবাদর্শ বিনিময় হয়। মৌর্য-পরবর্তীযুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণ রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, তাহারা ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীকপ্রভাব সংক্রামিত করিয়াছিল।

পরোক্ষ সুফল

বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণ আলেকজান্দারের ন্যায় ভারত বিজয় করিয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া যায় নাই। তাহারা এদেশে বসবাস করিতেই আসিয়াছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল বাস করিয়া স্বাভাবিকভাবেই তাহারা সেই অঞ্চলের ভারতীয় অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা ভারতীয় ভাষা, ধর্ম এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। দিও নামে এক গ্রীকের পুত্র রাজদূত হেলিওদোরা বিষ্ণু-উপাসক হইয়া মধ্যপ্রদেশের বেসনগর বা প্রাচীন বিদিশা নগরীতে একটি গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। কুষাণ রাজগণের মধ্যে প্রথম কদফিস এবং কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুষাণরাজ দ্বিতীয় কদফিস এবং বাসুদেব শৈব ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কুষাণগণ যে সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় হইয়া গিয়াছিলেন একজন কুষাণ রাজার 'বাসুদেব' নাম গ্রহণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুষাণ সম্রাট

ধর্মগ্রহণ

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মতভেদ দূর করিবার জন্য চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে সমবেত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ত্রিপিটকের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পাঠভেদ আলোচনা করেন এবং ত্রিপিটকের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া টীকা রচনা করেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এই মহৎকার্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। মহাযান মতের ইতিহাসে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই সম্মেলনেই নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রভৃতি দার্শনিক-পণ্ডিতদের নির্দেশ অনুযায়ী মহাযান মত এবং তাহার তত্ত্ব পরিপূর্ণরূপ লাভ করে। বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির বিচিত্র ধর্মাদর্শের সহিত ভারতের ধর্মাদর্শের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। মৌর্যযুগের পর হইতে কুষাণযুগের আরম্ভ পর্যন্ত তিনশত বৎসরের মধ্যে বহু সংস্কৃতিবিহীন অর্ধসভ্য এবং অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আদি রূপ ও দার্শনিক তত্ত্ব তাহাদের বোধগম্য হইত না। নবাগত এই সকল জাতিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য বৌদ্ধধর্মেও বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা প্রচলিত হইল। ফলে বৌদ্ধধর্মে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্মের এই পরিবর্তিত নবরূপ "মহাযান" নামে পরিচিত হয়। মহাযান মতে নানা দেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হয় এবং মহাযান মত বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পালিভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইতে থাকে। তাহার ফলে বৌদ্ধধর্মের সহিত লৌকিক হিন্দুধর্মের প্রভেদ হ্রাস পাইল এবং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার পরিগণিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন। বহু ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মমতের মিশ্রণের ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্মেও পরিবর্তন দেখা দেয় এবং বেদ-পুরাণ বহির্ভূত নানা দেবদেবীর-পূজা হিন্দুধর্মে প্রচলিত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

কুষাণযুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার সহিত রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনের ফলে এই সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছিল। কুষাণযুগেই কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনদেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। পহ্লববংশীয় রাজা গন্দোফারনেসের সময়ে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সন্ত থমাস ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন।

গান্ধারশিল্প

বিদেশীরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিদেশী শিল্পাদর্শের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন গান্ধার অঞ্চলে ভাস্কর্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা প্রচলিত হইলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক ভাস্কর এবং গ্রীক আদর্শে শিক্ষিত ভারতীয় শিল্পীগণ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল। ফলে অনেক বুদ্ধমূর্তিতে গ্রীকদেবতা আপোলোর আভাস সুস্পষ্ট দেখা যায়। গান্ধারের শিল্পীগন মূর্তিনির্মাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভাবের চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। তবে বিদেশীয় রীতি অনুসরণ করিলেও ভারতীয় শিল্পীগণ নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিল। সেকালে ভারতীয়

মূর্তিকে গ্রীক বেশবাসে সজ্জিত করা হইত। মথুরার শিল্পের উপরও গান্ধার শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মথুরায় প্রাপ্ত সম্রাট কাণষ্কের মস্তকহীন একটি প্রস্তর মর্তি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় শিল্পের প্রসার

কুষাণযুগে ধর্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কুষাণযুগের শিল্পকলাও রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতের আদর্শে মধ্য-এশিয়ায় বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছিল। চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধ গুহা এবং গুহার ভিতর যে সকল বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়, তাহাদের শিল্প কৌশল দেখিলেই ভারতীয় শিল্পের প্রভাব ধরা পড়ে। সিংহল, শ্যামদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, প্রভৃতি অঞ্চলে সেইযুগের আদর্শে নির্মিত বহু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানী বুদ্ধের পরিকল্পনা কুষাণযুগেরই সৃষ্টি।



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

মূলতঃ বিদেশী হইলেও নবাগত রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। শক রাজা রুদ্রদামন স্বয়ং ব্যাকরণ, ন্যায় এবং অর্থশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তক্ষশিলা অঞ্চলের বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকেরা বহু সমাদরে মহাভারত পাঠ করিতেন। কণিষ্ক তাঁহার রাজসভায় বহু গুণী ব্যক্তিকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, পার্শ্ব এবং বসুমিত্র। চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতির উদ্যোক্তা ছিলেন পার্শ্ব এবং বসুমিত্র এই সঙ্গীতির সভাপতি হইয়াছিলেন। কণিষ্কের সভাকবি ছিলেন অশ্বঘোষ। কণিষ্কের চিকিৎসক চরক রচনা করেন বিখ্যাত 'চরক-সংহিতা'। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সুশ্রুত এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনি এই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সিন্ধুনদের তীরবর্তী আটকের নিকটস্থ শলাতুর গ্রামে পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

সাহিত্য

বিদেশী জাতিগুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ভারতের বাণিজ্য অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ স্থলপথে মধ্য-এশিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়া রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত এবং বাণিজ্য তাহাদের প্রচুর ধনাগম হইত। রোম সাম্রাজ্যের সহিত সমুদ্র পথেও ভারতের বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। রোমক ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন যে, বিলাস, ব্যসনের উপকরণ এবং মসলাপাতি ক্রয়ের জন্য প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রোম হইতে ভারতে আসিত। এই সময়ের বহুসংখ্যক রোমক স্বর্ণমুদ্রা ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরবাসী একজন গ্রীক লোহিত সাগর এর উপকূল পথে ভারতে আসিয়াছিলেন। "পেরিপ্লাস" নামক গ্রন্থে তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় ভারতের পশ্চিম

বাণিজ্য

উপকূলে অবস্থিত ভৃগুকচ্ছ বন্দর হইতে কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যবর্তী উপকূলে সেকালে বহু সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। চীন দেশের সহিত স্থল ও জলপথে ভারতের অবিরাম বাণিজ্য চলিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত 'চীনাংশুক' এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত 'চীনপট্ট' এই বাণিজ্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। 'পেরিপ্লাস' এর বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, চীন হইতে রেশমীবস্ত্রাদি বাহ্লীক দেশের পথে ভারতে আমদানী হইত। বাঙলাদেশের তাম্রলিপ্ত ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

শাসনব্যবস্থায় বিদেশীপ্রভাব

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা ক্ষেত্রেও বিদেশীগণের কিছু অবদান আছে। পারসিক সাম্রাজ্যে 'স্যাট্রাপ' উপাধিধারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইত। এই উপাধি এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি ভারতেও প্রচলিত হয়। ভারতের শকরাজগণ নিজেদের 'ক্ষত্রপ' আখ্যা দিতেন।

হিন্দুসমাজের কলেবর বৃদ্ধি

বিদেশীর সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের সমাজব্যবস্থাই সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছিল। গ্রীক, কুষাণ, শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলি ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। এই জাতি-সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের প্রাণধর্ম বিকশিত হইয়াছে। ভারত সকলকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কাহাকেও বর্জন করে নাই। সকল বিদেশী জাতিই ভারতীয় সমাজের "এক দেহে লীন" হইয়া গিয়াছে। অশ্বঘোষ সেই প্রাচীনযুগেই জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করিয়া 'বজ্রসূচী' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রাজপুত গোষ্ঠির উদ্ভব ঃ ভারতীয় সমাজে যে সকল বিদেশীজাতিকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুসমাজের চারিবর্ণের মধ্যে তাহাদের স্থান নির্দেশ করিবার প্রশ্ন এবং প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই সকল বিদেশী জাতি প্রধানতঃ যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল, তাহারা রাজ্যস্থাপন এবং রাজ্যবিস্তারও করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা ছিল না। ইহাদের নায়কেরা অবশ্যই রাজা এবং রাজপুত্র। অতএব 'রাজপুত' এই নামটি ইহাদের সকলের সাধারণ পরিচয় হইয়া গেল।

এই সকল বিদেশী জাতির 'ভারতীয়করণ' সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভারতীয় পুরাণে ঘোষণা করা হইল যে, রাজপুতেরা কেহ প্রাচীন ভারতের সূর্যবংশ, কেহ বা চন্দ্র বংশজাত। বলা হইয়াছে যে, প্রতিহার বংশের আদিপুরুষ অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজা হইলে লক্ষ্মণ একবার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিহারী বা দ্বার রক্ষক হইয়াছিলেন। এই জন্যই লক্ষ্মণের বংশধরগণ প্রতিহার নামে পরিচিত হন।

পৌরাণিক কাহিনী

পরমার, প্রতিহার, শোলাঙ্কী এবং চৌহান রাজপুতগণের প্রধান চারিটি বংশ যে ভারতীয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মহাভবিষ্যপুরাণে বলা হইল যে, অর্বুদ পর্বতে (আবু পাহাড়) ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞ কালে অগ্নিকুণ্ড হইতে এই রাজপুতগণের চারজন পূর্বপুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল। এই চার বীর

হইতে কালক্রমে ছত্রিশটি রাজপুত গোষ্ঠির জন্ম হয়। রাজপুতানার ইতিহাস-প্রণেতা গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ এবং সি. ভি. বৈদ্য রাজপুতগণকে সূর্য এবং চন্দ্রবংশজাত বলিয়া স্বীকার করেন।

যাঁহারা পুরাণের অলৌকিক কাহিনী এবং কিম্বদন্তীতে আস্থা স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তরভারতে যে সকল হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেগুলির শাসকগণ রাজপুত বলিয়া পরিচিত, তাহারা শক, কুষাণ এবং হূণজাতির বংশধর। শক, কুষাণ, হূণ এবং তাহাদের সহিত আগত বৈদেশিকেরা প্রধানতঃ পঞ্জাব এবং রাজপুতানার অধিবাসী হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের প্রারম্ভে উত্তর ভারতের এই অঞ্চলে পাঁচটি প্রধান রাজপুতবংশ রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। তাহারা হইল গুজরাটের চৌলুক্য বা শোলাঙ্কী রাজপুত, জব্বলপুর বা দাহলের চেদীবংশ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল রাজপুত, দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশ এবং কনৌজের গাহড়বাল রাজপুত।

বিদেশীর বংশধর

রাজস্থানের কাহিনীগুলির সঙ্কলয়িতা কর্ণেল টড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজপুতেরা শকজাতির বংশধর। কোন কোন রাজপুতগোষ্ঠি যে বিদেশী বংশ হইতে উদ্ভূত, শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে তাহা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়। হূণগণের সহিত গুর্জর নামে এক বিদেশী জাতি-গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতের গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশ যে ইহাদের পরবর্তী পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। টড তাঁহার গ্রন্থে যে সকল রাজপুত গোষ্ঠির বিবরণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠির নাম হূণ। রাজপুত গোষ্ঠির মধ্যে যাহারা সূর্যের উপাসক তাহারা বিদেশী বংশসম্ভূত। রাজপুতগণের উপাস্য দেবতার প্রকৃতি, ধর্মোৎসব পদ্ধতি সতীদাহ প্রথা, অশ্বপ্রীতি, মৃগয়া ও সমরোৎসব প্রভৃতি বিষয়ের সহিত শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতির ঐ সকল বিষয়ের বহু সাদৃশ্য দেখা যায়।

কর্ণেল টডের অভিমত

তবে রাজপুতগণের সকল গোষ্ঠিই যে বিদেশী বংশোদ্ভূত তাহা বলা যায় না। মধ্যভারতের চন্দেল্ল নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ অনার্য গোন্দজাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। রাজপুতগণের মধ্যে যাহারা নাগ ও সর্পের উপাসক, তাহারা সম্ভবতঃ ভারতের আদিম নরগোষ্ঠির উত্তরাধিকারী। রাজপুতগণের দৈহিক গঠনের সহিত আর্যদের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং রাজপুতগণের মধ্যে আর্যদের উত্তরাধিকারও আছে। প্রকৃতপক্ষে আর্য, আদিম ভারতীয় এবং ভারতে আগত বিদেশীজাতির সংমিশ্রণে রাজপুতগণের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া তাহারাই হিন্দুসমাজ ও ধর্মরক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া উত্তরভারতে মুসলমানদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টাকে বাধা দিয়াছিল। রাজপুত রাজ্যগুলির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরভারতে হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটে।

মিশ্র বা সঙ্করজাতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের প্রয়াস

সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াস ঃ

ভারতবর্ষে বিদেশীগণের রাজ্যবিস্তারের মূলে ছিল ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্য। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্মিলিতভাবে বাধা দেয় নাই বলিয়াই গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের পক্ষে সহজে ভারত অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছিল। আর্যাবর্তে অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অবশ্য কয়েক শতাব্দী পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। যাহার ফলে আলেকজান্দারের ভারত অভিযানকালে সুবিশাল মগধ সাম্রাজ্যের শক্তির ভয়ে গ্রীক সৈন্যবাহিনী ভারতের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই।

ষোড়শ মহাজনপদ

মহাবীর এবং বুদ্ধদেবের সমকালে ভারতবর্ষে ষোলটি মহাজনপদ বা রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক প্রভৃতি আটটি গোষ্ঠী লইয়া গঠিত মিথিলার বৃজি গণরাষ্ট্র সেকালে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। ক্রমে গণরাষ্ট্রগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া রাজতন্ত্র প্রধান হইয়া উঠে এবং উত্তর ভারতে অবন্তী, বৎস, কোশল এবং মগধের রাজবংশ সাম্রাজ্য গঠনের পথে অগ্রসর হয়। ইহাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে মগধ। মগধরাজের অধীনে ভারতবর্ষে এক সুসংহত রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোশলরাজ ক্রমে কাশীরাজ্য এবং কপিলবাস্তুর শাক্যগণতন্ত্রগুলি অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন। অপরদিকে অঙ্গরাজ্য এবং বৃজি গণরাষ্ট্র অধিকার করিয়া মগধরাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। ইহার ফলে কোশল ও মগধের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয় এবং পরিশেষে মগধ বিজয়ী হইয়া সাম্রাজ্য গঠন করে।

মগধ সাম্রাজ্য ঃ

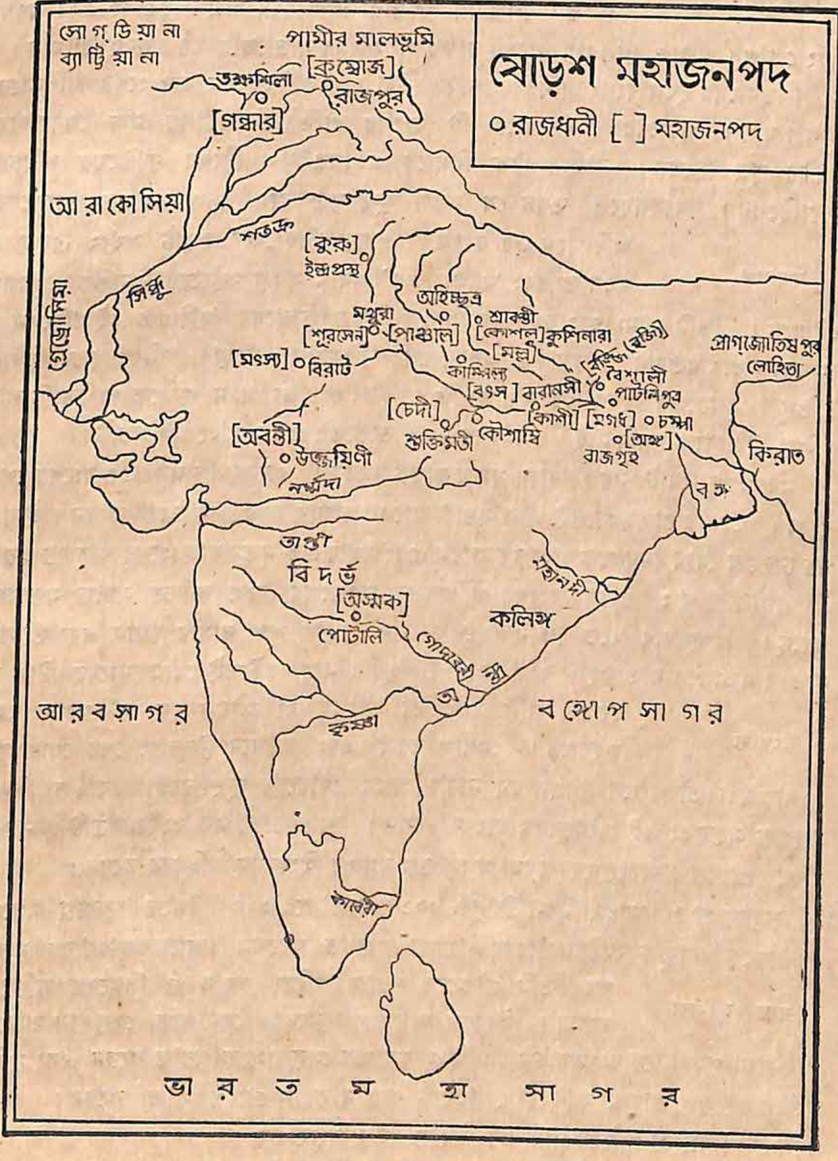
বিম্বিসার

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্য পত্তনের সূচনা করেন। প্রথমে তাঁহার রাজধানী ছিল গিরিব্রজে। পরে তিনি রাজগৃহে বা বর্তমান পাটনা জেলার রাজগীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরেই তিনি অঙ্গরাজ্য জয় করেন। রাজনীতিকুশলী বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি কাশী কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল দেবী, লিচ্ছবি নায়কের কন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজকন্যা বাসবী এবং মদ্র রাজকন্যা খেমাকে বিবাহ করেন।

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার

করেন। ইহাতে কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ এবং বৈশালীর বৃজি, পাবা ও কুশীনগরের মল্ল রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। অজাতশত্রু এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বৃজি গণরাষ্ট্রকে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে কাশীরাজ্য সমর্পণ করেন এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া

অজাতশত্রু



সন্ধি স্থাপন করেন। অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলি গ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। পাটলি গ্রাম পরে বিখ্যাত পাটলিপুত্র নগরে পরিণত হয়।

শিশুনাগ

অজাতশত্রুর পর তাঁহার বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে শিশুনাগ নামে একজন মন্ত্রী মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং শিশুনাগ বংশের রাজত্ব সুরু হয়। শিশুনাগ অবন্তীরাজ্যকে মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বৎস এবং কোশল রাজ্যও শিশুনাগ বংশের রাজত্বকালে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

নন্দবংশ

শিশুনাগের দুর্বল বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়া মগধের সিংহাসন নন্দবংশের অধিকারে চলিয়া যায়। পুরাণের বর্ণনানুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ ক্ষৌরকার শ্রেণীর শূদ্র ছিলেন। রাজ্যসংগঠক হিসাবে মহাপদ্ম নন্দ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্তে তখন যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল মহাপদ্ম তাহাদের অধিকাংশ জয় করেন। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট' অর্থাৎ একচ্ছত্র নরপতি এবং 'সর্বক্ষত্রান্তক' অর্থাৎ সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী বলা হইয়াছে। তিনি যমুনা এবং চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিপতি হইয়াছিলেন। কলিঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইতিপূর্বে ভারতের অপর কোন রাজা এত বড় সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ নাই। মহাপদ্ম নন্দই ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট।

নন্দবংশের মোট নয়জন রাজা মগধে রাজত্ব করেন। ধননন্দ ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার রাজত্বকালেই গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার ভারত অভিযান করেন। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধননন্দকে পরাভূত করেন এবং মগধে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়।

উৎপত্তি

মৌর্য বংশ: মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিন্দুপুরাণ মতে তিনি জনৈক নন্দ রাজার শূদ্রা দাসীর সন্তান এবং তাঁহার মাতা (মতান্তরে মাতামহী বা পিতামহী) মুরার নাম হইতেই মৌর্য নামের উৎপত্তি হয়। পালি সাহিত্যে মোরিয় বা মৌর্যকুলকে ক্ষত্রিয়বংশ বলা হইয়াছে। নেপাল তরাই এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পিপ্পলীবন নামক স্থানে মৌর্যদের ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ এই মৌর্যকুলের নায়ক ছিলেন। অত্যাচারী নন্দ বংশীয় সম্রাট ধননন্দের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষের সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

চন্দ্রগুপ্ত: আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ (মতান্তরে ৩২৪) অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের নন্দরাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য হস্তগত করেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তিনি গ্রীকদের পরাস্ত করিয়া পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। ইহাতে আলেকজান্দারের সেনাপতি সেলুকাস ভারতে গ্রীকরাজ্য পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাস্ত করেন এবং সন্ধির শর্তমত চন্দ্রগুপ্ত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট এবং মাকরান প্রদেশ লাভ করেন। ইহার ফলে মৌর্যসাম্রাজ্য পশ্চিমে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

গ্রীক বিবরণ মতে চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মালবরাজ্য জয় করেন। সৌরাষ্ট্রও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। প্রবাদ আছে যে, দাক্ষিণাত্যে মহীশূর পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। জৈন কিম্বদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় জৈনধর্ম রীতি অনুসারে অনশনে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রবাদ আছে যে, চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' হইতে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রীকরাজ সেলুকাস কান্দাহারবাসী মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রীক রাজকর্মচারীকে দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস বহুদিন পাটলিপুত্রে বাস করিয়া মৌর্যশাসন পদ্ধতি, রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বহুতথ্য একগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে এই গ্রন্থটির অংশবিশেষ পাওয়া যায়। তাহা হইতে মৌর্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করা হয়।

মৌর্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদান

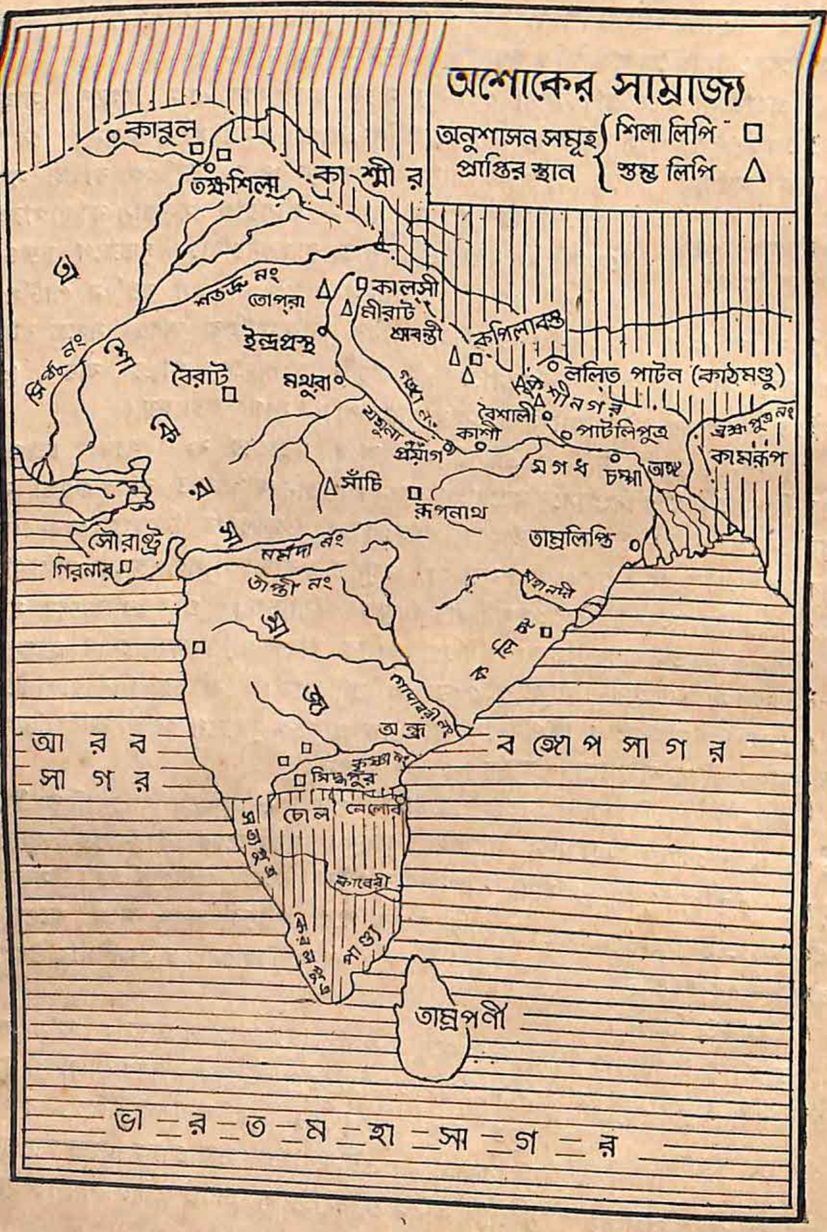
বিন্দুসার ঃ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে (মতান্তরে ২৯৮ অব্দে) চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অমিত্রঘাত বা শত্রুহন্তা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুবরাজ অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালেই সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে মহীশূরের উত্তরাংশে মৌর্যবংশের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক রাজগণের সহিত বিন্দুসারের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সিরিয়ার গ্রীক রাজা আন্তিওকস মৌর্য রাজসভায় দেইমেকস নামে তাঁহার এক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিশরের গ্রীক রাজা টলেমি ফিলাদেলফস মৌর্যরাজ্যে দিওনিসাস নামে এক গ্রীককে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিন্দুসারও এই সকল রাজ্যে নিজের দূত প্রেরণ করেন।

অশোক ঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোকবর্ধন আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পালিগ্রন্থের বিবরণমতে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই সিংহাসন লাভের চারি বৎসর পরে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। পিতার রাজত্বকালে অশোক উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলার উপরাজ বা শাসনকর্তা ছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের নয় বৎসর পরে অশোক কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। কলিঙ্গদেশ তখন সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে কলিঙ্গ বিজয়ের বিবরণ আছে। এই যুদ্ধে "এক লক্ষ লোক নিহত হয় এবং দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়।" যুদ্ধশেষে কলিঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

কলিঙ্গ বিজয়

পুরী জেলার তোশালী নগরে কলিঙ্গ প্রদেশের নূতন রাজধানী স্থাপিত হইল। বিম্বিসারের সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের প্রসার শুরু হইয়াছিল, কলিঙ্গ বিজয়ে তাহা পরিসমাপ্ত হইল।



কলিঙ্গ বিজয় অশোকের জীবনে এবং ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সম্রাট অশোকের জীবনে ইহাই প্রথম ও শেষ সামরিক অভিযান। কলিঙ্গযুদ্ধে অজস্র রক্তপাতের শোচনীয় দৃশ্যে এবং আহত ও আর্তের বেদনায় ও দুঃখে সম্রাট অশোকের হৃদয় শোকে ও অনুতাপে অভিভূত হইল। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা দিগ্বিজয়ের আদর্শ ত্যাগ করিলেন। তাহার পরিবর্তে তিনি ধর্মবিজয় অর্থাৎ অহিংসা এবং মৈত্রীর দ্বারা মানবহৃদয় জয়ের আদর্শ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে এই আশ্বাস দিলেন যে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি আর কোনদিনই অস্ত্রধারণ করিবেন না।

অশোকের অনুতাপ ও মানসিক পরিবর্তন



সম্রাট অশোক

কলিঙ্গ বিজয়ের পর মৌর্য সাম্রাজ্য বিপুলায়তন হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমে অশোকের সাম্রাজ্য সিরিয়ার গ্রীকরাজ্যের সীমান্ত দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের যবন, কম্বোজ এবং গান্ধার জাতি তাঁহার অধীন ছিল। হুয়েন সাঙের বিবরণ এবং রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কাশ্মীর সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শিলালিপির প্রমাণে জানা যায় যে, উত্তরে তাঁহার সাম্রাজ্য নেপাল তরাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে হুয়েন সাঙ অশোক নির্মিত বহু বৌদ্ধ স্তূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের অপর তীরে মৌর্যসাম্রাজ্যের কোন নিদর্শন পান নাই। পশ্চিমে আরবসাগর এবং দক্ষিণে মহীশূরের উত্তরাংশ পর্যন্ত সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্যগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের বহির্ভূত এবং মিত্ররাজ্য বলিয়া সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

সাম্রাজ্যের আয়তন

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং সিরিয়ার গ্রীক অধিপতি সেলুকাসের আমল হইতেই পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজাদের সহিত মৌর্যরাজগণের মিত্রতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আন্তর্জাতিক শান্তিকামনায় এবং ধর্মবিজয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অহিংসাব্রতী সম্রাট অশোক এই মৈত্রীকে দৃঢ়তর করেন। সিরিয়ার গ্রীক রাজা আন্তিওকস থিওস, মাসিদোনিয়ার গ্রীক রাজা আন্তিগোনস, গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের অন্তর্গত এপেরাস

অথবা করিন্থের গ্রীক রাজা আলেকজান্দার, মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমি এবং উত্তর আফ্রিকার কাইরিন রাজ্যের রাজা মগস প্রভৃতি সম্রাট অশোকের মিত্র ছিলেন। মৌর্য সম্রাট এই সকল গ্রীক রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এই সকল মিত্র রাজ্যে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুদূরবর্তী রাজ্যসমূহের সহিত এইরূপ মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন, একাধারে মৌর্যসম্রাট অশোকের শক্তি এবং উদারতার পরিচয় দান করে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত রাজ্যগুলিতে ধর্মবিজয়ী অশোক সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিবার জন্য ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রভাব মৌর্য-সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। একটি শিলালিপিতে অশোক বলিয়াছেন—"যে রাজ্য পূর্বে বিজিত হয় নাই, তাহা জয় করিতে গেলে হত্যা, মৃত্যু এবং বন্দীত্ব ঘটে। অতএব রণভেরীর নির্ঘোষকে অহিংসার দ্বারা ধর্ম নির্ঘোষে পরিণত করিতে হইবে।"

অশোকের পররাষ্ট্র নীতি

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অশোক বৌদ্ধধর্মের উপাসক হন। অহিংসাব্রতের আদর্শে তিনি পর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হন। দ্বাদশ শিলালিপিতে তিনি ঘোষণা করেন—"আমি সকল সম্প্রদায়ের লোককে শ্রদ্ধা করি।" অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিগুলি প্রচার করিবার জন্য তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহু শিলালিপি ছড়াইয়া দেন। জনসাধারণ যাহাতে লিপিগুলির মর্মার্থ সহজে বুঝিতে পারে সেজন্য তিনি এইগুলিকে স্থানীয় কথ্যভাষায় প্রাকৃতে, এমনকি গ্রীক ও আরামিক ভাষায় রচনা করাইয়াছিলেন। এই লিপিগুলি অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান। ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক যুত, রাজুক, প্রাদেশিক এবং ধর্মমহামাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের উপর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অনর্থক জীবহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে পশ্চিম এশিয়া, সিংহল, সুবর্ণভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে। বিশাল মানব সমাজের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপনের এমন সুমহান প্রচেষ্টা প্রাচীনকালে আর দেখা যায় নাই।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও প্রচার

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের দীর্ঘকাল পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধে পুনরায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহা গুপ্ত সাম্রাজ্য নামে খ্যাত। এই বংশের পরাক্রান্ত রাজগণ শক, কুষাণ ইত্যাদি বিদেশী রাজবংশকে ভারত-ভূমি হইতে উচ্ছেদ করেন। তাঁহাদের সামর্থ্যে ও সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইবার ফলে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প অভিনব রূপে বিকশিত হয়। একমাত্র গুপ্ত-যুগেই ভারতের মুদ্রার স্বর্ণমান নির্ধারিত হইয়াছিল। এইজন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগকে ভারত ইতিহাসের সুবর্ণ-যুগ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খ্রীঃ) : প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের তৃতীয় নরপতি। তাঁহার পূর্বপুরুষ শ্রীগুপ্ত এবং ঘটোৎকচ গুপ্ত মগধের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পরাক্রমশালী লিচ্ছবিবংশের এক রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় রাজা-রাণীর যুগলমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার রাজ্য-সীমা মগধ হইতে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। পাটলিপুত্র ছিল তাঁহার রাজধানী।



প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩৩০-৩৭৫ খ্রীঃ) : মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রধানা মহিষী কুমারদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে মগধ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান। সমুদ্রগুপ্ত পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র না হইলেও এই নির্বাচনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি এবং প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। সমগ্র আর্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। প্রয়াগের এক স্তম্ভে উৎকীর্ণ, কবি হরিষেণ বিরচিত এক প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রথমে তিনি আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, অচ্যুত, গণপতি, চন্দ্রবর্মা, বলবর্মা প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। তাহার পর তিনি ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন। মহানদী তীরবর্তী দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্র, মধ্য ভারতের অরণ্য অঞ্চল মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বেঙ্গীরাজ হস্তিবর্মা, কাঞ্চীর পহ্লবরাজ বিষ্ণু গোপ এবং ত্রিচিনোপল্লীর রাজা উগ্রসেন গুপ্ত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। আর্যাবর্তের রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে তাহাদের রাজার নিকটেই প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

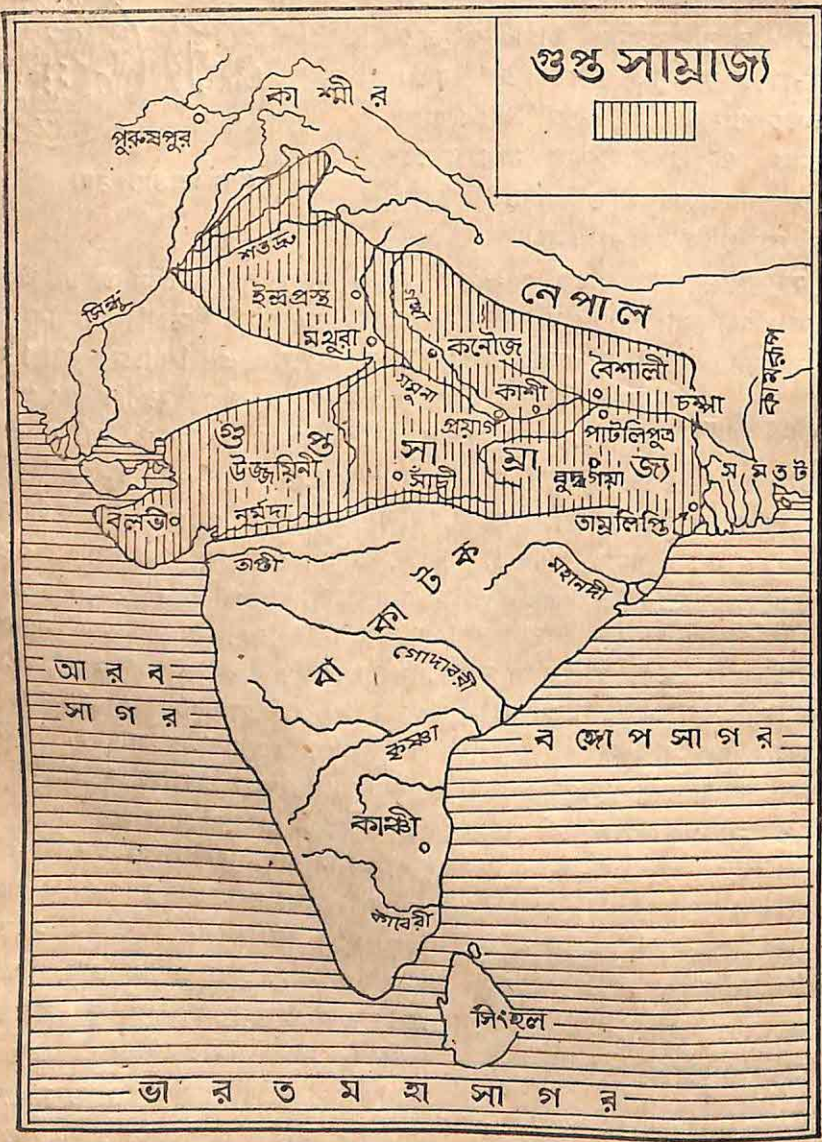
সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়

দিগ্বিজয়ের ফলে সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রাজ্য হিমালয় হইতে নর্মদা এবং চম্বল নদী হইতে পূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত ভূ-ভাগে বিস্তৃত হয়। পূর্বে কামরূপ বা আসাম, সমতট বা দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ, উত্তরে নেপাল এবং পশ্চিমে পঞ্জাব অঞ্চল তাঁহাকে কর দিয়া তুষ্ট করিত। পঞ্জাবের শতদ্রু নদীর তীরবর্তী যৌধেয়, মধ্য-পঞ্জাবের মদ্রক, রাজপুতানা ও মালবের অর্জুনায়ন, আভীর প্রভৃতি জাতি সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিত। উত্তর-পশ্চিমের শক ও কুষাণ রাজগণ এবং সিংহলের রাজা



অশ্বমেধ মুদ্রা

মেঘবর্ণ তাঁহার সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যরীতি অনুসারে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞের স্মৃতি হিসাবে তিনি যে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করেন, তাহাতে অশ্বমূর্তি অঙ্কিত আছে।



বহুমুখী প্রতিভা

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী এবং নিজে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। হরিষেণ রচিত শিলালিপিতে তাঁহাকে কবিরাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় তাঁহার বীণা বাদনরত মূর্তি অঙ্কিত আছে। নিজে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও তিনি পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুকে তিনি বহু প্রকার সাহায্য দিয়াছিলেন। চৈনিক বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি সিংহলরাজ মেঘবর্ণকে বৌদ্ধপীঠ গয়াতে একটি নূতন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। বীরত্বে, শাসন দক্ষতায়, ধর্মানুরাগে এবং সাহিত্য প্রীতিতে সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ৩৭৫-৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

রাম গুপ্ত ঃ সমুদ্র গুপ্ত তাঁহার জীবিত কালেই পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মনোনয়ন স্বীকার না করিয়া সমুদ্রগুপ্তের অপর এক পুত্র রামগুপ্ত কিছুকালের জন্য মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশাখদত্তের 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নামক নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামগুপ্ত এক শক নৃপতির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের পর রামগুপ্ত যে মগধ-রাজ হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে, কবি রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে, রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্র রচিত 'নাট্য দর্পণ' গ্রন্থে, রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের সঞ্জন তাম্রশাসনে এবং 'মজুমাহে-ই-তারিখ' নামক এক ইসলামী ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই সকল উৎস হইতে জানা যায় যে, রামগুপ্ত তাঁহার কোন ভ্রাতা, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা নিহত হন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩৮০-৪১৩ খ্রীঃ) ঃ রামগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও পিতার মত পরাক্রান্ত এবং বহুগুণশালী নরপতি ছিলেন। মধ্য-ভারতে নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি নাগ বংশের রাজকন্যা কুবের নাগাকে বিবাহ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বর্তমান বেরার অঞ্চলের বাকাটক বংশের রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত নিজের কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দেন। ইহার ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত হয়। তিনি পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণকে পরাজিত করিয়া মালব ও সুরাষ্ট্র জয় করেন। ইহাতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি শকারি নামে পরিচিত হন। পশ্চিম-ভারত শাসন করিবার জন্য তিনি উজ্জয়িনীতে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ এক

লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া বাহ্লীক দেশ পর্যন্ত ভূভাগ জয় করেন। তিনি বঙ্গের রাজাদেরও পরাজিত করেন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সম্ভবতঃ কিম্বদন্তীর উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য। দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাটকের প্রাচীন লিপিতে এবং কোন কোন মুদ্রায় তাঁহাকে বিক্রমে আদিত্য অর্থাৎ সূর্যের মত এবং পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর অধিপতি বলা হইয়াছে। অনুমান হয় যে, তিনিই প্রসিদ্ধ নবরত্ন সভার পৃষ্ঠ-পোষক শকারি বিক্রমাদিত্য। বীরসেন নামে বিখ্যাত কবি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন।



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

কুমারগুপ্ত (আনুমানিক ৪১৪-৪৫৫ খ্রীঃ) : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র কুমার-গুপ্ত মগধের সম্রাট হন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী পুষ্যমিত্র নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি তাঁহার সাম্রাজ্যে উপদ্রব করিতে থাকে। পিতার আদেশে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্রগণকে দমন করেন। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষভাগে বর্বর হূণ-দল মধ্যএশিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে থাকে। হূণদের বারংবার আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত কোন ক্রমে হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আশু বিনাশ হইতে রক্ষা করেন। কুমার গুপ্তের রৌপ্য মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৩৬ গুপ্ত সম্বৎ (৪৫৫-৫৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। ভিতারি স্তম্ভ লিপি, জুনাগড় লিপি এবং আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থ হইতে স্কন্দগুপ্ত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পুষ্যমিত্র এবং হূণ আক্রমণ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করাই হইল স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাথিয়াবাড় হইতে পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনিও পিতামহের মত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৬৭ অথবা ৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়া ভারতে আবার ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা : ফা-হিয়ানের বিবরণ :

সমসাময়িক লিপি, হরিষেণের প্রয়াগ প্রশস্তি, ফা-হিয়ানের বিবরণ প্রভৃতি হইতে গুপ্ত যুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি জানিতে পারা যায়। শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং। তাঁহাকে "মহতী দেবতা" রূপে গণ্য করা হইত। রাজাকে সাহায্য

করিবার জন্য মহামন্ত্রী, কুমারামাত্য বা প্রাদেশিক ও বিভাগীয় শাসনকর্তা, সন্ধি-বিগ্রহিক অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী, এবং মহাবলাধ্যক্ষ বা প্রধান সেনাপতি, মহাদণ্ড নায়ক বা প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইতেন।

শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে "দেশ" (বর্তমানের প্রদেশ), ভুক্তি (বর্তমানের বিভাগ-যেমন প্রেসিডেন্সি বিভাগ), বিষয় (বর্তমানে জেলা) এবং গ্রামে বিভক্ত করা হইত। দেশের শাসক হইতেন কুমারামাত্য (কোন রাজপুত্র বা রাজার নিকট আত্মীয়)। এই পদের নাম ছিল গোপ্তৃ। ভুক্তির শাসন কর্তাকে বলা হইত উপরিক। স্বয়ং রাজা তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন। বিষয়ের শাসনকর্তাকে বলা হইত বিষয়পতি এবং গ্রামের শাসনকর্তার উপাধি ছিল গ্রামিক।

প্রাদেশিক শাসন

বৈশালীতে প্রাপ্ত সীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাদেশিক কর্মচারী-দের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলাধিকরণিক বা সৈন্যাধ্যক্ষ, রণভাণ্ডারিক বা সৈন্য বিভাগের কোষাধ্যক্ষ বা ভাণ্ডারী, মহাদণ্ডনায়ক বা প্রধান বিচারপতি, বিনয়স্থিতিস্থাপক বা আইন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ভটাশ্বপতি বা অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য বাহিনীর অধিপতি, দণ্ডপাশাধিক বা পুলিশ বিভাগের প্রধানকর্তা।

বিষয় এর শাসনব্যবস্থা

বিষয়পতিকে নিযুক্ত করিতেন উপরিক। 'বিষয়' এর প্রধান বা সদরকে বলা হইত 'অধিষ্ঠান' এবং প্রধান কর্মকেন্দ্রকে বলা হইত 'অধিকরণ'। 'বিষয়' এর প্রধান কর্মকর্তার (বর্তমানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমপর্যায়ের কর্মচারী) নাম ছিল 'সমব্যবহারী' বা 'আযুক্তক'। আযুক্তককে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত মহত্তর বা গ্রাম-বৃদ্ধ, গ্রামিক, শৌল্কিক বা স্থানীয় শুল্ক সংগ্রহকারী, গৌল্মিক বা বনরক্ষক, অগ্রহারিক বা দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষক, ধ্রুবাদি-করণিক বা ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক, উৎখেত্যয়িত বা করসংগ্রহকারী, পুস্তপাল বা সরকারী দলিলরক্ষক, তলবাটক বা গ্রামের হিসাব রক্ষক। দলিল, শাসন সংক্রান্ত আদেশ পত্র ইত্যাদিকে বলা হইত 'করণ' এবং যাহারা এগুলি লিখিত তাহাদের বলা হইত লেখক। দলিলরক্ষার কেন্দ্রকে বলা হইত অক্ষপটল। 'বিষয়' এর কাজকর্মগুলির তদারক করিবার জন্য 'সর্বাধ্যক্ষ' নিযুক্ত হইতেন। শাসনকার্য যাহাতে দুর্নীতি হইতে মুক্ত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন একদল 'কুলপুত্র' বা অভিজাত নাগরিক।

নগর-শাসনব্যবস্থা

নগরপ্রধানকে বলা হইত 'পুরপাল' বা 'নগররক্ষক'। বিভিন্ন নগরগুলির কাজকর্মের তদারক করিবার জন্য একজন 'পুরপাল-উপরিক' নিযুক্ত হইতেন। সে কালে মিউনিসিপ্যালিটিকে বলা হইত 'পরিষদ'। নগরের ধর্মশালাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন 'আবাসস্থিক' থাকিতেন।

গ্রামের শাসনব্যবস্থা

দামোদরপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মহত্তর বা গ্রামের প্রবীণ এবং মাননীয় ব্যক্তিগণ, অষ্টকুলাধিকরণ বা আটটি কুলের প্রতিনিধি, গ্রামিক এবং কুটুম্বী বা গৃহস্থ গ্রামবাসীকে লইয়া গ্রামসভা গঠিত হইত। গ্রাম-সভা গ্রাম শাসন করিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিষয়'কে বর্তমান মহকুমার মত কয়েকটি মণ্ডলে এবং মণ্ডলকে আবার বর্তমানের থানার মত কয়েকটি 'ভোগে' এবং 'ভোগ'কে কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত করা হইত। মণ্ডল, ভোগ এবং গ্রামের শাসনব্যবস্থা জনগণের সাহায্যে পরিচালিত হইত। রাজকর্মচারীরা তাহাদের তদারক করিতেন মাত্র।

বিচার ব্যবস্থা

সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। সাধারণতঃ প্রদেশ এবং ভুক্তির বিচারপতিগণই বিচারকার্য সমাধা করিতেন। অন্যান্য অঞ্চলে বিচারকগণ আঞ্চলিক সমিতির সাহায্যে বিচার করিতেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য জল, অগ্নি এবং বিষ দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গুরুতর অপরাধেও সাধারণতঃ অর্থদণ্ড হইত।

রাজস্ব

গুপ্তযুগে ভূমি রাজস্ব প্রধানতঃ শস্যে সংগৃহীত হইত। তাহাকে বলা হইত 'ভাগ' অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অংশ। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের একভাগ রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। বন্দর, খনি, খেয়া ইত্যাদি স্থান হইতেও শুল্ক সংগৃহীত হইত। বণিক ও ব্যবসায়ীগণ নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী শুল্ক দিতে বাধ্য থাকিত।

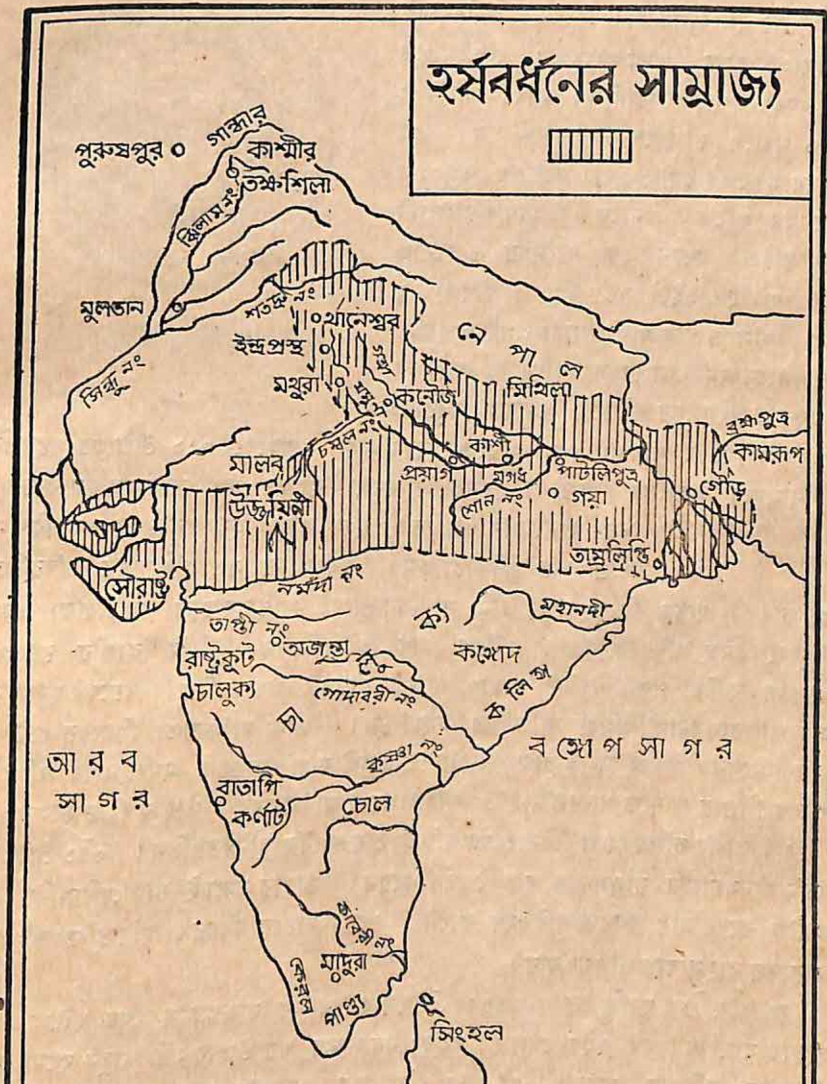
ফা-হিয়ানের বিবরণ

গুপ্তযুগের শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়ান লিখিয়াছেন "দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। রাজা ও রাজকর্মচারিগণ কাহাকেও উৎপীড়ন করিতেন না। দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল না। সাধারণতঃ অপরাধীর প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ হইত না, তবে কেহ বিদ্রোহ বা দস্যুতা করিলে তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা হইত। প্রজাগণ উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ রাজস্ব হিসাবে দিত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতেন। প্রজাগণ স্বেচ্ছা-মত দেশের যে কোন স্থানে অবাধে যাতায়াত করিতে পারিত। তাহার জন্য রাজকর্মচারীর অনুমতি লইতে হইত না। বিদেশী পর্যটকগণও এই অধিকার ভোগ করিত।"

গুপ্তসম্রাটগণ বাহুবলে ভারতের এক বিস্তৃত অংশে যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় দেড়শত বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোম এবং চীনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান হওয়ায় দেশীয় সংস্কৃতিও বিশেষ পুষ্ট হইয়াছিল।

কনৌজ সাম্রাজ্য : মগধকে কেন্দ্র করিয়া যেমন মৌর্য এবং গুপ্তযুগে ভারতে খণ্ড রাজ্যগুলিকে একটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সংহত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তেমনি কান্যকুব্জ বা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত একটি সুসংহত সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা চলিয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মৌখরি বংশ উত্তর ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বংশের প্রধান শাখা কনৌজে রাজত্ব করিত। কনৌজের মৌখরি রাজা ঈশানবর্মা ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর কনৌজের ভাগ্য নানা যুদ্ধ বিগ্রহে দোলায়িত হইতে থাকে। ষষ্ঠশতাব্দীর শেষ ভাগে পঞ্জাবের পূর্বপ্রান্তস্থিত থানেশ্বরের

পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকরবর্ধন কনৌজরাজ গ্রহবর্মার সহিত নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়া দুই রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করেন। মৌখরি ও পুষ্যভূতির মিত্রতায় ক্রুদ্ধ হইয়া মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া কনৌজ আক্রমণ



করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মা নিহত হন। প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন এবং মৌখরিরাজ্য পুষ্যভূতিবংশের শাসনাধীন হয়।

হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) ঃ গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য যুগপৎ থানেশ্বর এবং কনৌজের সিংহাসন লাভ করেন। ইতিপূর্বেই শশাঙ্কের হস্তে প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল। হর্ষবর্ধন সম্ভবতঃ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই বৎসর হইতেই হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। হর্ষবর্ধন থানেশ্বর হইতে কনৌজে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য একত্রিত হইয়া উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠিত হয়।



হর্ষবর্ধন

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু যুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন মগধ, উত্তরবঙ্গ এবং কোঙ্গোদ জয় করেন।

রাজ্য বিস্তার

ছয় বৎসরকাল অবিরত যুদ্ধ করিয়া হর্ষবর্ধন ক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট বিরচিত 'হর্ষ চরিত' গ্রন্থের বিবরণমতে তিনি সাময়িকভাবে কাথিয়াবাড়ের বলভীরাজ্য এবং সিন্ধুদেশে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক বিবরণে হর্ষবর্ধন 'সকলোত্তরাপথনাথ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী বাধা দেওয়ায় নর্মদা নদীর দক্ষিণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা তাঁহার মিত্র ছিলেন।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনসম্রাটের রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার সময়েই চীন দেশীয় বিখ্যাত পর্যটক হুয়েন সাঙ্‌ ভারত পরিভ্রমণ করেন। হুয়েন সাঙের বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতের বহু সংবাদ পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল শেষ হইলে পর তাঁহার সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী অর্জুন কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় তিব্বতের পরাক্রান্ত রাজা স্রঙ-সাম-গাঙ-পো প্রেরিত সৈন্যেরা রাজা অর্জুনকে পরাজিত করে এবং কনৌজ বিদেশীর শাসনাধীন হয়। হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পর পঞ্চাশ বৎসরকাল কনৌজের ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ।

তাহার পর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যশোবর্মা নামে এক পরাক্রান্ত রাজা কনৌজের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। যশোবর্মা আরব এবং তীব্বতীয়দের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্তু কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের আক্রমণে যশোবর্মার রাজ্য ধ্বংস হয়। ইহার পর কনৌজের সিংহাসনে ইন্দ্রায়ুধকে দেখা যায়। এই সময় কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলার পাল, মালব ও রাজপুতানার গুর্জরপ্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজ্যের মধ্যে ত্রিমুখী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্রথমে পালরাজ ধর্মপাল আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি ইন্দ্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার অনুগত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

প্রতিহার বংশের রাজত্বঃ প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং চক্রায়ুধকে অপসারিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ গুর্জর প্রতিহারগণের অধিকার ভুক্ত হয় এবং ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কনৌজের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজ কনৌজের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই এইবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। মিহির ভোজ যখন সিংহাসন লাভ করেন তখন রাজ্যের আয়তন শুধু রাজধানী কনৌজের চারিপার্শ্বে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ভোজ আপন বাহুবলে গুর্জর প্রতিহারগণকে একত্রিত করেন। তাহার পর তিনি মগধ অধিকার করেন এবং ৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পালসম্রাট নারায়ণ পালকে পরাজিত করেন। ভোজের সাম্রাজ্য উত্তর-ভারতের হিমালয় হইতে নর্মদা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর পর্যন্ত পূর্ব-পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভোজ সম্ভবতঃ ৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মিহির ভোজ

মিহির ভোজের পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল রাজা হন। তিনি পঞ্জাবের কর্ণাল জেলা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। নেপাল তরাই এবং উত্তরবঙ্গের রাজসাহী পর্যন্ত ভূভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। প্রথম মহেন্দ্র পালের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে উনবিংশ বর্ষ পর্যন্ত কালের মধ্যে প্রচারিত সাতটি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায় যে, তিনি মগধ এবং উত্তর বঙ্গের কিছুঅংশ অধিকার করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রপাল অন্ততঃ ৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র গুর্জররাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া সাময়িক ভাবে কনৌজ অধিকার করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গজনীর সুলতান মামুদ এই বংশের শেষ রাজা রাজ্যপালকে বিতাড়িত করেন।

মহেন্দ্রপাল

গৌড় সাম্রাজ্য ঃ

অন্তর্বিদ্রোহ এবং হূণ জাতির বারংবার আক্রমণের ফলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' নামে পরিচিত এক বংশের গুপ্ত উপাধিধারী রাজগণ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্বতন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিতে থাকেন। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ এই রাজবংশের অধীন

ছিল। এই সময়ে বাঙ্গলাদেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। তখন উত্তর-প্রদেশের মৌখরি রাজবংশ এবং গুপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক যুদ্ধ চলিতেছিল। ইহারই সুযোগ লইয়া মহারাজ শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্ক ঃ বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। দুঃখের বিষয় তাঁহার বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন রোহিতাশ্বের (বর্তমান রোটাসগড়) পর্বতগাত্রে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" এই নামটি খোদিত আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে শশাঙ্ক প্রথম জীবনে মৌখরি রাজ্য অথবা গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন।

শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল। এই রাজধানী সম্ভবতঃ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ড-ভুক্তি (বর্তমান মেদিনীপুর জেলা), উৎকল এবং উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের সমীপবর্তী অঞ্চলে কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্ক জয় করেন। দক্ষিণবঙ্গ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। শশাঙ্কের পূর্বে আর কোনও বাঙালী রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।

রাজ্যের আয়তন

নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শশাঙ্ক গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরিগণকে দমন করিতে অগ্রসর হন। এই সময় মৌখরি বংশের রাজা ছিলেন গ্রহবর্মা। তিনি থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গ্রহবর্মা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছিলেন। শশাঙ্কও নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কারণ দেবগুপ্ত ছিলেন থানেশ্বর এবং মৌখরি উভয়েরই শত্রু।

শশাঙ্ক প্রথমে বারাণসী অধিকার করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। দেবগুপ্তও মালব হইতে সসৈন্যে কান্যকুব্জ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন। তখন প্রভাকর বর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দেবগুপ্তকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে রাজ্যবর্ধনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। রাজ্যবর্ধন নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন যুদ্ধে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ নাই। তবে আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামে এক বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "হর্ষবর্ধন বহু সৈন্যসহ শশাঙ্কের রাজধানী পুণ্ড্রনগরীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি শশাঙ্ককে

রাজনৈতিক সংঘর্ষ

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ

পরাজিত করেন এবং ঐ বর্বর দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পাইয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।" এই উক্তি সত্য হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কোন স্থায়ী ফললাভ করিতে পারেন নাই।

মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থের মতে শশাঙ্ক মাত্র ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু হুয়েন-সাঙের বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অনতিকাল পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন।

কৃতিত্ব

বাঙলাদেশের ইতিহাসে মহারাজ শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার পূর্বে অপর কোন বাঙালী নরপতি বাঙলাদেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। শশাঙ্কই সর্বপ্রথম বাঙালী অধিরাজ যিনি আর্যাবর্তে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রান্ত মৌখরি রাজশক্তিকে তিনি তাঁহার কূটনীতি প্রয়োগে ও বাহুবলে ধ্বংস করেন। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট হর্ষবর্ধনের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তিনি বাঙালীর স্বাধীনতা ও আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ঃ আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। একাধিক রাজার অভ্যুদয় হয়—তাহাদের মধ্যে কেহ এক সপ্তাহ, কেহ বা এক মাস রাজত্ব করেন। আনুমানিক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং পরবৎসর তিনি উৎকল ও কঙ্গোদে অভিযান করেন। এই সময়ে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা গৌড় জয় করেন।

কনৌজের রাজসভার কবি বাকপতি তাঁহার 'গৌড়বহো' নামে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এক কাব্যে দাবী করিয়াছেন যে, কনৌজের রাজা যশোবর্মা আপন ভুজবলে গৌড়রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই গৌড়রাজ কে, তাহা জানা যায় না। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক-কাব্য রচয়িতা কহলণ আরও লিখিয়াছেন যে, ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জয়দেবের এক শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার শ্বশুর ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্ষ গৌড় জয় করিয়াছিলেন। এই লিপিটি ১৫৩ সংবতে (৭৪৮ খ্রীঃ) লিখিত।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশত বৎসর গৌড়ের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ। এই যুগে বাঙলা দেশের অবস্থা সম্পর্কে তিব্বতীয় বৌদ্ধলামা তারানাথ লিখিয়াছেন যে সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয় ও সম্ভ্রান্ত লোক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীন ভাবে শাসন করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ অরাজকতার নাম মাৎস্যন্যায়। জলাশয়ে যেমন বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে তেমনি মাৎস্যন্যায়ের কালে প্রবল ব্যক্তি অবাধে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে থাকে।

গোপাল (আঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ) ঃ অবশেষে এই চরম দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়া গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করিলেন। গোপালের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বাঙলার ইতিহাসে পাল বংশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। পালরাজগণের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, গোপালের পিতামহের নাম ছিল দয়িতবিষ্ণু এবং পিতার নাম ছিল বপ্যট। গোপাল সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। "রামচরিত" নামক গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমি পালরাজগণের "জনকভূ" বা পিতৃভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় গোপাল বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন।

ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) ঃ গোপালের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বীর ও রাজনীতিকুশল ধর্মপাল গৌড়ের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে উদ্যোগী হন। এই সময় আর্যাবর্তে প্রাধান্য লাভের জন্য মালব ও রাজপুতানার প্রতিহাররাজ বৎস চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন কান্যকুব্জ আর্যাবর্তের রাজধানী ছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনে অভিলাষী সকল রাজাই কান্যকুব্জ অভিযান করিতেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

ধর্মপাল কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া ক্রমে সিন্ধুনদ ও পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করিলেন। বৎসরাজ ধর্মপালের সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। কিন্তু ধর্মপালের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আর্যাবর্তে অভিযান করেন এবং বৎসরাজকে পরাজিত করেন। বৎসরাজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা বিফল হইল। ধ্রুব ইহার পর ধর্মপালকেও আক্রমণ করেন। কিন্তু ধ্রুব শীঘ্রই দক্ষিণাপথে ফিরিয়া যাওয়ায় উত্তর ভারতে ধর্মপালের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। আর্যাবর্তে সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া ধর্মপাল কান্যকুব্জে এক বৃহৎ রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিয়া ছিলেন। মালদহের নিকটবর্তী খালিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মপালের একটি তাম্রশাসনে এই রাজ্যাভিষেকের বিবরণ আছে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত কবি সোড্ঢল প্রণীত "উদয়সুন্দরী কথা" নামক চম্পূকাব্যে ধর্মপালকে উত্তরাপথ-স্বামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ধর্মপাল নিশ্চিন্তে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। প্রতিহাররাজ বৎসের পুত্র নাগভট শক্তি সঞ্চয় করিয়া ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। ধর্মপাল কান্যকুব্জ জয় করিয়া তাঁহার অনুগত চক্রায়ুধ নামক এক ব্যক্তিকে ঐ সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। নাগভট প্রথমে চক্রায়ুধকে পরাস্ত করেন। পরে ধর্মপালকে আক্রমণ করেন। প্রতিহাররাজের প্রশস্তি অনুসারে এই যুদ্ধে নাগভট জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবারও ধর্মপাল অব্যাহতি লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারতে অগ্রসর হইয়া নাগভটকে পরাজিত করেন। পিতার ন্যায় তৃতীয় গোবিন্দও দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান এবং ধর্মপাল আর্যাবর্তে পুনরায় আধিপত্য লাভ

গুর্জর প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণের সঙ্গে সংঘর্ষ

করেন। নাগভটের পরাজয় এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, প্রতিহাররাজ আর আর্যাবর্ত অভিযানে অগ্রসর হন নাই। সুতরাং ধর্মপালের বিশাল সাম্রাজ্য অটুট রহিয়া গিয়াছিল। ধর্মপাল 'পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি গৌরবসূচক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূট সামন্ত পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটদের সহিত এই সম্পর্ক স্থাপন দুর্দিনে পালবংশকে সাহায্য করিয়াছিল।

ধর্মপালের কৃতিত্বে অখ্যাত অবজ্ঞাত বাঙলাদেশ যেন সহসা শক্তিশালী হইয়া আর্যাবর্তে আপন গৌরব বিস্তার করিয়াছিল। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর এক নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব অভ্যুদয় হয়। বাঙালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়।

খালিমপুর তাম্রশাসনের প্রশস্তিকার কবি ধর্মপালের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"এখানে গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ দেখিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরের শৈলশিখর শ্রেণীকে মনে পড়ে। এখানকার অগণিত রণহস্তী দিনশোভাকে ম্লান করিয়া নিবিড় মেঘের শোভা সৃষ্টি করে। উত্তরাপথের বহু সামন্তরাজগণ কর্তৃক উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত অগণিত অশ্বের ক্ষুরোত্থিত ধূলিজালে এই স্থানের চতুর্দিক ধূসর হইয়া থাকে। রাজরাজেশ্বর ধর্মপালের সেবার জন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপ হইতে আগত রাজগণের অনন্ত পদাতিক সেনার পদভারে বসুন্ধরা অবনত হইয়া থাকে।" কবির এই উক্তির আতিশয্য সেকালের বাঙালীর জাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক।

বাঙালীর জাতীয় মন

দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ): লামা তারানাথের মতে ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর এই রন্নাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দেবপাল বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং নূতন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার বিজয়বাহিনী দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ও পশ্চিমে কাম্বোজদেশ অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। দেবপাল বাঙলাদেশের দুই সীমান্তবর্তী দেশ উড়িষ্যা ও আসাম জয় করেন। আসামের রাজা সামন্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপেই পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দেবপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্রের একখানি লিপিতে বলা হইয়াছে যে "দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ হইতে কর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি উৎকলকুল ধ্বংস, হূণগর্ব খর্ব এবং গুর্জরনাথের দর্পচূর্ণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত আসমুদ্র পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন।" দেবপাল যে হূণরাজ্য জয় করেন তাহা সম্ভবতঃ মালব অথবা উত্তরা-পথে হিমালয়ের নিকট অবস্থিত ছিল। দেবপাল যে গুর্জর রাজার দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবত: নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজরাজ। সম্ভবতঃ ৮৪০ হইতে ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেবপাল গুর্জররাজ ভোজকে পরাজিত করেন।

রাজ্যবিস্তার

মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের একটি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি লিপি হইতে জানা যায় যে, মগধ, কলিঙ্গ, চোল, পল্লব প্রভৃতি রাজ্য মিলিত হইয়া নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ মগধের সম্রাট দেবপাল এই যুদ্ধে মিলিত শক্তির পক্ষে ছিলেন। রামেশ্বর সেতুবন্ধ পাণ্ড্য রাজ্যে অবস্থিত। সুতরাং দেবপালের সভাকবি এই সমর বিজয় উপলক্ষে দেবপালের সাম্রাজ্য সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

দেবপাল অন্তত ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৮১০ হইতে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার শাসনকালে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। বাঙালী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদের তীর এবং দক্ষিণ-ভারতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়াভিযানে গিয়াছিল। প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ দেবপালদেবকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত। ভারতবর্ষের বাহিরেও দেবপালের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জানাইয়া দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং এই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। পরমধার্মিক সম্রাট দেবপাল রাজা বালপুত্রদেবের এই প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন।

বহির্ভারতে প্রভাব বিস্তার

অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ব্যাপিয়া ধর্মপাল ও দেবপাল আর্যাবর্তে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। বাঙালীর বাহুবলে আর্যাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রাচীন মৌর্য এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের সঙ্গে পালসাম্রাজ্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ ছিল। মৌর্য ও গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃত ভূভাগ সম্রাট স্বয়ং অথবা কর্মচারীর মাধ্যমে শাসন করিতেন। পালসম্রাটগণ কিন্তু গৌড় ও মগধ ব্যতীত আর্যাবর্তের অপর কোন অংশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করিতেন না। পরাজিত রাজগণ পালসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া করদরাজা রূপে নিজ নিজ রাজ্যশাসন করিতেন।

সাম্রাজ্যের প্রকৃতি

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী): খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্যযুগের প্রারম্ভে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা কিছু পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছিল। জৈন এবং বৌদ্ধগণ বৈদিক আর্যসমাজের চারিবর্ণ এবং চতুরাশ্রমের অনুশাসন স্বীকার করিতেন না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নারীপুরুষ অনেকেই মঠজীবন গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা জন্মগত জাতিভেদ মানিতেন না। তবে বৌদ্ধযুগে বৃত্তিগত জাতিভেদ স্বীকার করা হইত এবং বৃত্তিগুলি উন্নত অথবা অনুন্নত ও নিন্দনীয় বিবেচনায় সমাজে উচ্চ এবং হীন এই দুই জাতি বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ "বিনয়সুত্ত বিভঙ্গ" অনার্যগোষ্ঠী সম্ভূত চণ্ডাল, বেণ, নিষাদ, পুক্কুষ প্রভৃতি জনকে ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়া নিন্দা করিয়াছে। ইহাদের হীনজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ঝুড়ি, চাঙ্গাড়ি, মাদুর প্রভৃতি বোনা, পাখী ধরা ইত্যাদি ছিল হীন জাতির বৃত্তি। বৌদ্ধকাহিনী হইতে জানা যায় যে, সেকালে কোন চণ্ডালকে দর্শন করিলেও লোকে নিজেকে অশুচি মনে করিত। চণ্ডাল অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা নগরের বাহিরে বাস করিত। ফা-হিয়ান বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতে চণ্ডাল ব্যতীত অপর কেহ মাংসাহার বা পশুবধ করিত না। দশম-একাদশ শতকে রচিত বাঙলা চর্যাপদেও উল্লেখ আছে যে ডোমেরা নগরের বাহিরে কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। বৌদ্ধ কাহিনীতে ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, রথকার, চর্মকার এবং তন্তুবায়দের হীনজাতি এবং তাহাদের বৃত্তিকে হীন শিল্প আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা

বৈদিক সমাজে বর্ণ বিভাগ প্রচলিত থাকিলেও অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রথমে বৃত্তিগত এবং পরে জন্মগত জাতিভেদ প্রচলিত হইলে বিবাহ স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজে সাতটি জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সাতটি জাতি হইল—দার্শনিক (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শ্রমণ), অমাত্য, কৃষক, পশুপালক, পরিদর্শক (রাজকর্মচারী), শিল্পী এবং সেনানী। ইহাদের কেহই নিজ জাতির বাহিরে বিবাহ করিতে পারিত না। পল্লব, পাণ্ড্য এবং চোল রাজগণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের সমাজে প্রথমে বর্ণভেদ প্রথা ছিল না। পরে বৃত্তি অনুসারে

মেগাস্থিনিস কথিত সাত জাতি

জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়। জাতিভেদ প্রথাই ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা স্থায়ী হইলেও মৌর্যযুগ হইতে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের মধ্যে হিন্দু সমাজের প্রসার রুদ্ধ হয় নাই। বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায় কোন-কালেই জাতিভেদ অথবা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে নাই। গুপ্তযুগে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জাতিভেদ অনুশাসন প্রচার করিলেও হিন্দু সমাজে উহা কঠোর ভাবে অনুসৃত হয় নাই। মৌর্যবংশের পতনের পর শুঙ্গ ও কাহ্নবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুই বংশের নায়কেরা ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের নৃপতিগণও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা কেহই বর্ণ অথবা জাতিগত প্রথা অনুসরণ করেন নাই। মৌর্যযুগের সুরু হইতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা ভারতীয় সমাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাজ সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাতবাহনরাজ পুলুমায়ি শকরাজ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদেশীদের মধ্যে অনেকেই ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধ, শৈব, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের হিন্দু সমাজে স্থান দিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ 'জাতি'র পরিধি বিস্তৃত করেন এবং মিশ্র বিবাহজাত সন্তানকে কোন না কোন জাতির মধ্যে উপজাতিরূপে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং বিদেশীজাতিগুলি হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বপর্যন্ত হিন্দুসমাজের পরিধি এই ভাবে বিস্তৃত হইতে থাকে। অবস্থা অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা কখনও কঠোর, কখনও বা শিথিল হইয়াছে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই।

হিন্দু সমাজের প্রসার

ধর্মপ্রবণতা এবং অধ্যাত্মচিন্তাপ্রীতি ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়ান, হুয়েনসাঙ, প্রভৃতি বিদেশী দূত এবং পরিব্রাজকগণ সকলেই একবাক্যে ভারতবাসীর প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণ হইতে জানা যায়, ভারতবাসীর নীতিধর্মপালনের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। যজ্ঞকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মদ্যপান গর্হিত বিবেচিত হইত। ভারতবাসী ছিল সৎস্বভাব, সত্যবাদী, প্রতিশ্রুতিরক্ষা-তৎপর, ধর্মভীরু, পরলোকভীত এবং অতিথি-পরায়ণ। সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে অতিথির জন্য বাসকক্ষ, শয্যা ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা থাকিত। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজ সেবার প্রসার ছিল। ভিক্ষু ও শ্রমণেরা সকলেই সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ করিতেন। মঠ ও মন্দির সংলগ্ন সেবায়তনে দরিদ্র রোগীর জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা থাকিত। মেগাস্থিনিস এবং ফা-হিয়ান উভয়েই বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়ে এদেশে দস্যু-তস্করের প্রাদুর্ভাব

ভারতবাসীর চরিত্র

ছিল না। লোকে রাত্রিকালে গৃহের দ্বার বন্ধ না করিয়াও নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিত। হুয়েন সাঙের আমলে অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ভারত পর্যটনকালে হুয়েন সাঙ দুইবার পথিমধ্যে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের অহিংসা নীতির প্রভাবে ভারতবাসী শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মেগাস্থিনিস এবং ফা-হিয়ান উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে কলহ ও বিবাদের মীমাংসার জন্য অতি অল্পলোকেই বিচারালয়ে উপস্থিত হইত। সম্রাট অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যে অকারণ প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আমিষভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার প্রভাব দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পরেও ফা-হিয়ান ভারতে সুরা এবং মাংস বিক্রয়ের দোকান দেখিতে পান নাই। সম্রাট হর্ষবর্ধনও তাঁহার রাজ্যে প্রাণিহত্যা ও আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৌর্যোত্তরযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে থাকায় তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই। হুয়েন সাঙ জানাইয়াছেন যে, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে মাংস অন্যতম প্রধান খাদ্য ছিল। অবশ্য এখনও উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণ অধিকাংশই নিরামিশাষী।

অহিংসা নীতির প্রভাব

বৈদিক আর্যযুগের মতই মৌর্য এবং গুপ্তবংশের রাজত্বকালে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস ভারতে দাসপ্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দাসগণের জন্য নির্ধারিত বিধিনিষেধের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সমাজে দাস-প্রথার প্রচলন না থাকিলে এইরূপ নিয়ম বিধির প্রয়োজন হইত না। ফা-হিয়ান জানাইয়াছেন, এদেশে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, তবে শ্রমিকদের শোষণ করা বা বেগার খাটান হইত না। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা সহজ ও সরল ছিল। সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত।

দাসপ্রথা

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান খুবই উচ্চে ছিল। গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে সেকালে নারীরাও উচ্চশিক্ষা লাভ করিত। জনসাধারণ নারীজাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিত। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সমাজে নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে বলিয়া নির্দেশ করিলেও পরবর্তীকালের তুলনায় সেকালে নারী সমাজের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। বৌদ্ধযুগে পুরুষেদের মতই অনেক নারী ভিক্ষুণী হইয়া মঠজীবন যাপন করিতেন। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর রাজমাতা রূপে বাকাটক রাজ্য শাসন করিতেন। বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলায় বিস্তৃত প্রাচীন তোসালী রাজ্যের একাংশে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কর বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশের ষোলজন নরপতির মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন রাণী। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়ানের বিবরণ হইতে জানা যায় যে হিন্দু সমাজে পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করিত কিন্তু উচ্চবর্ণের নারীগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। স্বয়ম্বর

সমাজে নারীর স্থান

এবং সহমরণ প্রথাও প্রচলিত ছিল। পরিবার সাধারণতঃ একান্নবর্তী হইত। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে মৌর্যপরবর্তীকালে সাতবাহন বা অন্ধ্রবংশ রাজত্ব করিতেন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে গৌতমীপুত্র, বাশিষ্ঠিপুত্র ইত্যাদি নাম দেখিয়া প্রমাণিত হয় যে এই রাজবংশ মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীন ছিল। বিদেশীজাতিগুলির বারংবার ভারত আক্রমণের কালে স্বাভাবিক কারণেই নারীজাতির অবস্থার কিছু অবনতি ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে নারীসমাজের মধ্যে পর্দাপ্রথা প্রচলিত হয়।

ধর্ম ঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক হয়। সম্রাট অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে সিংহল এবং পশ্চিম-এশিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ধর্মমহামাত্র নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশেদেশে ও নগরে পরিভ্রমণ করিয়া নাটক অভিনয় সহযোগে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিতেন। এই সময় জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে নানা মতের উদ্ভব হইয়াছিল। জৈনেরা শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। বৌদ্ধগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিবার জন্য সম্রাট অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। মৌর্যযুগের পরবর্তীকালে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সময় বৌদ্ধেরা হীনযান এবং মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। কণিষ্ক চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন।

মৌর্যযুগের পর শুঙ্গ এবং কাণ্ব বংশের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতে এবং সাতবাহন বংশের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। কুষাণেরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও বাহ্লীক গ্রীকগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত ভাগবতধর্ম বা বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। শকরাজগণ প্রধানতঃ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। পহ্লবরাজগণের সময়ে ভারতে খ্রীষ্টধর্মও প্রচারিত হইয়াছিল।

গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মই ভারতের প্রধান ধর্ম হইয়া উঠে। তবে এই নব্য হিন্দুধর্ম বৈদিক আর্যদের ধর্মোপাসনার পদ্ধতি হইতে কিছু পৃথক ছিল। এইযুগে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং পশুপতি শিবের পূজা প্রচলিত হয়। ক্রমে ব্রহ্মার পূজা অপ্রচলিত হইয়া বিষ্ণুর নানা অবতার এবং বিষ্ণু ও শিবের পত্নী লক্ষ্মী ও মহামায়া, মাতৃকা এবং তাঁহাদের সন্ততি কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি দেবতার পূজা প্রবর্তিত হয়। বৈদিকধর্মের এক নূতন সংস্করণ হিসাবে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধ এবং জৈন তীর্থঙ্করেরা বিষ্ণুর অবতাররূপে গৃহীত হন এবং হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শৈবধর্ম উত্তরভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। গৌড়রাজ শশাঙ্ক, মালবরাজ যশোধর্মা, হূণরাজ মিহিরগুল শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম

দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতা ও হিন্দু-ধর্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারায় প্রবেশ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করে। তবে দাক্ষিণাত্যে

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ ধর্ম-বিরোধ ছিল না। তাহার পর শৈব এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। সাতবাহন, চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি রাজবংশের আনুকূল্যে এবং হিন্দু দার্শনিক ও ধর্ম প্রচারকগণের আবির্ভাবে দক্ষিণভারতে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ দেখা দেয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করিয়া বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণবংশের বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। শৈবগণের মধ্যে তামিল অঞ্চলে 'নায়নার' এবং কানাড়া অঞ্চলে 'বীরশৈব' বা 'লিঙ্গায়েৎ' সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বীর শৈবগণ বেদের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কল্যাণের কলচুরি বংশের রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী বসব কানাড়ী শৈবগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব আলওয়ার সম্প্রদায়ও জাতিভেদ স্বীকার করেন না। বিখ্যাত আলওয়ার কুলশেখর ছিলেন মালাবারের রাজা।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা

বৈদিক যুগে মূর্তি গড়িয়া দেবতার পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে মূর্তি পূজাই প্রধান ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠারোশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মমতাবলম্বীকেই মূর্তিপূজা করিতে দেখা গিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে নানা ধর্মমত এবং নানাপ্রকার ধর্মীয় আচার উদ্ভূত হইলেও হিন্দু ধর্মের বিরাট কলেবরের মধ্যে সকলেরই স্থান হওয়ায় ধর্মবিরোধ মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পরেও জৈন সন্ন্যাসীগণের জন্য গুহা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে উপদেশ দিয়া শিলালিপি প্রচার করিয়াছিলেন। সাতবাহন রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক, পারসিক দেবদেবীগণের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইলেও প্রয়াগের মহোৎসবে শিব এবং সূর্যকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেন। ফা-হিয়ান গুপ্তসাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রকার ঈর্ষা বা বিদ্বেষ দেখিতে পান নাই। হুয়েনসাঙ গৌড় রাজ শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিরোধী বলিলেও শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বহু বৌদ্ধমঠ দেখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ভারতবাসীমাত্রেরই চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

মূর্তিপূজা

ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতা

কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমনের পর পরধর্ম সহিষ্ণুতা বিচলিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব হইতে মুসলমানগণ ভারতে অভিযান করে এবং মুহম্মদ-

ইবন্-কাশিমের নেতৃত্বে সিন্ধু দেশ জয় করে। বহু আরবদেশীয় মুসলমান সিন্ধু দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে। আরবদেশীয় উলেমাগণ ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফল ভারতের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। ইতিপূর্বে যে সকল বিদেশী জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। পৌত্তলিকতা বিরোধী মুসলমানগণ পৌত্তলিক হিন্দু হইতে পৃথক হইয়া রহিল।

মুসলমান প্রভাবের ফল

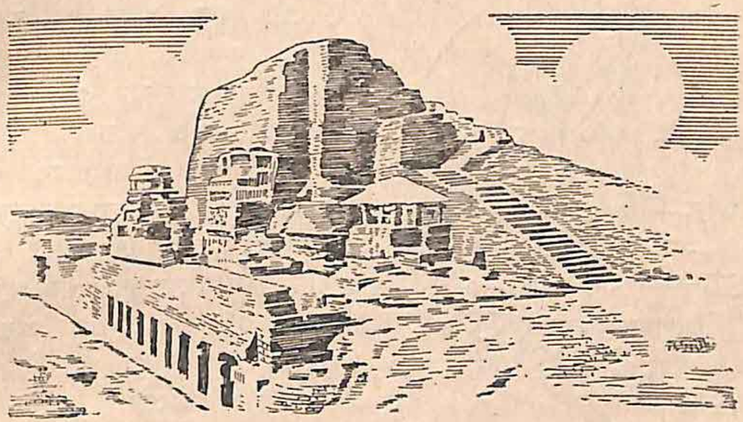
শিক্ষা: বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কালেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তক্ষশিলা প্রাচীন যুগের এক প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ের চর্চা হইত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতের বাহির হইতে গ্রীস, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বহু ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। বৈয়াকরণ পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, রাজনীতিবিদ চাণক্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত্রেয়, জীবক, চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন না কোন সময়ে যুক্ত ছিলেন। ভারতের বহু রাজপুত্র এখানে বিদ্যালাভ করিতে আসিত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তক্ষশিলা ছিল আবাসিক ও অবৈতনিক বিদ্যালয়। ভারতের রাজন্যবৃন্দ এবং ধনী ব্যক্তিগণের দানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। গ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে গ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাজার বৎসরেরও অধিককাল তক্ষশিলা ছিল ভারত তথা এশিয়ার শিক্ষাকেন্দ্র। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির কুড়ি মাইল দূরে সিন্ধুনদের অপর তীরে তক্ষশিলার বক্তৃতাগৃহ, পাঠকক্ষ, গবেষণাগার এবং ছাত্রাবাসের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তক্ষশিলা

গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে শ্বেতহূণদের আক্রমণে তক্ষশিলা ধ্বংস হইবার পর মগধের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠে। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে জনৈক গুপ্তরাজা নালন্দার ব্যয় নির্বাহের জন্য ছয়খানি গ্রামের আয় দান করিয়াছিলেন। সম্রাট দেবপাল নালন্দার একটি মঠ পরিচালনার জন্য পাঁচ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন একশত গ্রামের আয় দান করিয়াছিলেন। এই সকল দান হইতে মেধাবী ছাত্রগণের ব্যয় সঙ্কুলান হইত। গ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দার খ্যাতি সমগ্র এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুদূর চীন এবং তিব্বত হইতেও ছাত্রেরা নালন্দায় অধ্যয়ন করিতে আসিত। নালন্দার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল ইহার শিক্ষকমণ্ডলী ও গ্রন্থাগার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা অতি উচ্চ মানের ছিল। হুয়েন-সাঙ নালন্দার ছাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন প্রতি দশজন প্রবেশপ্রার্থীর মধ্যে দুই একজনের

নালন্দা

অধিক নালন্দায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। তাহা সত্ত্বেও হুয়েন-সাঙের সময়ে নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মহাযান দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। সমতটের রাজবংশের সন্তান মহাজ্ঞানী শীলভদ্র



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

ছিলেন নালন্দার প্রধান আচার্য। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের আঠারোটি শাখা ব্যতীত বেদ, সাংখ্য, ব্যাকরণ, গণিত, সাহিত্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ্য বিষয় ছিল। প্রতিদিন একশতটি কক্ষে একশতজন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের পর নালন্দার খ্যাতি ম্লান হইয়া যায়।

ওদন্তপুর

বাঙলার সম্রাট ধর্মপাল নালন্দার নিকট ওদন্তপুরে একটি মহাবিহার স্থাপন করেন। এই বিহার বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি পাঠের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠে। ওদন্তপুরের গ্রন্থাগার অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে মেধাবী ছাত্রগণ বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিত। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলরক্ষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ছিলেন। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রচারক অতীশ দীপঙ্কর এখানেই শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালের ভাগলপুরের নিকট বিক্রমশীল নামে আরও একটি মহাবিহার সম্রাট ধর্মপাল স্থাপন করিয়াছিলেন। ছয়টি মহাবিদ্যালয় এই বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে ১১৪ জন অধ্যাপক তিন হাজার ছাত্রকে তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। বিক্রমশীলে এত অধিক সংখ্যায় তিব্বতী ছাত্র আসিত যে তাহাদের জন্য একটি পৃথক মঠ বা ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছিল। ছাত্রদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পাল সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কৃতী ছাত্রগণকে উপাধি প্রদান করিতেন। আচার্য এবং কৃতী ছাত্রগণের

বিক্রমশীল

প্রতিকৃতি বিদ্যালয় গৃহে শোভা পাইত। বাঙালী পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জেতারি, রত্নাকরশান্তি প্রভৃতি বহু বাঙালী মনীষী ইহার আচার্য ছিলেন। এই বৌদ্ধবিহার হইতে শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল প্রভৃতি বাঙালী ধর্মপ্রচারক তিব্বতে যান এবং সেখানে লামা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।


দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

সম্রাট ধর্মপাল সোমপুরেও একটি মহাবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্তমান বাঙলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরী মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিব্বতীয় লেখক তারানাথ জানাইয়াছেন যে, ধর্মপাল পঞ্চাশটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে মালবের পরমার বংশীয় রাজা ভোজ একটি সরস্বতী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে কাব্য, শিল্পকলা, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত।

দাক্ষিণাত্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা

দাক্ষিণাত্যে মন্দিরগুলি ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। বেদ ও ধর্মশাস্ত্র প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হইলেও ছাত্রগণকে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষাদান করা হইত। অধ্যাপক এবং ছাত্রগণের বাসের ব্যবস্থা মন্দিরেই হইত এবং মন্দিরের আয় হইতে তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করা হইত।

সাহিত্য ঃ ভারতের সাহিত্য সর্বকালের সম্পদ। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য। সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় কথ্য ভাষাকে সংস্কার করিয়া 'পালি' নামে এক ভাষা সৃষ্টি করেন এবং এই ভাষাতেই তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি রচনা করেন। মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অবশ্য সংস্কৃত ভাষাতেও গ্রন্থরচনা করিতেন। জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাকে বলা হয় 'প্রাকৃত'। এই প্রাকৃত ভাষাতেও সাহিত্য রচিত হইত। সম্রাট অশোক তাঁহার শিলালিপি প্রাকৃত ভাষায় রচনা করাইয়াছিলেন। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, কৌটিল্য প্রভৃতির গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদের পরিচয় দেয়। কুষাণ যুগে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সৌকরানন্দ কাব্য', গদ্যে ও পদ্যে রচিত 'সূত্রালঙ্কার' এবং মহাযান পন্থী দার্শনিক নাগার্জুনের 'শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' ও 'মাধ্যমিকসূত্র' ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষ সূচিত করে। সাতবাহন বংশের রাজত্বকালে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয়

ভাষাতেই উন্নত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। সাতবাহন নৃপতি হাল 'গাথা সপ্তশতী' নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগেই গুণাঢ্য তাঁহার গল্প গ্রন্থ 'বৃহৎ কথা' রচনা করেন। ইহার কাহিনী অবলম্বনেই পরবর্তীকালে সোমদেব তাঁহার 'কথা সরিৎসাগর' রচনা করেন। গুপ্ত যুগে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে প্রতিভার প্লাবন বহিয়া যায়। এই যুগে সংস্কৃত পুরাণ এবং উপপুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। সমাজব্যবস্থার নিয়ামক ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই কালে সৃষ্টি হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, মনু প্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থগুলি হিন্দু সমাজের আচার আচরণ নির্দেশ করে। ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'মানবধর্মশাস্ত্র' বা 'মনুসংহিতা' সর্ব প্রধান। জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য দুইটি, রামায়ণ ও মহাভারত গুপ্তযুগেই বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অজস্র কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ভারতীয় সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ সৃষ্টি করিয়াছিল। নাট্যকার ভাস এবং কালিদাস, শূদ্রক ও বিশাখদত্ত ভারতীয় নাট্য লোকের গৌরব। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা', 'প্রতিমা' প্রভৃতি তেরটি নাটক পাওয়া গিয়াছে। কালিদাসের 'শকুন্তলম্' নাটকটি জার্মাণ মহাকবি গ্যেটের বিবেচনায় পৃথিবীর সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' অতি উৎকৃষ্ট নাটক। ভবভূতি সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের আর এক উজ্জ্বল নাম। তাঁহার 'উত্তররাম চরিত' করুণরসাত্মক নাটকের নিদর্শন। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' সাহিত্য-জগতে অমর সৃষ্টি। গুপ্তযুগের কথাসাহিত্যিকগণের মধ্যে 'দশকুমার চরিত' লেখক দণ্ডী এবং 'বাসবদত্তা' লেখক সুবন্ধু উল্লেখযোগ্য।

পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র

কাব্য-নাটক

নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চা গুপ্ত যুগে সমুন্নতিলাভ করিয়াছিল। পাটলিপুত্রের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টই সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আর্যভট্টই সর্বপ্রথম নির্ণয় করেন। মালবের বরাহমিহির রচিত জ্যোতিষ গ্রন্থ 'বৃহৎসংহিতা' বিজ্ঞান জগতে অমূল্য সম্পদ। এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা এবং শূন্য দ্বারা অঙ্ক লেখা এবং দশমিক প্রণালী আবিষ্কার এই যুগেরই কীর্তি। আরবেরা ভারতবর্ষ হইতেই বীজগণিত শিক্ষা করিয়া তাহা ইউরোপে প্রচার করিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

গুপ্ত যুগের পরবর্তীকালেও সংস্কৃত সাহিত্যরচনার ধারা অব্যাহত থাকে। সম্রাট্ হর্ষবর্ধন রচিত রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি নাটক এবং তাঁহার সভাকবি বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী ও হর্ষচরিত সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যবান সৃষ্টি। বাঙলাদেশে পাল যুগে রচিত 'সন্ধ্যাকর নন্দীর' 'রামচরিত' এবং সেনযুগে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম ভাষা তামিল, প্রাচীন চোল, পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্যে

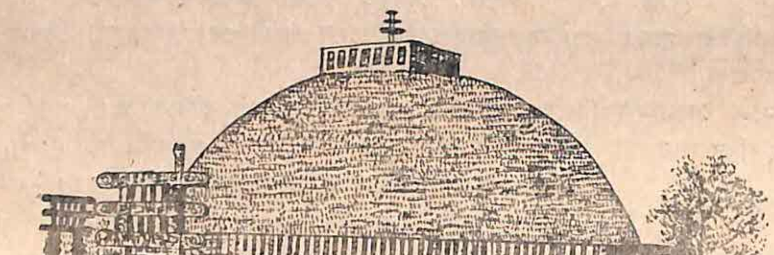
প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তিরুবল্লুবর নামে এক মনীষী 'ক্রিককুরল' রচনা করেন। আর্যগণের 'বেদ' এর ন্যায় শ্রদ্ধেয় এই গ্রন্থ তামিল-বেদ বলিয়া পরিচিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'তামিল ভাষায়' 'শিল্পদিকরম' এবং 'মণি-মেখলাই' নামে দুইটি সুবিখ্যাত মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। তামিল ভাষায় রচিত বহু উৎকৃষ্ট শিবস্তোত্র আছে। ইহাদের রচয়িতাদের মধ্যে তিরুনান, মাণিক্য ভাসগর, অপ্পর ও সুন্দরমূর্তির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব পদ রচনাকারী হিসাবে তিরুসঙ্গই এর নাম বিখ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পল্লবরাজ সিংহ-বিষ্ণুর সভা কবি 'কিরাতার্জুনীয়ম্' এর লেখক ভারবি অমর হইয়া রহিয়াছেন। রামানুজ এবং শঙ্করাচার্য সংস্কৃত দার্শনিক সাহিত্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন।

তামিল সাহিত্য

শিল্প ঃ মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্পকলার চমৎকার বিকাশ হইয়াছিল। স্থাপত্য নিদর্শনগুলি দর্শকমাত্রেরই বিস্ময় উদ্রেক করিত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কাষ্ঠ নির্মিত প্রাসাদ সৌন্দর্যে ও আকারে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম ছিল। প্রাসাদের চারিধারে বহু স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ, সোনার আঙুরলতা এবং তাহাতে রূপার পাখী দেখিয়া গ্রীকেরা মুগ্ধ হইত। সম্রাট অশোক এই প্রাসাদের পরিবর্তে এক সুন্দর শিলাময় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকের প্রাসাদ দেখিয়া কয়েক শতাব্দী পরেও ফা-হিয়ান বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে—এই প্রাসাদ মানুষের সৃষ্টি নহে, ইহা যেন দেব দানবের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

মৌর্যযুগের স্থাপত্য

কথিত আছে যে সম্রাট অশোক চুরাশী হাজার বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।



সাঁচী স্তূপ

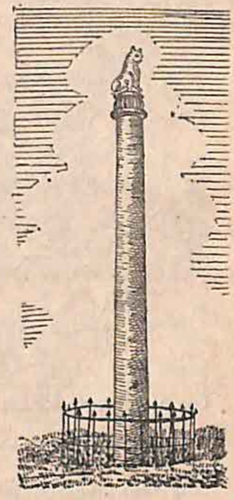
নয়শত বৎসর পরেও হুয়েন সাঙ্ ভারতের নানাস্থানে শত শত স্তূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই স্তূপগুলির মধ্যে মধ্যভারতের ভূপালের অন্তর্গত সাঁচী স্তূপ দুই হাজার বৎসর পরেও একালের দর্শককে বিস্মিত করে। এই সুবৃহৎ স্তূপটির ব্যাস ১২১½ ফুট

এবং ইহার উচ্চতা ৭৭ই ফুট। এগারো ফুট-উচ্চ এক শিলাবেষ্টনী ইহাকে চারিধারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই স্তূপের চারটি তোরণ। প্রত্যেকটিতে বুদ্ধ জীবনী ও জাতকের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। মধ্যভারতের ভারহুত স্তূপটিও বিশালাকার ছিল। তাহার একটি মাত্র তোরণের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। লুম্বিনী, প্রয়াগ, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের স্তূপগুলি এখনও কালজয় করিয়া সগৌরবে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

স্তূপ

বৌদ্ধ স্তূপগুলির নিকটে অনেক স্থানেই বিহার ও চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে একটি পাহাড়কে কাটিয়া বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করা হইত। এ প্রসঙ্গে গয়ার উত্তরে অবস্থিত বরাবর পাহাড়ের বৌদ্ধ গুহাগুলি উল্লেখযোগ্য। বেদসা, কোণ্ডন, জুন্নর, নাসিক, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের গুহা এবং পূর্বাঞ্চলে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরির জৈন গুহা ভারতীয় কারিগরির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বোম্বাই ও পুনার মধ্যবর্তী কার্লে গুহার নির্মাণ রীতি অতি উন্নত।

গুহা



অশোকস্তম্ভ (নন্দনগড়)

মাত্র একখণ্ড প্রস্তরে নির্মিত বহুসংখ্যক শিলাস্তম্ভ সম্রাট অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যের নানা স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইসকল স্তম্ভে ধর্মোপদেশ উৎকীর্ণ থাকিত। অতি মসৃণ স্তম্ভগুলির চূড়ায় সিংহ, হস্তী, বৃষ প্রভৃতি পশুর মূর্তি অথবা শিলাময় ধর্মচক্র স্থাপিত হইত। লৌরিয়া নন্দনগড়ে যে স্তম্ভটি আছে তাহা বালুকাশিলায় নির্মিত। আরশীর মত স্বচ্ছ অতি মসৃণ এই স্তম্ভের শীর্ষস্থ পশু মূর্তিটি যেমন জীবন্ত-ভাবব্যঞ্জক, তেমনি শক্তি ও মহিমাদ্যোতক। সারনাথস্তম্ভের চূড়ায় স্থাপিত চারটি সিংহ মূর্তি এবং তাহাদের বেদীতে উৎকীর্ণ শিল্পকলা একালের শিল্পীকেও মুগ্ধ করে। ভাস্কর্যের এই অত্যুত্তম নিদর্শনটি বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের সরকারী প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

স্তম্ভ



বুদ্ধস্তূপ (কণিষ্ক নির্মিত)

মৌর্যযুগে গান্ধার, সারনাথ, মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে শিল্প শিক্ষাদানের

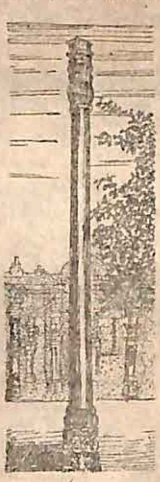
কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে গান্ধারে গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় শিল্পের রীতি মিশ্রিত হইয়া এক বিচিত্র শিল্পাদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল। কুষাণযুগে গান্ধার ও মথুরা শিল্পকলা বিস্তৃতি লাভ করে। পুরুষপুরে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর সম্রাট কণিষ্ক একটি প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার অপূর্ব গঠন ও শিল্প নৈপুণ্য দেখিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে দর্শক সমাগম হইত।



নরনারায়ণ, দেবগড় মন্দির

গুপ্ত যুগ

ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল বিশেষ গৌরবময়। এই যুগে ভারতে সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সমসাময়িক গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুধর্মে দেবদেবীর মূর্তি গঠনের রীতি তেমন প্রচলিত ছিল না। গুপ্তযুগেই বহুসংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মূর্তির মধ্যে মথুরার ব্রোঞ্জ নির্মিত এবং সারনাথের শিলা নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি এবং মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ঝাঁসী জেলার দেওগাঁয়ের দশাবতার মন্দিরের শিব ও বিষ্ণু মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য অনেক পরিমাণে বিদেশী প্রভাবমুক্ত। মূর্তি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগে মন্দির নির্মাণও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গুপ্তযুগের মন্দিরগুলি অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অল্প যে কয়েকটি এখনও আছে, তাহার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের দেওগাঁও এবং ভিতরগাঁও-এর মন্দির উল্লেখযোগ্য।



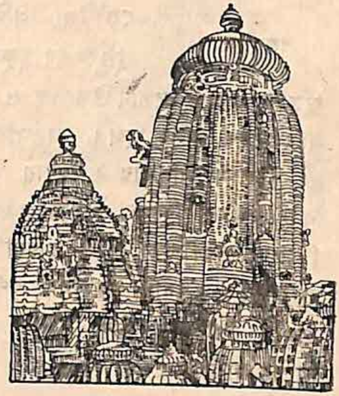
লৌহস্তম্ভ

চন্দ্র রাজার লৌহস্তম্ভ

দিল্লীতে কুতবমিনারের নিকট একটি লৌহস্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে কোন এক 'চন্দ্র' রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এই চন্দ্র রাজা হইলেন গুপ্ত বংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। আশ্চর্যের বিষয় গত দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এই লৌহস্তম্ভের কোথাও মরিচা ধরে নাই বা ইহার মসৃণতা ক্ষুণ্ণ হয়

নাই। ইহাতে বুঝা যায়, সেকালে ধাতু শিল্পে ভারত কী উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে বর্তমান বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে চন্দেল্ল বংশ রাজত্ব করিতেন। এই বংশের রাজারা বহু সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। খজুরাহো মন্দিরের অপূর্ব শিল্পকলা চন্দেল্লরাজগণের কীর্তি আজও বহন করিতেছে। উড়িষ্যার বহু দেবমন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের আদর্শ রূপে গণ্য হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত। একভাগে সুউচ্চ শিখরযুক্ত গর্ভগৃহ, অপর ভাগে মণ্ডপ ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। করবংশের রাজত্বকালে নির্মিত ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির ১৬০ ফুট উচ্চ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যারাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গপুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দির নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম নরসিংহ কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির গঠন করেন।



ভুবনেশ্বরের মন্দির

পোড়ামাটির শিল্প

বাঙলাদেশেও শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বহু মঠ ও মন্দির এই দেশে নির্মিত হইয়াছিল। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে পাল যুগের এক বিরাট মন্দির ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধীমান ও বীতপাল নামে পালযুগের দুই শিল্পী এবং শূলপাণি নামে সেনযুগের এক শিল্পীর নাম আজও অমর হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙলায় পোড়ামাটির শিল্প খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পাহাড়পুরে, কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী এবং লালমাই পাহাড়ে পোড়ামাটির বহু ফলক পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে কিন্নর, বিদ্যাধর, বিবিধ ভঙ্গীর নারীমূর্তি, অস্ত্র ও বর্মধারী সৈনিক, শিকারী, নানাপ্রকার প্রকৃত ও কাল্পনিক জন্তু এবং দেবদেবীর মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙলাদেশে প্রস্তর সুলভ না হওয়ায় মৃৎশিল্প অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু কারুকার্য খচিত ইট, পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। পালযুগে চিত্র শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল। রামপালের রাজত্বকালে লিখিত প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে যে কয়েকটি চিত্র আছে তাহার সৌন্দর্য অপূর্ব।



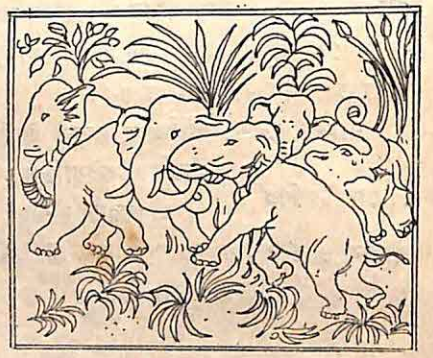
পোড়ামাটির শিল্প

বস্ত্র শিল্প

বস্ত্রশিল্পের জন্য বাঙলাদেশ প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ এবং কার্পাসিক এই চার প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। শণের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড় ক্ষৌম প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ ও বারাণসীতে উৎপন্ন হইত। কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশের দুকূল শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ, পুণ্ড্রদেশীয় দুকূল শ্যাম ও মণির ন্যায় স্নিগ্ধ। কীটের লালা হইতে উৎপন্ন সূতায় প্রস্তুত পত্রোর্ণ উত্তরবঙ্গ ও মগধে বয়ন করা হইত কার্পাস তুলার কাপড়ের জন্যও বাঙলাদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙলার মসলিন ও বহু উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত।

বিলাস সামগ্রীর চাহিদার জন্য সেকালে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য, গজদন্ত এবং কাষ্ঠ শিল্পের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কর্মকার ও সূত্রধর শকট ও নৌকানির্মাণে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। বাঙলার শঙ্খ শিল্পও সেকালে খুবই সমাদর লাভ করিত। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কাংসকার, শঙ্খকার, মালাকার প্রভৃতি প্রথমে শিল্পিসংঘ ছিল, পরে উহারা বিশিষ্ট জাতিরূপে গণ্য হয়।



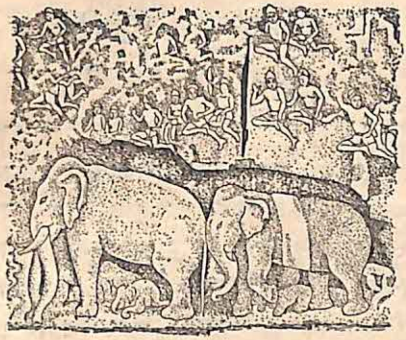


অজন্তার গুহাচিত্র



দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা ঃ উত্তর ও পূর্ব-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতেও শিল্পকলার প্রসার ও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। গুপ্ত যুগের সমসাময়িককালে দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় চিত্রকলা অপূর্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অজন্তা গুহার চিত্রাবলী অধিকাংশই এই যুগের সৃষ্ট। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই সকল গুহা খনন, গুহাগাত্রে চিত্রাঙ্কন এবং মূর্তি গঠনের কার্য চলিয়াছিল। এগুলি বাকাটক রাজবংশের কীর্তি। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বাঘ গুহা চিত্র অজন্তা চিত্র-কলারই সমতুল। পল্লব-রাজাদের নির্মিত কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির, মহাবলীপুরমের কৈলাস ও মুক্তেশ্বর মন্দির, পল্লব শিল্পকলার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মাদ্রাজের দক্ষিণে

মহাবলীপুরম্ বা মামল্লপুরমের ধর্মরাজ, দ্রৌপদী, গণেশ প্রভৃতির সাতটি রথ পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মার অপূর্ব কীর্তি। এগুলি গাঁথিয়া নির্মাণ করা হয় নাই। এক-একটি

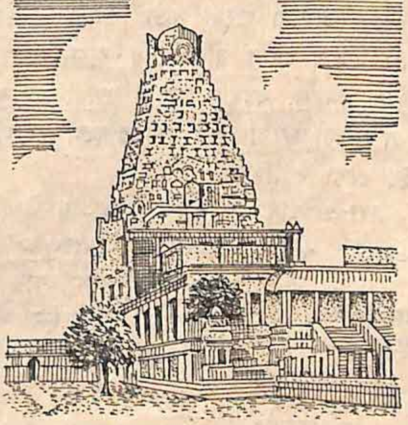


পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্পকার্য (মহাবলীপুরম্)



গণেশ রথ

ক্ষুদ্র পর্বতকে কাটিয়া মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোথাও এইরূপ শিল্পকলা দেখা যায় না। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম কৃষ্ণ কর্তৃক নির্মিত কৈলাস মন্দিরও একটি বৃহৎ পর্বতের ২৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬০ ফুট প্রশস্ত অংশ কাটিয়া নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ভিতর খোদাই করা স্তম্ভ এবং প্রশস্ত কক্ষ রহিয়াছে। রাজ-রাজ চোল তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজ-রাজেশ্বরের শিব মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তেরটি তল বিশিষ্ট এই মন্দির ১৮০ ফুট দীর্ঘ এবং ২০০ ফুট উচ্চ। মন্দিরটি সর্বাঙ্গে সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্যে ভরা এবং ভিতরের দেওয়ালগুলি চিত্রিত পাণ্ড্য-রাজ জাতবর্মা মাদ্রাজের শ্রীরঙ্গম্ ও চিদাম্বরমে স্বর্ণ শিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।



রাজ-রাজেশ্বর মন্দির (তাঞ্জোর)

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল 'গোপুরম্' নামে খ্যাত সূক্ষ্ম ভাস্কর্য মণ্ডিত বিশাল প্রবেশ তোরণ। কুম্ভকোণমের গোপুরম্ বিখ্যাত দক্ষিণের গঙ্গরাজগণ পর্বত খোদাই করিয়া বিরাট মূর্তি গঠন করাইতেন। শ্রবণ বেলগোলায় ৫৬ ফুট উচ্চ গোমত মূর্তিটি ইহার নিদর্শন। দশম শতাব্দীর পরবর্তী যুগে নির্মিত মন্দিরগুলি আকারে বিশাল, শত শত স্তম্ভযুক্ত ও অতি সূক্ষ্ম ভাস্কর্য মণ্ডিত। রামেশ্বরের মন্দির ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চোল-যুগের মন্দিরের পিতল ও ব্রোঞ্জের দেব-মূর্তিগুলি অতি অপরূপ। তাঞ্জোর মন্দিরের নটরাজ-মূর্তি জগদ্বিখ্যাত।

অষ্টম অধ্যায়

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা :

অতি প্রাচীনকালে সিন্ধু সভ্যতার যুগেই ভারতের সহিত পশ্চিম-এশিয়া এবং মিশরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সকল অঞ্চলের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান-প্রদান হইয়াছিল। আর্য-যুগে পশ্চিম-এশিয়ায় এবং বৌদ্ধ যুগে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয়গণ বসতি বিস্তার করিয়াছিল। মৌর্য-যুগে সম্রাট অশোক প্রেরিত ধর্ম প্রচারকগণ পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং ভারতের সর্ব দক্ষিণে সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কুষাণ-যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম মধ্য-এশিয়া এবং চীনদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তরে হিমালয়ের অপর পিঠে খোটান, তুরফান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ, গোবিমরু প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ, ভারতীয় শিল্প সামগ্রী, চিত্র ইত্যাদি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে ঐ সকল অঞ্চলে ভারতের সংস্কৃতি বিস্তারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসী শক-ইউচি প্রভৃতি জাতি বিশেষ সভ্য ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে তাহারা ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের-যুগে, পাল যুগে, দাক্ষিণাত্যের চোল রাজবংশের রাজত্বকালে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণ-দ্বীপ অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালি, শ্যামদেশ এবং মালয় উপদ্বীপে, বহু ভারতীয় উপনিবেশও রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে সেকালে এক বৃহত্তর ভারতের অস্তিত্ব বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছিল।

মধ্য-এশিয়ার উপনিবেশ

মধ্য-এশিয়ায় যে সকল ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলির অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক অরেলষ্টন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া, ইহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কুষাণ-যুগে কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত জনপদগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অরেলষ্টনের মনে হইয়াছিল যে তিনি যেন পঞ্জাবের কোন প্রাচীন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে সকল ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কালক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিলেও, বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের ইতিহাসও পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থলপথে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল। জলপথে বাঙ্লার তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে এবং মাদ্রাজের নাটপট্টম্ পর্যন্ত উপকূলবাসী বণিক ও নাবিকগণ এই অঞ্চলে যাতায়াত করিত। প্রচুর ধনৈশ্বর্যের জন্য প্রাচীন ভারতে এই অঞ্চল 'সুবর্ণ-ভূমি' নামে পরিচিত হইয়াছিল। বাণিজ্য এবং রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে ভারতীয় হিন্দু এবং বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি খুবই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশ

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই ব্রহ্মদেশের উপকূলে এবং অভ্যন্তরে বহু ভারতীয় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ ব্রহ্মের অধিবাসী তেলেঙ জাতি যে দক্ষিণ-ভারতের তেলেঙ্গা অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত সম্পর্কিত এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। বর্তমানেও বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রহ্মদেশের প্রধান ধর্ম, এবং ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ভাষার সহিত পালি ভাষার সম্বন্ধ ধরা যায়। ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত লিপি ভারতীয় লিপিরই বিবর্তিত রূপ। ব্রহ্মদেশের পূর্বাংশে আরাকানের সহিত ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য বাঙ্লাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

শ্যামদেশ

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে শ্যামদেশ বা বর্তমান থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপিত হয়। শ্যামদেশে হীনযান বৌদ্ধধর্ম এখনও প্রচলিত আছে। প্রায় এক হাজার বৎসর ধরিয়া এই দেশ প্রধানতঃ ভারতীয় হিন্দু জনসমষ্টির বাসস্থান ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে থাই জাতি শ্যামদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে এবং বর্তমানে তাহারাই এদেশের শাসক। থাই রাজগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

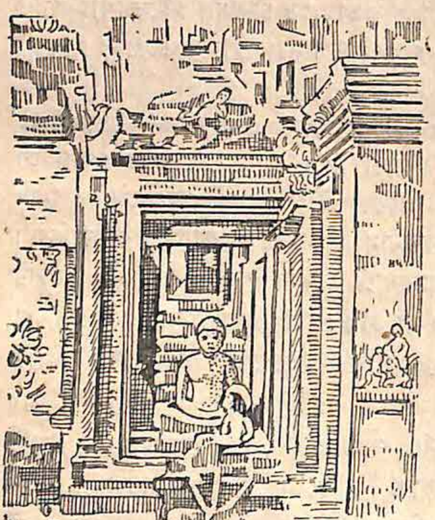
চম্পা

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দো-চীনে প্রাচীন কালেই চম্পা এবং কম্বোজ নামে দুইটি ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী মতে প্রাচীন বাঙলার চম্পারাজ্য (বর্তমানকালের ভাগলপুর) হইতে আগত ব্যক্তিরা ইন্দোচীনের পূর্বপ্রান্তে আনাম প্রদেশে (বর্তমানে ভিয়েতনাম) উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা মাতৃভূমির নামানুসারে আনাম প্রদেশে স্থাপিত রাজ্যের নাম দিয়াছিল চম্পা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রায় বারশত বৎসর ধরিয়া চম্পা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। চম্পারাজ্যের উত্তর সীমা চীন দেশের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইজন্য চম্পারাজ্য ও চীন দেশের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। বর্মা উপাধিযুক্ত সত্যবর্মা, ইন্দ্রবর্মা, হরিবর্মা, জয়সিংহবর্মা, জয়পরমেশ্বরবর্মা প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ চম্পাতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা প্রতিবেশী কম্বোজ রাজগণের এবং মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বারংবার মোঙ্গল আক্রমণে চম্পা রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। আনাম জাতি চম্পা অধিকার করে। চম্পার নরপতিগণ প্রধানতঃ শিব, শক্তি, কার্তিক ও গণেশের উপাসক ছিলেন। বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের পূজাও এই রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মও জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। বহু মন্দির, মঠ ও

বিহারের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন চম্পা রাজ্যের এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় নীরবে বহন করিতেছে।

কম্বোজ

বর্তমানে যে দেশটি কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত প্রাচীনকালে তাহার নাম ছিল কম্বুজ বা কম্বোজ। প্রবাদ আছে যে কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই দেশ আক্রমণ করেন এবং স্থানীয় নাগ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। অপর এক প্রবাদে বলা হয় যে ইন্দ্রপ্রস্থের সূর্যবংশীয় কোন রাজার পুত্র এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চীনারা এই রাজ্যটির নাম দিয়া ছল ফুনান। চৈনিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজ রাজ্যের প্রকৃত গৌরবময় কাল আরম্ভ হয়। এই রাজ্যের রাজাদেরও উপাধি ছিল বর্মা বা বর্মণ। ভববর্মা, জয়বর্মা, যশোবর্মা, সূর্যবর্মা প্রভৃতি কম্বোজ রাজগণ নিকটবর্তী দেশগুলি জয় করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ড, মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ, ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ ভাগ এবং কম্বোডিয়ার উত্তর সীমান্ত হইতে চীনদেশের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে কম্বোজ সাম্রাজ্য প্রসারলাভ করিয়াছিল। কিছুকালের জন্য চম্পা রাজ্যও কম্বোজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বোজ রাজগণ ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সহিত সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কম্বোজ রাজগণের প্রশস্তি মূলক বারোটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।



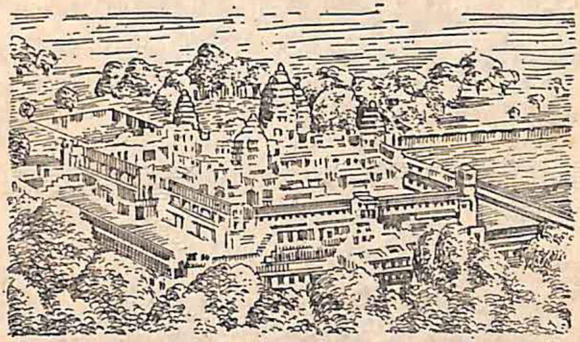
বেয়নমন্দির

আঙ্কোরথোম

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা সপ্তম জয়বর্মার রাজত্বকালে কম্বোজ সাম্রাজ্য উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করে। কম্বোজ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল আঙ্কোরথোম। তিনশত ত্রিশ ফুট প্রশস্ত পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত এই নগরী দৈর্ঘ্যে দুই মাইল এবং প্রস্থেও দুই মাইল ছিল। পাঁচটি বিশাল নগর-তোরণ, একশত ফুট প্রশস্ত ও দীর্ঘ চারিটি রাজপথ, নগরের কেন্দ্র স্থলে স্থাপিত পিরামিড আকারে নির্মিত ত্রিতল বেয়নমন্দির, বহুসংখ্যক প্রাচীর বেষ্টিত জলাশয়, বহু দেব দেবীর মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বেয়নমন্দিরটিতে চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের চূড়া ধ্যানরত শিবমূর্তির আকারে গঠিত।

কম্বোজ রাজ্যে বহুশত মন্দির ছিল। ইহাদের মধ্যে আঙ্কোরভাট বিষ্ণু মন্দিরটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র মন্দিরটি ত্রিতল। প্রত্যেকটি তলে গ্যালারি অর্থাৎ সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত কক্ষ দ্বারা পরিবৃত মূল মন্দিরের শিখর দুইশত দশ ফুট উচ্চ। গ্যালারির দেওয়ালগুলি নানা কারুকার্য খোদিত। মন্দিরের গায়ে অর্জুন, যম, শিব প্রভৃতি মূর্তি খোদিত আছে। পৃথিবীর মধ্যে আকারে বৃহত্তম মন্দির আঙ্কোরভাটের অপরূপ সৌন্দর্য উত্তরকালের ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

আঙ্কোরভাট



আঙ্কোরভাট মন্দির

চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম দিক হইতে থাই জাতি শ্যামদেশ অধিকার করিয়া কম্বোজ আক্রমণ করে। পূর্বদিক হইতেও আনাম জাতি কম্বোজ আক্রমণ করে। ফলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কম্বোজরাজ্য ধ্বংস হয় এবং হিন্দুগণের আধিপত্য লোপ পায়।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে যবদ্বীপে ভারতীয় হিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যবদ্বীপের রাজা দেববর্মা চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মা যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এই শতাব্দীতে পশ্চিম যবদ্বীপে পূর্ণবর্মা নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। সংস্কৃতভাষায় লিখিত তাঁহার চারিটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যবদ্বীপ মালয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার পর নবম শতাব্দীতে যবদ্বীপ পুনরায় স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হয়। সঞ্জয় নামে একজন রাজা তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী মতরামনগরে অবস্থিত ছিল। মালয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িলে পূর্ব-যবদ্বীপে কাদিরি, সিংহসারি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীবিজয় নামে এক ব্যক্তি যবদ্বীপে একটি রাজ্যস্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তিক্তবিল্ব নগর বা বর্তমান মজপহিৎ। চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীবিজয় রাজ্যের সীমা মালয় ও সমীপবর্তী দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীবিজয় বংশের এক রাজপুত্র মালাক্কাদ্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। মালাক্কার দ্বিতীয় রাজা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্দুরাজা সপরিবারে বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যবদ্বীপ

প্রাচীন যবদ্বীপের প্রধান সাহিত্য হইল রামায়ণ। এই রামায়ণ সম্পূর্ণ নূতন রচনা, বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদমাত্র নয়। মহাভারতের একটি গদ্য অনুবাদ যবদ্বীপে প্রচলিত

ছিল। হিন্দুদের বসতি অঞ্চলে ভারতীয় আদর্শেই সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। যবদ্বীপ এবং সুমাত্রায় জাতিভেদপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, অস্পৃশ্যতাও প্রচলিত ছিল না।

যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও এককালে বেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্বকালে মধ্য যবদ্বীপে বরবুদুরে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধমঠ নির্মিত হইয়াছিল। এই মঠটি নয়টি তল বিশিষ্ট। ইহার ভিত্তির পরিধি তিনশত একানব্বই ফুট এবং উচ্চতা একশত আশী ফুট। মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধতারা ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তি ছিল। মঠের গায়ে জাতকের কাহিনী এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা খোদিত আছে। এইগুলির মধ্যে একটি জাহাজে আগত ভারতীয়গণকে সংবর্ধনার দৃশ্য আছে। শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্বের পরবর্তীকালে হিন্দুগণ বরবুদুরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি এবং রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী উৎকীর্ণ করিয়াছিল। বরবুদুর পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের অন্যতম বলিয়া গণ্য হয়।

বরবুদুরের স্তূপ



বরবুদুরের মন্দির

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। মালয়, এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক লিপিতে শৈলেন্দ্রবংশের শ্রীমহারাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল এক বিশাল নৌবাহিনী। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বাণিজ্যাতরা সর্বদা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। খোরদাদ বে নামে এক আরব পর্যটকের বিবরণ হইতে শৈলেন্দ্র রাজ্যবংশের অতুল ধনৈশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চম্পা এবং কম্বোজ রাজ্যের সহিত শৈলেন্দ্র রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। কম্বোজ কিছুকালের জন্য শৈলেন্দ্র অধিকারে আসিয়াছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। চীন এবং ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাঙলার পাল সম্রাট দেবপালের অনুমতি লইয়া নালন্দা মহাবিহারে একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দেবপাল এই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য বালপুত্রদেবের অনুরোধে পাঁচটি গ্রাম দান করিয়া ছিলেন।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যেরও আয়তনের বিশালতার উল্লেখ করিয়া আরব পর্যটক লিখিয়াছেন

যে অতি দ্রুতগামী জাহাজে গেলেও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলি পরিক্রমা করিতে অন্ততপক্ষে দুই বৎসর সময় লাগে। সুমাত্রাদ্বীপে শ্রীবিজয় (জাভা)এবং মালয় উপদ্বীপে কটাহ (বর্তমান কেড্ডা) শৈলেন্দ্র রাজগণের রাজধানী ছিল। একাদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজ্যের সহিত দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজগণের সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলিয়াছিল। শৈলেন্দ্ররাজ চূড়ামণিবর্মা ও তাঁহার পুত্র শ্রীমার-বিজয়োত্তুঙ্গ বর্মা দক্ষিণ ভারতে চোলরাজরাজ রাজ এবং রাজেন্দ্র চোলের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের পরাক্রান্ত নৌবাহিনী সুমাত্রার পূর্ব-উপকূল এবং মালয় উপদ্বীপের মধ্য ভাগ ও দক্ষিণ অংশ অধিকার করে। কিছুকাল পরে অবশ্য শৈলেন্দ্র রাজ তাঁহার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব আর ফিরে নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজ চন্দ্রভান সিংহলের বিরুদ্ধে এক নৌ অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান ব্যর্থ হয়। দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য রাজগণের সহিতও শৈলেন্দ্ররাজের যুদ্ধ হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শেষ হিন্দু নৃপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।



দন্তমন্দির (সিংহল)

শৈলেন্দ্র বংশের সমর্থনে এই সাম্রাজ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে কুমার ঘোষ নামে এক বাঙালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজবংশের ধর্মগুরু ছিলেন। বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির শৈলেন্দ্র রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সিংহল

বর্তমানে সিংহল পৃথক একটি দেশ হইলেও এককালে ইহা ভারতেরই অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। সম্রাট অশোক এই দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সিংহল চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সিংহলের বর্তমান অধিবাসিগণ প্রধানতঃ ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষী নরগোষ্ঠী এবং আর্যগণের বংশধর। ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলভাষী লোকেরা এখনও সিংহলের জনসমষ্টির এক বিরাট ও বিশিষ্ট অংশ।

নবম অধ্যায়

তুর্ক আফগান ও মুঘল শক্তির উত্থান, বৃদ্ধি ও পতন

(ক) তুর্ক আফগান শক্তির উত্থান, বৃদ্ধি ও পতন :

দশম শতাব্দীর শেষভাগে আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী হইতে তুর্কজাতীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকে। তাহাদের বারংবার আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়।

সবুক্তিগীন : ভারতে তুর্ক রাজ্যস্থাপনের সূচনা করেন গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিন্দু শাহী বংশের রাজা জয়পালকে দুইবার পরাজিত করিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত ভারতের ভূখণ্ড অধিকার করেন। ইহার ফলে ভারতের-উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে তুর্কী রাজশক্তি এবং ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রবেশ করিল।

সুলতান মামুদ : সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র মামুদ গজনীর সুলতান হন। সুলতান মামুদ বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া উত্তর-ভারতের বহু সমৃদ্ধ নগর ও তীর্থস্থান লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। পঞ্জাব এবং মূলতান ব্যতীত ভারতের অন্য কোন অংশ তিনি গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। শাহীরাজা জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হইয়া প্রচুর অর্থ মুক্তিপণ স্বরূপ দিলেন। ১০০৬খ্রীষ্টাব্দে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল মামুদের আক্রমণে কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মামুদ এই বৎসর সিন্ধুদেশের উত্তরাংশে সুলতানরাজ্য জয় করিলেন। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দপাল উত্তর ভারতের রাজগণের সাহায্যে বিরাট এক সৈন্যদল লইয়া মামুদকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে মামুদ জয়লাভ করিলেন। প্রচুর ধনরত্ন মামুদের হস্ত গত হইল। এই বৎসর উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশের মুখে অবস্থিত ভাতন্দা দুর্গ জয় করেন। ১০১৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচন পাল কাশ্মীর রাজ সংগ্রাম রাজের সাহায্য লইয়া মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এবারও মামুদ জয়ী হইলেন। ত্রিলোচন পালের পুত্র ভীমপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভীমপালের মৃত্যু হইলে শাহীবংশ বিলুপ্ত হইল।

মামুদের ভারত অভিযান

ইহার পর হইতে মামুদ নিয়মিতভাবে ভারতের সমৃদ্ধ নগরীগুলি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা ও কনৌজ লুণ্ঠিত হইল। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া দুইকোটি স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেন।

মহম্মদ ঘোরী : সুলতান মামুদের ভারত অভিযানেয় দেড়শত বৎসর পরে মহম্মদ

ঘোরী উত্তর ভারতে তুর্কীরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী ঘোর রাজ্যের শাসকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী মূলতান আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমের নিকট পরাজিত হন। নিরস্ত না হইয়া মহম্মদ ঘোরী ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের বংশধরগণকে পরাস্ত করিয়া পেশোয়ার অধিকার করিলেন। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে ঘোরীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ১১৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিয়ালকোট এবং লাহোর তাঁহার অধিকারে আসিল।

সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার করিবার পর মহম্মদ ঘোরী দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে কনৌজের গাহড়বাল রাজপুত রাজা জয়চাঁদ মহম্মদঘোরীকে পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইন প্রান্তরে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইল। ঘোরী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু পর বৎসর তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। জয়চাঁদ ব্যতীত বহু হিন্দুরাজা সৈন্য দিয়া পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু ঘোরীর প্রতারণায় এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এইবার হিন্দু সৈন্য পরাজিত হইল। পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন এবং চৌহানরাজ্য মহম্মদ ঘোরীর অধিকারভুক্ত হইল। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক দিল্লী, আজমীড়, মীরাট, আলিগড় প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দাবারের যুদ্ধে জয়চাঁদ পরাজিত ও নিহত হইলেন। গাহড়বাল রাজ্য মুসলমান অধিকারভুক্ত হইল। বারাণসী লুণ্ঠিত হইল। কুতবউদ্দীন গুজরাট আক্রমণ করিয়া চৌলুক্য রাজধানী অনহিলবাড়া লুণ্ঠন করিলেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে চন্দেল্ল বংশীয় রাজপুতগণকে পরাজিত করিয়া কুতবউদ্দীন কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিলেন। মহম্মদ ঘোরী কুতবউদ্দীনকে ভারতে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কুতবউদ্দীন যখন উত্তর ভারতে মহম্মদ ঘোরীর রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অপর এক সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দীন বখ্তিয়ার খলজী একদল সৈন্য লইয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং মগধ ও গৌড় জয় করেন। বখ্তিয়ার অতর্কিত আক্রমণে মগধের পালবংশীয় নরপতিকে এবং বাঙলার সেনরাজ লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। ফলে মগধ,গৌড় ও রাঢ়ে মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে কাশ্মীর, গুজরাট, মালব, পূর্ববঙ্গ এবং আসাম ব্যতীত প্রায় সমগ্র উত্তরভারত মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়।

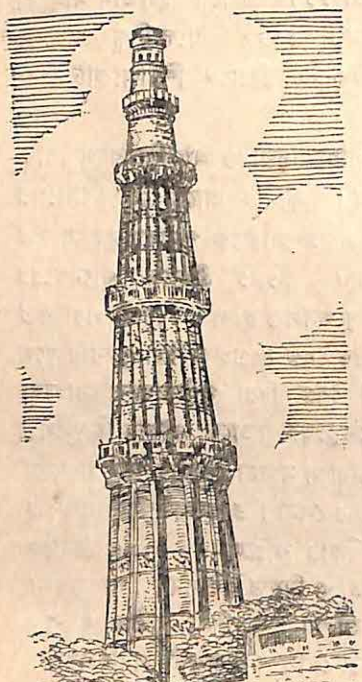
তরাইনের যুদ্ধ

কুতবউদ্দিন কর্তৃক রাজ্যবিস্তার

মগধ ও গৌড় জয়

কুতবউদ্দীন (১২০৬-১২১০ খ্রীঃ): অপুত্রক মহম্মদ ঘোরী ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং তাঁহার আফগানিস্তান ও উত্তরভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। কুতবউদ্দীন দিল্লীতে প্রভুত্ব

স্থাপন করিলেন। কুতবউদ্দীন তাঁহার জীবনের প্রারম্ভে ক্রীতদাস ছিলেন। ভারতের সুলতান হইবার পর তিনি মাত্র চার বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করেন। ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার ক্রীতদাসদের মধ্যে তাজউদ্দীন গজনীতে এবং নাসিরউদ্দীন সিন্ধুদেশে শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। কুতবউদ্দীন যুদ্ধ করিয়া কিছুদিনের জন্য গজনী অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাজউদ্দীন গজনী পুনরুদ্ধার করেন এবং গজনীর সহিত ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। নাসিরউদ্দীন কুতবের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। ফলে পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে পূর্বে রাঢ় পর্যন্ত কুতবউদ্দীনের রাজ্য বিস্তৃত হয়। দিল্লী কুতবউদ্দীনের রাজধানী হইলেও তিনি নিজে লাহোরে বাস করিতেন। উদারতা ও দানশীলতার জন্য কুতবউদ্দীন লাখ-বক্স অর্থাৎ লক্ষদাতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। দিল্লীতে কুতব মিনার নামক স্তম্ভের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং লাহোরেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।



কুতুব মিনার

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ): কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম-শাহকে অপসারিত করিয়া কুতবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিস দিল্লীর সুলতানের পদ অধিকার করেন। ইলতুৎমিস প্রথম জীবনে কুতবউদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি অবশ্য এক অভিজাত তুর্কবংশের সন্তান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল।

কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালেই রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সুলতান হইয়া ইলতুৎমিস প্রথমেই এই সকল বিদ্রোহ দমন করিলেন। নাসিরুদ্দীন সিন্ধুদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁহাকে লাহোর হইতে বিতাড়িত করিলেন। সিন্ধুদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তাজউদ্দীন পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া পঞ্জাব পুনরুদ্ধার করেন। গোয়ালিয়র এবং রণথম্ভোরের দুর্গ দুইটি হিন্দুরাজগণ অধিকার করিয়াছিলেন। ইলতুৎমিস ঐ দুর্গ দুইটিকেও পুনরুদ্ধার করিলেন। বাঙলার শাসনকর্তা আলিমর্দান খলজী কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালেই স্বাধীন হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাঙলার সুলতান হইলে ইলতুৎমিস মগধ আক্রমণ

বিদ্রোহ দমন

করিলেন। ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদের হস্তে গিয়াসউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হইলেন। নাসিরুদ্দীন মামুদ লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাঙলা ও অযোধ্যা এই দুইটি প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হইলে ইখতিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খলজী বাঙলা অধিকার করিলেন। ইলতুৎমিস স্বয়ং আসিয়া বাঙলার বিদ্রোহ দমন করিলেন।

দাসগোষ্ঠীর সুলতানগণের মধ্যে ইলতুৎমিস সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর সময়ে বিজিত রাজ্যগুলিকে কুতবউদ্দীন সংহত করিতে পারেন নাই। ইলতুৎমিস এইগুলিকে সংহত করিয়া এক সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। বাগদাদের খলিফা ইলতুৎমিসের রাজ্যশাসন অনুমোদন করিয়া দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। খলিফা ইলতুৎমিসকে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি এবং খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) দান করেন। তিনি ইলতুৎমিসের তুর্কী নামের সহিত 'শামসউদ্দীন' (ধর্মসূর্য) উপাধি যোগ করেন। ইহাতে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের সমাজে ইলতুৎমিসের সম্মান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইলতুৎমিস তাঁহার মুদ্রায় নিজেকে খলিফার প্রতিনিধিরূপে প্রচার করেন। ভারতে মুসলমান শাসকগণের মধ্যে তিনিই প্রথম রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত করেন। বহু বিদ্বান ও গুণীকে আশ্রয় দিয়া ইলতুৎমিস তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা এবং শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কুতবমিনারের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন এবং আজমীড়ে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন।

কৃতিত্ব



রজিয়া বেগম

রজিয়া বেগম (১২৩৬-১২৪০ খ্রীঃ) ঃ ইলতুৎমিসের পুত্রগণ যোগ্য ছিলেন না। এজন্য তিনি কন্যা রজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। প্রভাবশালী ওমরাহগণ প্রথমে স্ত্রীলোকের শাসন মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী রজিয়া সুকৌশলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। রজিয়া পুরুষের বেশে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল রাজত্ব করা সম্ভব হইল না। সরহিন্দের শাসনকর্তা আলতুনিয়া বিদ্রোহী হইয়া রজিয়াকে বন্দিনী করেন। রজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বিদ্রোহীগণের দ্বারা রজিয়া ও তাঁহার স্বামী উভয়েই নিহত হইলেন।

নাসিরুদ্দীন মামুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রীঃ) ঃ রজিয়ার শোচনীয় মৃত্যুর পর রাজ্যে কিছুদিন ধরিয়া বিশৃঙ্খলা চলিল। প্রথমে ইলতুৎমিসের পুত্র মুইজউদ্দীন বহরাম এবং পৌত্র আলাউদ্দীন মামুদ ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র

নাসিরুদ্দীন মামুদ দিল্লীর সুলতান হন। তাঁহার বিশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ খাঁ প্রকৃত পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করেন।

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৮ খ্রীঃ) ঃ নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর উলুঘ খাঁ গিয়াসউদ্দীন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান হন। তুর্কজাতীয় বলবন ইলতুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তিনি ইলতুৎমিসের জামাতা হন। সুলতান হইয়াই বলবন প্রথমে রাজমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। ওমরাহগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক বারানী জানাইয়াছেন যে বলবনের বিশ্বাস ছিল "প্রজারভীতিই রাজশক্তির ভিত্তি।" সুতরাং বলবন তাঁহারচতুষ্পার্শ্বে এক ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বক্ষণ সৈনিকের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর আমীর বা সাধারণ প্রজার সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। তাঁহার রাজসভায় হাস্যকৌতুক, মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ ছিল।



গিয়াসউদ্দীন বলবন

ওমরাহ দমন

ইলতুৎমিস তাঁহার শাসনকালে চল্লিশজন কর্মদক্ষ ক্রীতদাসকে লইয়া এক চক্রগঠন করিয়াছিলেন। বলবন নিজেও এই চক্রের অন্যতম ছিলেন। সুলতান হইয়াই তিনি এই চক্র ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তিনি সন্দেহভাজন ওমরাহদের হত্যা করাইলেন। অনেকের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া ক্ষমতা হ্রাস করিলেন। সামরিক বিভাগের সংস্কার করিলেন। ইহাতে রাজশক্তি দৃঢ় হইয়া উঠিল।

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইলেও ভারতে প্রবেশ করেন নাই। তাহারা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বলবন সর্বদা সতর্ক থাকিতেন।

মোঙ্গলদের প্রতিরোধ

সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ করিয়া তিনি সেখানে রণনিপুণ সৈন্যদল মোতায়েন করিলেন। মূলতান, সিন্ধু ও লাহোর শাসন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদকে এবং সুনাম ও সামানা প্রদেশে দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে নিযুক্ত করিলেন।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে বলবন কখনই অবহেলা করেন নাই। রাজস্থানের অন্তর্গত আলোয়ার অঞ্চলের রাজপুতগণকে, গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুগণকে, রোহিলখণ্ড এবং লবণ পর্বত অঞ্চলের বিরোধী হিন্দুগণকে তিনি নির্দয়ভাবে কঠোর হস্তে দমন করেন। বাঙলা দেশে মুঘিস উদ্দীন তুঘ্রিল খাঁ দিল্লীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। আশী বৎসরের বৃদ্ধ বলবন স্বয়ং তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া বাঙলায় উপস্থিত হন। তুঘ্রিলের রাজধানী

লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া বলবন উহার প্রতিটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে তুঘ্রিল নিহত হইলে বলবন তাঁহার পুত্র বুঘরা খাঁকে বাঙলার শাসনভার দিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ কালে বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের মৃত্যু হয়। পুত্রশোকে ভগ্নহৃদয় সুলতান অল্পকাল পরে পরলোকগমন করেন। বলবন বিদ্যোৎসাহী এবং গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু, ঐতিহাসিক মিনহাজ এবং মোঙ্গল কর্তৃক বিতাড়িত মধ্য এশিয়ার কয়েকজন নরপতি তাঁহার দরবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বলবনের কঠোর শাসনে দেশে শৃঙ্খলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক বরনী লিখিয়াছেন যে, বলবনের শাসনে রাজপথে দস্যু তস্করের উপদ্রব ছিল না। দিল্লীর রাজদরবারে পারস্য দেশীয় প্রথা প্রচলন করিয়া তিনি রাজপদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

দাস রাজত্বের পতনঃ বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র, বাঙলার শাসনকর্তা বুঘরা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ তিন বৎসরের জন্য দিল্লীর সুলতান হন। কায়কোবাদ গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার শিশুপুত্র কৈয়ুরমার্সকে সুলতান পদে আসীন করা হয়। সুযোগ বুঝিয়া সেনাপতি জালালউদ্দীন খলজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং খলজী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক বরনীর মতে দাসগোষ্ঠীর সুলতানগণের শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তুর্কী শাসনের অবসান হইল। কারণ দাস সুলতানগণ সকলেই তুর্ক জাতীয় ছিলেন। খলজী বংশীয়েরা আদিতে তুর্ক হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ আফগানিস্থানের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁহাদের আফগানরূপে গণ্য করা হইত।

জালালউদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রীঃ)ঃ দিল্লীর সুলতান হইবার সময় জালাল উদ্দীন ছিলেন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন কর্তৃক নিযুক্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন।



আলাউদ্দিন খলজী

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)ঃ সিংহাসন লাভের পর জালালউদ্দীন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনকে এলাবাদের নিকটবর্তী কারা অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতানের অনুমতিক্রমে আলাউদ্দীন মালব ও বিদিশা অধিকার করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ অযোধ্যা প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হন। আলাউদ্দীন দেবগিরির যাদব রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। বিজয়োৎসব করিবার জন্য আলাউদ্দীন সুলতানকে

সিংহাসন লাভ

কারায় আক্রমণ করিলেন এবং ঘাতক দ্বারা বৃদ্ধ সুলতানকে হত্যা করাইলেন। তাহার পর তিনি নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জালালউদ্দীনের পত্নী



মালিকা জাহান দিল্লীর আমীরগণের সাহায্যে পুত্র রুকনউদ্দীনকে সুলতানরূপে ঘোষণা করিলেন। আলাউদ্দীন উৎকোচ দিয়া দিল্লীর আমিরগণকে বশীভূত করিলেন। জালালউদ্দীনের পুত্রগণ নিহত হইল।

দিল্লীর মসনদ অধিকার করিয়া আলাউদ্দীন রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। তিনি গুজরাট আক্রমণ করিয়া সেখানকার চৌলুক্য বংশীয় রাজা কর্ণকে পরাজিত করিলেন।

তাহার পর তিনি রাজপুতানায় উপস্থিত হইয়া এক বৎসর ব্যাপী অবরোধের পর চৌহান বংশীয় রাজা হামীরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রণথম্ভোর অধিকার করিলেন। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেবারের রাজধানী চিতোর অধিকার করিলেন। দুই বৎসর পরে মালব বিজিত হইয়া তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। কাশ্মীর, নেপাল এবং আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের রাজ্য বিস্তৃত হইল। ইহার পর আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার ক্রীতদাস ও সেনাপতি মালিক কাফুর কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত করিলেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করিলে রামচন্দ্র বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বরঙ্গলের কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্র পরাজিত হইয়া বাৎসরিক কর দানে বাধ্য হইলেন। দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজা তৃতীয় বীরবল্লালের ভাগ্যেও একই অবস্থা ঘটিল। কাফুর পাণ্ড্যরাজ্যে উপস্থিত হইয়া মাদুরা লুণ্ঠন করিলেন। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দিল্লীর সার্বভৌম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

রাজ্য বিস্তার

আলাউদ্দীন যখন রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় মোঙ্গলগণ ছয়বার ভারত আক্রমণ করে। জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে বহু মোঙ্গল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহারা দিল্লীতে বাসস্থাপন করিয়াছিল। ভারতে মোঙ্গল অভ্যুত্থান রোধ করিবার জন্য আলাউদ্দীন ত্রিশ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করাইলেন। ইহাতে মোঙ্গল আভযান বন্ধ হইল না। আলাউদ্দীন যখন চিতোর অভিযানে ব্যস্ত, সেই সময় মোঙ্গল নেতা তার্ঘী খাঁ দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করিলেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য আলাউদ্দীন পঞ্জাব, মূলতান এবং সিন্ধুর পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার করিয়া আরও নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং সীমান্তের জন্য একজন বিশেষ শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। মোঙ্গলেরা চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করিলে মালিক কাফুর তাহাদের পরাজিত করিলেন। সীমান্ত শাসক গাজী মালিক তুঘলক মোঙ্গলদের অর্ধলক্ষ সৈন্যকে হত্যা করিয়া তাহাদের পঞ্চম অভিযান প্রতিরোধ করিলেন। গাজী মালিক মোঙ্গলদের ষষ্ঠ অভিযানও ব্যর্থ করিলেন। আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য নিরাপদ হইল।

মোঙ্গল আক্রমণ

আলাউদ্দীন অত্যন্ত সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁহার বিশাল সৈন্যদল নিয়মিত বেতন পাইত। সুলতান তাঁহার রাজধানী অঞ্চলে খাদ্য দ্রব্য এবং গবাদিপশুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছিলেন। একমণ গমের মূল্য ছিল চল্লিশ পয়সা। কোন ব্যবসায়ী ওজন কম দিলে তাহার শরীর হইতে সমান ওজনের মাংস কাটিয়া লওয়া হইত। দিল্লীর রাজকীয় শস্যাগারে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত রাখা হইত এবং 'শাহ্‌না-ই-মণ্ডী' বা 'বাজার তত্ত্বাবধায়ক' খাদ্যশস্যের আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিতেন। কেহই শস্য মজুত করিতে অথবা বর্ধিত মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতে পারিত না। একবার অনাবৃষ্টির সময় 'শাহ্‌না-ই-মণ্ডী' খাদ্য মূল্য সামান্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন বলিয়া সুলতানের আদেশে তাহাকে বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল' তাহা সত্ত্বেও হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের

প্রজাই আলাউদ্দীনকে "বিধাতার অভিসম্পাত" বলিয়া মনে করিত। আলাউদ্দীন হিন্দুদের পক্ষে অশ্বারোহণ, অস্ত্রধারণ, মূল্যবান বস্ত্র পরিধান ও বিলাস সামগ্রী ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের জিজিয়া কর দিতে হইত। তাহাদের জন্য উৎপাদনের অর্ধাংশ রাজকর রূপে নির্ধারিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ নিবারণের জন্য সুলতান আমীরগণের মধ্যে বিনা অনুমতিতে বিবাহ এবং সামাজিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। আমীর ও প্রজাগণের উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করিবার জন্য তিনি মদ্যপান ও জুয়াখেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশকে তিনি একই রাজস্বনীতির অধীন করিয়াছিলেন।

শাসন ব্যবস্থা

আলাউদ্দীনের চরিত্রে বিবিধ দোষগুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি নির্মম, ক্ষমতা-লোভী এবং অত্যাচারী ছিলেন। প্রজার মঙ্গলকামনা করিলেও তিনি কার্যতঃ সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রজার অকল্যাণই সাধন করিয়াছিলেন। মুসলমান হইলেও উলেমাগণকে তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়, শিল্পানুরাগী এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে শিরী নামে এক নগরী স্থাপন করিয়া তিনি সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কুতবমিনারের আলাইদরওয়াজা তিনিই নির্মাণ করেন। প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি আমীর খসরু তাঁহার সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব কালেই এই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।

চরিত্র

খলজী বংশের পতন ও তুঘলুক বংশের প্রতিষ্ঠা : আলাউদ্দীনের শেষ জীবনে মালিক কাফুর অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হন। সন্দেহ করা হয় যে কাফুর বিষ প্রয়োগে আলাউদ্দীনকে হত্যা করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুর আলাউদ্দীনের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের অপর এক পুত্র কুতবউদ্দীন মোবারক বিদ্রোহ করেন এবং মালিক কাফুরকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সুলতান হন। মোবারক মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করেন। খসরু নামে তাঁহার এক প্রিয় পাত্রের হস্তে মোবারক নিহত হন। তাহার পর পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসন কর্তা গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া তুঘলুক বংশের পত্তন করেন।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক (১৩২০-১৩২৫ খ্রীঃ) : গাজী মালিক সিংহাসনলাভ করিয়া গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গিয়াসউদ্দীন মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। বাঙলা দেশে বিদ্রোহ দমনের পর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন কালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করেন এই দুর্ঘটনা তাঁহার পুত্র জৌনাখাঁর পূর্ব পরিকল্পিত ছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলুক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ) : গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জৌনা খাঁ মহম্মদ বিন তুঘলুক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হন। সুলতান হইয়াই তিনি রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগী হন। তিনি পূর্বপ্রচলিত করের উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন এবং আরও কয়েকটি নূতন কর স্থাপন

করিলেন। কর ভারে জর্জরিত হইয়া কৃষকেরা ভূমি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, ফলে দোয়াব অঞ্চল শস্যহীন হইয়া পড়িল। দুভাগ্যক্রমে এই সময় সাত বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সুলতান কৃষকদিগকে খাদ্য, চাষের বীজ, পশু, জল সেচ এবং ঋণদানের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রাজস্ব হ্রাস করিলেন না বা রাজস্ব সংগ্রহ স্থগিত রাখিলেন না। পলাতক কৃষকগণকে ধরিবার জন্য সৈন্যদের আদেশ দিলেন। তাহাদের অত্যাচারে বহু কৃষক নিহত হইল। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারাণী এই ঘটনাকে 'মনুষ্য-শিকার' এবং ইহার জন্য মহম্মদ তুঘলুককে 'নর-রাক্ষস' আখ্যা দিয়াছেন।

কৃষক উৎপীড়ন



মহম্মদ বিন তুঘলুক

ইহার পর মহম্মদ তুঘলুক শাসন সংস্কারে মন দিলেন। মোঙ্গলগণের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজধানীকে তিনি নিরাপদ দূরত্বে সরাইয়া লইতে মনস্থ করিলেন। তাহার সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুরাতন দেবগিরিকে দৌলতাবাদ নাম দিয়া সেখানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং দিল্লীর সকল অধিবাসীকে সেখানে যাইতে বাধ্য করিলেন। অবশ্য ইহার জন্য তিনি উপযুক্ত পথ ঘাট এবং সরাইখানার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৌলতাবাদের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় আটবৎসর পরে সকলকে পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। লোকের ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থাও করিলেন। কিন্তু দুইবার যাতায়াতে লোকের কষ্টের সীমা রহিল না। মহম্মদ তুঘলুক 'পাগলারাজা" নামে পরিচিত হইলেন।

রাজধানী পরিবর্তন

দুর্ভিক্ষ, প্রজার করদানে অসামর্থ্য, রাজধানী স্থানান্তরের ব্যয়, রাজ্যে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস ইত্যাদি নানা কারণে রাজকোষে অর্থের অভাব দেখা দিল। অর্থ সমস্যা সমাধানের জন্য সুলতান নিজ নামাঙ্কিত তাম্র-মুদ্রা প্রচলন করিলেন। কিন্তু মুদ্রা জাল বন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা না করায় জাল মুদ্রায় দেশ ভরিয়া গেল। বিদেশী বণিকগণ এই মুদ্রা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সুলতান বাধ্য হইয়া তাম্র মুদ্রা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

তাম্রমুদ্রা প্রচলন



মহম্মদ তুঘলুকের মুদ্রা

ইহার পর সুলতান দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খোরাসান (পারস্য) জয়ের উদ্দেশ্যে তিনলক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল। শেষ পর্যন্ত অভিযান পরিত্যক্ত

হইল। অনর্থক বহু অর্থ ব্যয় হইল। ইহার পর স্থলতান কুমায়ুন গাড়োয়ালের পার্বত্য জাতিকে দমন করিবার জন্য একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কুমায়ুনের রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তুষারপাতে ও খাদ্যাভাবে হিমালয়ের গিরিবর্তে সৈন্য বাহিনীর একাংশ ধ্বংস হইয়া গেল। কুমায়ুন অভিযানে স্থলতানের সৈন্যদল বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করিয়াছিল। চীনের মোঙ্গল সম্রাট তোঘান এই সকল মঠ পুনর্নিমাণের অনুমতি চাহিয়া মহম্মদ তুঘলুকের নিকট দূত প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে মহম্মদ জিজিয়া কর দাবী করিয়া মরক্কোবাসী 'পর্যটক ইবনবতুতাকে দূতরূপে চীন দেশে প্রেরণ করেন।

মহম্মদের খামখেয়ালী অত্যাচার প্রজাদের অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দিল। হরিহর এবং তাহার ভ্রাতা বুক্কা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগর এবং হাসানগঙ্গু বাহমান কৃষ্ণানদীর উত্তরতীরে স্বাধীন বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। মুহম্মদ তাঁহার সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত দাক্ষিণাত্য, মাহুরা, কুমায়ুন, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, লাহোর, মুলতান, সামানা, গুজরাট, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের জন্য ছুটিয়া বেড়াইলেন। বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সিন্ধুদেশে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সেখানেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

বিদ্রোহ

ফিরোজ তুঘলুক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ) ঃ মহম্মদ তুঘলুকের মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘলুক দিল্লীর স্থলতান হন। ফিরোজের পিতা রজব ছিলেন মহম্মদ তুঘলুকের খুল্লতাত। তাঁহার মাতা ছিলেন জাঠরাজকন্যা নীলাদেবী (কদবানু)। ফিরোজশাহ দুর্বলচিত্ত ও শান্তিপ্রিয় স্থলতান ছিলেন। ফিরোজের শাসন ব্যাপারে তাঁহার দোষগুন উভয়ই ধরা পড়ে। শাসন ব্যাপারে তিনি কোরাণের নির্দেশ অনুসরণ করিতেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব নির্মাণ করেন। দরিদ্র মুসলমানদের জন্য দেওয়ান-ই-খয়রাত (দানবিভাগ) স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজ্যের অনাথা বিধবা এবং অনাথ শিশুদের বৃত্তি দেওয়া হইত। ইমাম ও উলেমাদের ভরণ-পোষণের জন্য ভূমিদান করা হইত। মুসলিম কুমারীদের বিবাহের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হইত। কর্মসংস্থানের জন্য ফিরোজশাহ একটি বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রচলিত তেইশ প্রকার কর ও শুল্ক তুলিয়া দিয়া কোরাণ অনুমোদিত মাত্র চার প্রকার কর প্রবর্তন করেন। অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড তিনি রহিত করেন। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে ফিরোজশাহ অনুদার ছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান অতএব শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়া এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি উলেমাগোষ্ঠীর প্রিয় হইয়াছিলেন।

শাসনসংস্কার

ফিরোজশাহ সাহিত্য ও শিল্প প্রিয় ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার আত্মচরিত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে ঐতিহাসিক বারাণী একটি এবং শামসী সিরাজ 'তারিখ-ই-ফিরুজ' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত সুফী জ্ঞানী জালালউদ্দীনরুমীকে সমাদর করিয়া ফিরোজ তাঁহার দরবারে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে ফিরোজাবাদ

চরিত্র

নামে এক নূতন শহর পত্তন করিয়াছিলেন। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর শহরটিও তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুইশত মাইল দীর্ঘ যমুনার খাল তিনিই খনন করাইয়াছিলেন।

যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যাপারে ফিরোজ শাহ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। বাঙলাদেশে শামসউদ্দীন ইলয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে ফিরোজশাহ দুইবার বাঙলা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনবারই সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। উড়িষ্যা এবং পঞ্জাবে সাময়িকভাবে কিছু সফল হইলেও সিন্ধুদেশ অভিযান প্রায় নিস্ফল হইয়াছিল। ইহার পর ফিরোজশাহ আর কোন যুদ্ধে অবতার্ণ হন নাই।

তুঘলুক শাসনের অবসানঃ ফিরোজশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকজন বংশধর কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের অযোগ্যতার জন্য দিল্লীর আধিপত্য নামমাত্রে পর্যবসিত হয়। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মামুদশাহের সময়ে তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুরকে বাধা দিবার শক্তি মামুদ শাহের ছিল না। তৈমুর পঞ্জাবের নানা স্থান বিধ্বস্ত করিয়া অবশেষে দিল্লী অধিকার করিলেন। মামুদ শাহ গুজরাটে পলায়ন করিলেন। তৈমুরের আদেশে দিল্লী নগরী লুণ্ঠিত ও বহু লোক নিহত হইল। তাহার পর তৈমুর ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে মামুদ শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৈমুরের আক্রমণে তুঘলুক সাম্রাজ্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ শাহের মৃত্যু হইলে তুঘলুক বংশ বিলুপ্ত হয়।

তৈমুরের ভারত আক্রমণ

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ)ঃ তৈমুরলঙ্গ ভারত ত্যাগের সময় মূলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁকে পঞ্জাব শাসনের ভার দিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ শাহের মৃত্যুর পর খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সাতবৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন। খিজির খাঁর পর তাঁহার পুত্র মোবারক 'শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া তের বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর সৈয়দবংশীয় সুলতান মহম্মদ শাহ দশ বৎসর এবং আলাউদ্দীন আলমশাহ ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। আলমশাহের দুর্বলতার সুযোগে পঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা বহলুল লোদী দিল্লী অধিকার করিয়া লোদী বংশের পত্তন করেন।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ)ঃ বহলুল লোদী দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান। সুদীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর (১৪৫১-১৪৮৯খ্রীঃ) তিনি রাজত্ব করেন। তাহার চেষ্টায় দিল্লীর পূর্বগৌরব কিছু পরিমাণে উদ্ধার হইয়াছিল। তিনি জৌনপুর রাজ্য জয় করেন। কালপি, ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়র তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়।

বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র সিকান্দার লোদী দিল্লীর মসনদ অধিকার করিয়া আঠাশ বৎসর (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তিনি বঙ্গদেশের সীমান্ত পর্যন্ত দিল্লীর অধিকার বিস্তৃত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কিছু কর প্রত্যাহারের ফলে কৃষি এবং কিছু বাধানিষেধ অপসারণের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল।

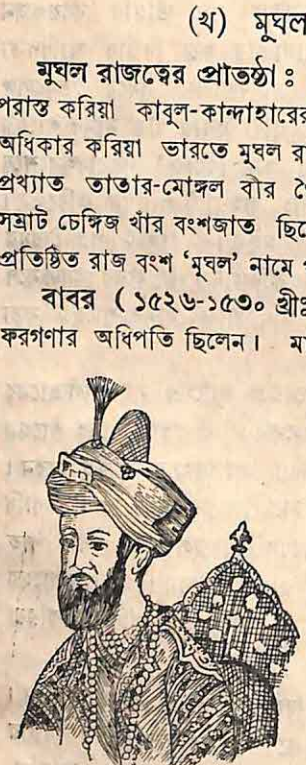
সিকান্দার লোদী হিন্দুপীড়ক ছিলেন। তবে তিনি ন্যায় বিচারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আগ্রা শহর স্থাপন করেন।

সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রীঃ) দিল্লীর সুলতান হন। তাঁহার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া আফগান আমীরগণ কাবুলের অধিপতি বাবরকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করেন। পাণিপথের যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলেন। ভারতে লোদী বংশের এবং তাহার সহিত আফগান প্রভুত্বের বিলোপ হইল।

(খ) মুঘল শক্তির উত্থান, বৃদ্ধি ও পতন

মুঘল রাজত্বের প্রাতষ্ঠা ঃ '১৫২৬' খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া কাবুল-কান্দাহারের অধিপতি জহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া ভারতে মুঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের পিতা ওমর শেখমীর্জা প্রখ্যাত তাতার-মোঙ্গল বীর তৈমুরলঙ্গের বংশধর ছিলেন। বাবরের মাতা মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিজ খাঁর বংশজাত ছিলেন। মোঙ্গল বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশ 'মুঘল' নামে পরিচিত হয়।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রীঃ) ঃ বাবরের পিতা মধ্য-এশিয়ার এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফরগণার অধিপতি ছিলেন। মাত্র এগারো বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া বাবর ফরগণার মসনদ লাভ করেন এবং মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে সমরখন্দ জয় করেন (১৪৯৭ খ্রীঃ)। কিন্তু তিন মাস পরেই তিনি উজবেগদিগের আক্রমণে সমরখন্দ ও ফরগণা হইতে বিতাড়িত হন। নানা অবস্থার পর বাবর কাবুল অধিকার করেন (১৫০৪ খ্রীঃ)। তৈমুরের বংশধর হিসাবে দিল্লীর সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য এই ধারণা বশে কাবুল অধিকার করিবার পর বাবর পাঁচবার ভারতবর্ষে অভিযান করেন এবং শেষবারের চেষ্টায় সফল-কাম হন।



বাবর

পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন আফগান ওমরাহগণকে বিতাড়িত করিয়া বিহার পর্যন্ত মুঘল রাজ্য বিস্তার করিলেন।

রাজ্যবিস্তার

কিছুকালের মধ্যেই মূলতান এবং গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল। ইহার পর মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ আশী হাজার রাজপুত অশ্বারোহী, পাঁচশত রণহস্তী ও অসংখ্য পদাতিক লইয়া বাবরকে

আক্রমণ করিলেন। ফতেপুর সিক্রীর নিকট খানুয়ার প্রান্তরে রাজপুত মুঘলে যুদ্ধ হইল। বাবর তাঁহার উৎকৃষ্ট রণকৌশল এবং কামান বন্দুকের সাহায্যে রাজপুত সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। খানুয়ার যুদ্ধের মত ইতিপূর্বে পাণিপথের যুদ্ধেও বাবর মাত্র বারো হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে ইব্রাহিম লোদীর একলক্ষ সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবর গোয়ালিয়রের অন্তর্গত চন্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মহমুদলোদী বিহারের পাঠান শক্তিকে একত্রিত করিলেন। বাবর দ্রুত অগ্রসর হইয়া পাটনার অদূরে ঘোঘরা নদীর তীরে পাঠান বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। বাঙলার স্থলতান নসরৎশাহ মুঘলবাদশাহ বাবরের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে বাবরের সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে বিহার এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

বাবর ভারতে মাত্র চার বৎসর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে আগ্রা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাবর যেমন কর্মকুশল, তেমনি স্নেহশীল ছিলেন। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন এবং সাহিত্য তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।

চরিত্র

তিনি স্বয়ং তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতেন। তুর্কী ভাষায় রচিত তাঁহার আত্মজীবনা অতি স্থললিত গদ্যের নিদর্শন এবং মুঘল রাজত্বের আদি পর্বের ইতিহাস রচনার পক্ষে মূল্যবান উপাদান।

হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪৩ খ্রীঃ এবং ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রীঃ): বাবরের মৃত্যুর পর তেইশ বৎসর বয়সে হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হন। হুমায়ুন শব্দের অর্থ ভাগ্যবান। কিন্তু বাস্তবে দুর্ভাগ্যই ছিল হুমায়ুনের সঙ্গী। হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা কামরানকে কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাবের এক অংশ এবং অপর দুই ভ্রাতা হিন্দাল ও আসকারিকে আলোয়ার, মেওয়াট ও সম্বল প্রদেশ দান করেন। এইরূপ রাজ্যবিভাগের ফলে হুমায়ুনের শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। কাবুল ও পঞ্জাব হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং কামরানের বিরোধিতায় এই অঞ্চল হইতে নূতন সৈন্য সংগ্রহের উপায় রহিত হইয়া যায়। হুমায়ুনের এই দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া বিহারের আফগান নায়ক শের খাঁ গৌড় অধিকার করিলেন। হুমায়ুন গৌড় অভিযান করিয়া গৌড় পুনরধিকার করিলেন। তিন মাস পরে হুমায়ুন আগ্রা প্রত্যাবর্তনের

রাজ্যচ্যুতি

পথে চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এক ভিস্তির সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়া হুমায়ুন কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করেন। পর বৎসর হুমায়ুন হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কনৌজের নিকটবর্তী বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়রূপে পরাজিত হইলেন। শের খাঁ দিল্লী অধিকার করিলেন এবং শেরশাহ উপাধি লইয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন। পরাজিত হুমায়ুন পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পারস্যরাজ হুমায়ুনকে সাহায্য করিলেন এবং হুমায়ুন কান্দাহার জয় করিলেন। এবং ভ্রাতা কামরানকে পরাজিত করিয়া কাবুল অধিকার করিলেন। তাহার পর

শেরশাহের মৃত্যু হইলে হুমায়ুন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সরহিন্দের যুদ্ধে শেরশাহের উত্তরাধিকারী সিকান্দর শূরকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ইহার কিছুকালপরেই এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় হুমায়ুনের জীবনাবসান হইল।

রাজ্যপুনরুদ্ধার

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) ঃ বিল্বগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন পারস্যে পলায়ন করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে সিন্ধু প্রদেশের অমরকোটের হিন্দু নরপতি বীরশাল তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য সপরিবারে আশ্রয় দান করেন। বীরশালের গৃহে হুমায়ুনের পুত্র আকবর ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর আকবর মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে দিল্লীর বাদশাহ পদে আসীন হন। হুমায়ুনের সেনাপতি বৈরাম খাঁ বালক বাদশাহের অভিভাবক হইলেন। হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু আফগান শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ আদিলশাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী, এক হাজার রণ হস্তী এবং একান্নটি কামান লইয়া দিল্লী অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে বৈরাম খাঁ হিমুকে বাধা দিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর চক্ষুতে তীরবিদ্ধ হইয়া হিমু আহত ও বন্দী হইলেন। বৈরাম খাঁ হিমুকে হত্যা করিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ভারতে মুঘল প্রভুত্বের সূচনা হইয়াছিল। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ) ভারতে মুঘল প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।



আকবর

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

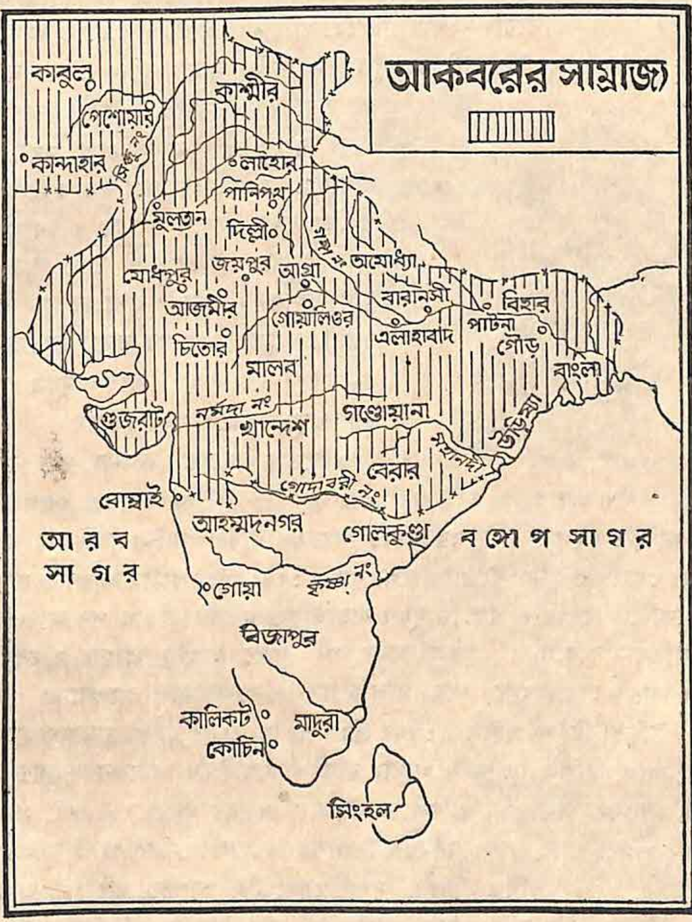
নাবালক আকবর তাঁহার রাজত্বের প্রথম চার বৎসর বৈরামখাঁর অভিভাবকত্বে ছিলেন। বৈরামখাঁ হুমায়ুনের ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৈরামখাঁ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া স্থন্নীমুসলমানেরা তাঁহার অপসারন দাবী করে, আকবর বৈরামকে মক্কা যাইতে অনুরোধ করিলেন। বৈরাম প্রথমে স্বীকৃত হইয়াও পরে বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বৈরাম যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আকবর বৈরামকে মার্জনা করিয়া মক্কায় প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে এক পাঠান আততায়ী বৈরামকে হত্যা করে। ইহারপর দুইবৎসর আকবরের ধাত্রীমাতা মাহাম আনাঘা তাঁহার পুত্র আধমখাঁর সাহায্যে আকবরের অভিভাবক রূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অবশেষে বাইশ বৎসর বয়সে আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১৫৬২ খ্রীঃ)।

বৈরামখাঁর বিদ্রোহ

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বৈরামখাঁর নেতৃত্বে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি আজমীড়, গোয়ালিয়র ও জোনপুর অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর আকবরের সেনাপতিগণ মালব জয় করেন। মালবের সুলতান বাজবাহাদুর

আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মধ্যভারতের গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে রাণী দুর্গাবতীকে পরাজিত করিয়া আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ এই অঞ্চলে মুঘল রাজ্য বিস্তার করেন। আকবর রাজপুতানা জয়ে উদ্যত হইলে অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের অধিপতি বিহারীমল বিনাযুদ্ধে আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং মুঘল বাদশাহের হস্তে নিজকন্যাকে সম্প্রদান করিলেন। অম্বর

রাজ্যবিস্তার



রাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যোধপুর, বুন্দী, বিকানীর, যশল্মীর, সিরোহী প্রভৃতি অন্যান্য রাজপুত রাজ্য মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিল। রাজপুত রাজাদের মধ্যে অনেকেই মুঘল রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বহু রাজা আকবরের রাজসভায় উচ্চপদ লাভ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। অম্বররাজ বিহারীমলের পুত্র মানসিংহ

মুঘলের সেনাপতি হইয়া বহুযুদ্ধ জয় করিয়া আকবরের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু মেবারের রাণা মুঘলের অধীন হইতে অস্বীকার করেন। আকবর চিতোর অবরোধ করিয়া চার মাসের চেষ্টার পর চিতোর অধিকার করিলেন। রাণা উদয়সিংহ মেবারের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চিতোর রমণীগণ জহরব্রত করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আকবর তাঁহার বেতনভোগী রাজপুত সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করিলেন।

রাণা প্রতাপসিংহ



রাণা প্রতাপ

হলদিঘাটের গিরিসঙ্কটে যুদ্ধ হইল। রাণা প্রতাপ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও মুঘল সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের নিকট পরাজিত হইলেন এবং পর্বতের দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকবর রাণা প্রতাপকে সম্পূর্ণ জয় করিতে ব্যর্থ হইলেন। বরং রাণাপ্রতাপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী কঠোর সংগ্রামের দ্বারা চিতোর ব্যতীত মেবারের এক বৃহৎ অংশ মুঘল অধিকার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

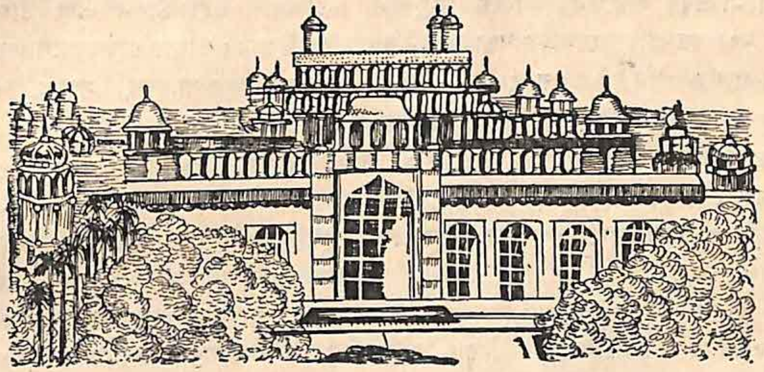
চিতোর দুর্গের পতনের পর রণথম্ভোর এবং কালঞ্জর দুর্গ আকবরের হস্তগত হইল। গুজরাট অধিকৃত হইল। আকবর বিহার আক্রমণ করিয়া পাটনা অধিকার করিলেন। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীঃ) পাঠান অধিপতি দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করিলে বিহার ও বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ইহার পর আকবর উত্তর-পশ্চিমে অভিযান করিলেন। প্রথমে কাবুল, পর বৎসর কাশ্মীর তাহার পাঁচবৎসর পরে সিন্ধু এবং আরও চার বৎসর পরে বালুচিস্তান ও কান্দাহার আকবরের অধিকারে আসিল। উড়িষ্যা বিজিত হইলে (১৫৯২ খ্রীঃ) পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে আকবর নেপাল, সিকিম, ভুটান ও আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হইলেন।

সম্রাট আকবর অতঃপর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। এই সময় বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এই চারটি মুসলমান রাজ্য অবস্থিত ছিল। মুঘল সেনাপতি আবদুর রহিম খাঁ আহমদনগর আক্রমণ করেন। আহমদনগরের সুলতান নিজাম শাহের কন্যা চাঁদবিবি আহমদনগরের নাবালক সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করেন। কিন্তু চাঁদবিবির মৃত্যু হইলে বেরার প্রদেশ এবং আহমদনগর বিজিত হইল। ইহার পর খান্দেশ বিজিত হইলে আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান সমাপ্ত হইল। তিনি আর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অগ্রসর হন নাই।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

আকবরের শেষজীবন অশান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হন। সেলিমের ষড়যন্ত্রে আকবরের মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত বন্ধু আবুল ফজল নিহত হন। অবশেষে সেলিম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতার অনুগত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে (১৬০৫ খ্রীঃ) তেষট্টি বৎসর বয়সে আকবর পরলোক গমন করেন।

শেষজীবন



আকবরের সমাধি

ভারতের ইতিহাসে সম্রাট আকবর-এর নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সমর নায়ক হিসাবে তিনি যেমন কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তেমনি প্রজার কল্যাণ কামনায় এবং শিল্পসাহিত্যের সমাদরে তাঁহার চরিত্র-গৌরবের পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজে নিরক্ষর হইলেও তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অদম্য ছিল। ধর্মমতের উদারতায় তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। রাজপুতগণকে তিনি যে রূপে মুঘল সাম্রাজ্যের মিত্র করিয়াছিলেন তাহা উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পারিচায়ক।

চরিত্র ও কৃতিত্ব



আবুল ফজল

তাঁহার স্বভাব সরল ও অমায়িক কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার ন্যায় বিচারে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল না। জিজিয়া কর বিলোপ করিয়া তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাগণকে

প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় তাঁহার রাজসভাতেও ফৈজী ও আবুল ফজল, টোডরমল, বিখ্যাত হাস্যরসিক রাজা বীরবল, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন প্রভৃতি জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ হইয়াছিল। ধর্মমতের গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া তিনি "দীন-ইলাহী" নামে ধর্ম প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু, জৈন, খ্রীষ্টান, পারসিক পণ্ডিতগণের নিকট হইতেও তিনি ধর্মতত্ত্বের আলোচনা শ্রবণ করিতেন। নিজে কিছুকাল নিরামিষাশী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৎসরের প্রায় অর্ধেকদিন পশুহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বহু সুন্দর সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, কৃষি, বাণিজ্য সকল বিষয়েই দেশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৬ খ্রীঃ)ঃ আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম দিল্লীর মসনদে আসীন হইয়া নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণ করেন। সিংহাসন লাভ করিয়াই জাহাঙ্গীর বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তাঁহার রাজপুত মহিষী মানবাঈ এর পুত্র খসরু তাঁহার পিতামহ আকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর খসরু আশা করিয়াছিলেন যে তিনিই দিল্লীর বাদশাহ হইবেন। জাহাঙ্গীর মসনদে উপবেশন করিলে খসরু নিরাশ হইয়া বিদ্রোহ করিলেন। জাহাঙ্গীর কঠোর হস্তে পুত্রকে দমন করিলেন। খসরুকে বন্দী করিয়া তাহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করা হইল। খসরুকে সাহায্য করিবার অপরাধে জাহাঙ্গীর শিখগুরু অর্জুনকে হত্যা করিলেন। ইহার ফলে শিখ সম্প্রদায় মুঘলের শত্রু হইয়া উঠিল।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যে সকল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়। জাহাঙ্গীরের আমলেই মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র অমরসিংহ মুঘলের অধীনতা স্বীকার করেন। আকবরের রাজত্বকালে বাঙলাদেশ বিজিত হইলেও বার ভূইঞা নামে প্রসিদ্ধ ভৌমিকেরা পুনঃ পুনঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মুঘলসৈন্যকে বিতাড়িত করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার সেনাপতি মানসিংহ এবং ইসলাম খাঁর সাহায্যে বাঙলার এই ভূইঞাগণের প্রতিরোধ চূর্ণ করেন। আকবরের সময়ে আহমদনগর পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরম আহমদনগর বিজয় সম্পূর্ণ করিলেন।

রাজ্যবিস্তার



জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর পুরস্কার স্বরূপ খুরমকে 'শাহজাহান' উপাধি দান করিলেন। পঞ্জাবের যে কাংড়া দুর্গ আকবর জয় করিতে পারেন নাই, তাহাও জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল অধিকারভুক্ত হয়।

রাজ্যলাভের প্রথমে যেমন, তেমনি শেষ জীবনেও জাহাঙ্গীরকে পুত্রের বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের বিধবা পত্নী অসামান্যা রূপসী মেহেরউন্নিসাকে জাহাঙ্গীর বিবাহ করিয়াছিলেন। বাদশাহকে বিবাহ করিয়া মেহেরউন্নিসার নাম হয় নূরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো। অসাধারণ বুদ্ধিমতী নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে প্রভাবিত করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শাহজাহানের বিদ্রোহ

নূরজাহান শের আফগানের কন্যার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহ্‌রইয়ারের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহাতে জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাহানের সন্দেহ হইল যে নূরজাহান তাঁহার জামাতা শাহ্‌রইয়ারকে দিল্লীর বাদশাহ করিবেন। স্থতরাং কান্দাহার জয়ের জন্য জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে আদেশ দিলে, শাহজাহান দূর দেশে যাইতে অসম্মত হইয়া বিদ্রোহ করিলেন। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মহাবৎ খাঁ শাহজাহানকে পরাজিত করিলেন। শাহজাহান পিতার বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং দুই পুত্র দারাশিকো ও ঔরঙ্গজেবকে জাহাঙ্গীরের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দাক্ষিণাত্যের নাসিকে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।



নূরজাহান

মহাবৎ খাঁ শাহজাহানের বিদ্রোহ দমন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নূরজাহান তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করিবার চেষ্টা করেন। ফলে মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া জাহাঙ্গীরকে পঞ্জাবে বন্দী করেন। নূরজাহান স্বেচ্ছায় স্বামীর

মহাবৎখাঁর বিদ্রোহ

সহিত বন্দিনী হইয়া কৌশলে সম্রাটকে মুক্ত করিলেন। মহাবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিয়া শাহজাহানের সহিত মিলিত হইলেন। এই বিদ্রোহের সমাধান হইবার পূর্বেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল (১৬২৭ খ্রীঃ)।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র কোমলে কঠোরে মিশ্রিত ছিল। মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য তাঁহার চরিত্রের বহুগুণ নষ্ট হইয়া যায়। তিনি স্থবিচারক ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে কোন

চরিত্র

গোঁড়ামী তাঁহার ছিল না। তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন। প্রজাদের অনেক করভার তিনি লাঘব করিয়াছিলেন। শিল্প-সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কনের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে চিত্রাঙ্কনে পটু ছিলেন। তাঁহার রচিত আত্মচরিত তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ)ঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময় শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। নূরজাহানের সমর্থনে শাহরইয়ার লাহোরে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শাহজাহনের শ্বশুর আসফ খাঁ লাহোর আক্রমণ করিয়া শাহরইয়ারকে পরাজিত করিলেন। শাহজাহান আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মুঘল মসনদে আরোহণ করিলেন এবং সিংহাসনের সকল দাবীদারকে হত্যা করিলেন।



শাহজাহান

শাহজাহানের রাজত্বের সুরুতেই বুন্দেলখণ্ডের রাজা ঝুঝর সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব সুবাদার খাঁজাহান লোদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাঙলাদেশের হুগলীতে পার্তুগীজগণ বিদ্রোহী হয়। শাহজাহান এই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কান্দাহার প্রদেশের অধিকার লইয়া পারস্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ চলিতেছিল। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর পারস্যরাজ কান্দাহার অধিকার করেন। আকবর উহা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে কান্দাহার মুঘলের হস্তচ্যুত হয়। শাহজাহান কান্দাহার পুনরধিকার করেন, কিন্তু এগারো বৎসর পরে পারস্যরাজ কান্দাহার কাড়িয়া ল'ন। শাহজাহান কান্দাহার বিজয়ের জন্য তাঁহার পুত্র ঔরঙ্গজীবের নেতৃত্বে দুইবার এবং দারার নেতৃত্বে তৃতীয়বার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সকল অভিযানই ব্যর্থ হইল। কান্দাহার বিজয়ের পর শাহজাহান মধ্য-এশিয়ার বাহ্লীক এবং বাদাকসান প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। শাহজাহানের চতুর্থ পুত্র মুরাদ এই অভিযানের নেতা ছিলেন। চার কোটি টাকা ব্যয় পরিচালিত এই অভিযানের ফল মাত্র দুই বৎসর স্থায়ী হইল। ভারতের অনুকূল আবহাওয়ায় বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মুঘল ওমরাহগণ মধ্য-এশিয়ার কঠোর জীবন সহ্য করিতে অপারগ হইলেন। দুই বৎসর পরেই বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া মুঘল-বাহিনী বাহ্লীক ত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিল।

কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়া জয় ও পরাজয়

মধ্য-এশিয়া এবং কান্দাহারে ব্যর্থ হইলেও শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি আহমদনগর রাজ্যের অধিকাংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুলতান আবদুল্লা শাহের গোলকুণ্ডা করদ রাজ্যে পরিণত হইল। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুড়ি লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড দিলেন। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরকে সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এই রাজ্য দুইটিকে আক্রমণ করিলেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়

জ্যেষ্ঠ-পুত্র দারার পরামর্শে সম্রাট শাহজাহান এই অভিযান বন্ধ করিবার জন্য ঔরঙ্গজীবকে নির্দেশ দান করিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতান প্রত্যেকেই নগদ এক কোটি টাকা এবং রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয় অসমাপ্ত রহিল।

গৃহ-যুদ্ধ

শাহজাহানের শেষ জীবন বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-পুত্র দারা পঞ্জাবের সুবাদার হইলেও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী রূপে সর্বদাই রাজধানীতে বাস করিতেন। মধ্যম পুত্র সুজা বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শাহজাহান গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সুজা রাজমহলে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করিয়া নিজ-নামে মুদ্রা প্রচার করিলেন। মুরাদও গুজরাটে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সুজা সসৈন্যে রাজধানী আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মুরাদও সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। ঔরঙ্গজীবও দাক্ষিণাত্য বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিজেদের মধ্যে পিতার সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লইবার শর্তে ঔরঙ্গজীব মুরাদের সহিত গোপনে চুক্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকটে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে শাহজাহান কতকটা সুস্থ হইয়া ঔরঙ্গজীব ও মুরাদের গতিরোধ করিবার জন্য মারবাড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং সেনাপতি কাশিম খাঁকে প্রেরণ করিলেন। উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাট নামক স্থানে এক যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হইলেন। দারা সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আগ্রার আট মাইল পূর্বে সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ঔরঙ্গজীব আগ্রা অধিকার করিয়া শাহজাহানকে বন্দী করিলেন। তাহার পর ঔরঙ্গজীব কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলেন। দারা আজমীড় অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সুজা প্রথমে দারার পুত্র সুলেমানের নিকট এবং পরে এলাহাবাদের নিকটবর্তী খাজুয়ার যুদ্ধে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করিলেন। ঔরঙ্গজীবের সেনাপতি মীরজুমলা সুজার পশ্চাদ্ধাবন করিলে সুজা আরাকানে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবতঃ আরাকানেই সুজার মৃত্যু হয়। দারা পলায়ন করিয়াও রক্ষা পাইলেন না। বোলান গিরিসঙ্কটের দাদর্ নামক স্থানে তিনি বন্দী হইলেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া সর্বজন সমক্ষে হত্যা করিলেন। দারার পুত্র সুলেমানও ঔরঙ্গজীবের হস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন। ঔরঙ্গজীবের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ জীবিত রহিল না। হতভাগ্য বৃদ্ধ শাহজাহান আগ্রা দুর্গে বন্দী থাকিয়া ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের এই শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিলেন। আট বৎসর কাল বন্দী জীবন-যাপনের পর শাহজাহানের প্রাণ বিয়োগ হইল।

ঔরঙ্গজেবের হস্তে শাহজাহান বন্দী

শাহজাহান দয়ালু এবং প্রজাবৎসল সম্রাট ছিলেন। ইতালীয় পর্যটক মানুচি জানাইয়াছিলেন যে, "রাজ-কর্মচারীগণ উৎকোচ গ্রহণ করিলে বা প্রজাপীড়ন করিলে সম্রাট তাহাদের কঠোর শাস্তি দিতেন।" তবে রাজধানী হইতে দূরবর্তী প্রদেশে অবস্থা অন্য রূপ ছিল। ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ে লিখিয়াছেন যে প্রাদেশিক শাসকগণের উৎপীড়নের ফলে কৃষক ও শিল্পীরা দুরবস্থায় কাল কাটাইত। ধর্ম বিষয়ে শাহজাহান অনুদার ছিলেন। হিন্দুদের নূতন মন্দির নির্মাণ তিনি নিষিদ্ধ করেন এবং বারাণসী অঞ্চলে বহু নব নির্মিত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। তিনি হিন্দুগণের উপর তীর্থ কর পুনঃপ্রচলিত করেন।

চরিত্র

শাহজাহানের শিল্পপ্রীতি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পত্নী মমতাজের সমাধির উপর যে তাজমহল তিনি নির্মাণ করিয়াছেন তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে তাঁহার জীবনের সকল ত্রুটি বিচ্যুতিকে ঢাকিয়া দেয়।

ঔরঙ্গজীব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) ঃ পিতাকে বন্দী করিয়া তাঁহার জীবিতকালেই ঔরঙ্গজীব মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন সর্বাধিক বিস্তৃতি পাইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি বাঙলার সুবাদার মীর জুমলা আসামের আহোমগণকে পরাস্ত করেন। মীর জুমলার পরবর্তী সুবেদার শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে আফ্রিদি প্রভৃতি দুর্দান্ত উপজাতিগুলিকে দমন করিতে ঔরঙ্গজীবকে বেশ বিব্রত হইতে হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে পুনরায় অভিযান করিয়া ঔরঙ্গজীব ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর এবং পর বৎসর গোলকুণ্ডা অধিকার করিয়া এই রাজ্য দুইটিকে সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহাতে গজনী হইতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর হইতে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের তিনি অধীশ্বর হইলেন। এই সাম্রাজ্য একুশটি সুবায় বিভক্ত হইল।



ঔরঙ্গজীব

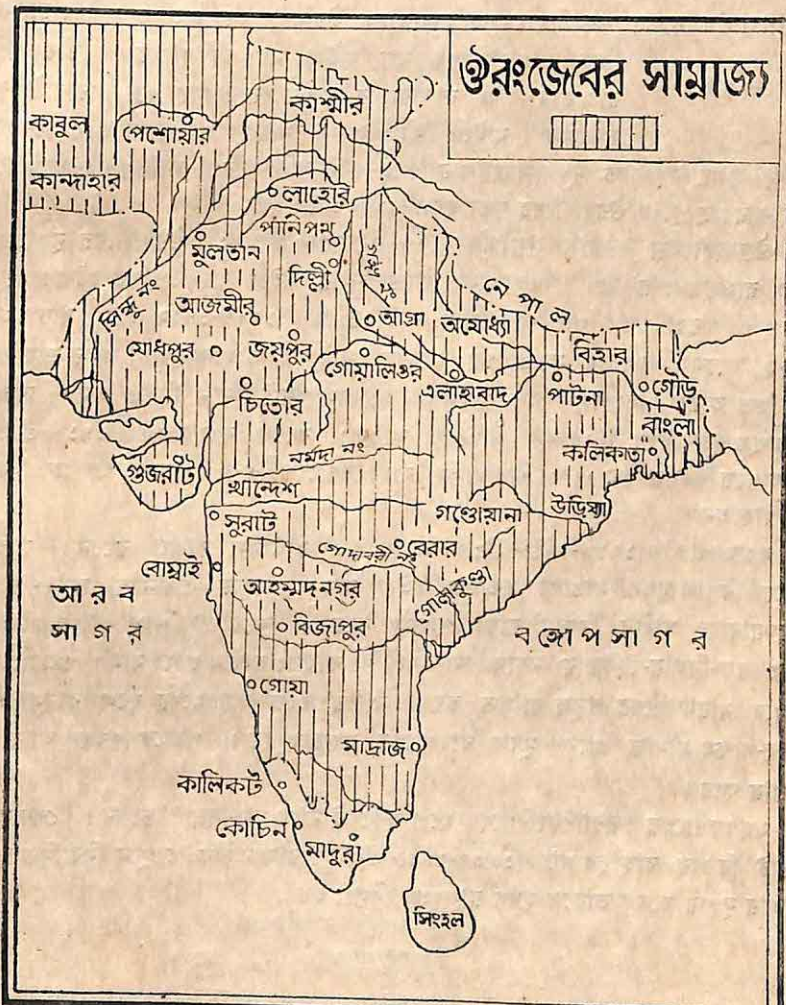
রাজ্যবিস্তার

ঔরঙ্গজীব অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্মীয় গোঁড়ামি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ করিল। তাঁহার নির্দেশে বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস হইল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র জিজিয়াকর পুনরায় প্রবর্তিত হইল। রাজস্ব এবং অর্থসংক্রান্ত দপ্তরে হিন্দুগণের চাকুরী নিষিদ্ধ হইল। রাজপুত ব্যতীত অপর জাতীয় হিন্দুর হস্তী ও অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রধারণের অধিকার রহিল না। হিন্দুদের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন করিয়া তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল না। ঔরঙ্গজীব কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না।

ঔরঙ্গজীবের গোঁড়ামী

এইরূপ অত্যাচারের ফলে উত্তর ভারতে জাঠ ও বুন্দেলা জাতি, সৎনামী সম্প্রদায়, শিখ সম্প্রদায় ও রাজপুত জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঔরঙ্গজীব চরম নিষ্ঠুরতার সাহায্যে জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামী বিদ্রোহ দমন করিলেও রাজপুত, মারাঠা ও শিখদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। মেবারের পরাক্রান্ত রাণা রাজসিংহ যোধপুরের রাঠোরগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মুঘল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঔরঙ্গজীব রাজপুতদিগের উপর হইতে

বিদ্রোহ



জিজিয়া কর প্রত্যাহার করিয়া অবশেষে রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধের সময় ঔরঙ্গজীবের পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঔরঙ্গজীবকে একটি পুত্র হারাইতে হইল।

দাক্ষিণাত্যে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ঘটিল। ঔরঙ্গজীব তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ছাব্বিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যে কাটাইলেন। কিন্তু বহু যুদ্ধ করিয়াও শিবাজীকে দমন করিতে পারিলেন না। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সম্ভাজীকে ঔরঙ্গজীব পরাজিত ও বন্দী করিলেন। কিন্তু তাহাতে যুদ্ধ বন্ধ হইল না। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম এবং রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তারাবাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। মারাঠাগণ প্রবল হইয়া বেরার, মালব, গুজরাট প্রভৃতি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দমন করিবার পূর্বেই ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হইল (১৭০৭ খ্রীঃ)।

ঔরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারীগণ (১৭০৭-১৭৫৮ খ্রীঃ) : ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর মুঘল রাজপুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহআলম বাহাদুরশাহ (১৭০৭-১৭১২ খ্রীঃ) পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহান্দারশাহ অপর ভ্রাতাদের পরাজিত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। অল্পকাল পরেই তিনি নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরুখসিয়র সিংহাসন অধিকার করেন। কয়েক বৎসর পরে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরুখসিয়র নিহত হন এবং শাহআলম বাহাদুরশাহের এক পৌত্র মহম্মদশাহ দিল্লীর বাদশাহ হন।

মহম্মদশাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীঃ) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদাত খাঁ এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁ কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যান। গুজরাটে ও মালবে মারাঠাগণের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। নাদিরশাহের আক্রমণের ফলে কাবুল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুঘল বাদশাহের হস্তচ্যুত হয়। পঞ্জাবে শিখগণ আধিপত্য বিস্তার করে।

মহম্মদশাহের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সকলেই নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৮ খ্রীঃ) ইংরাজ কর্তৃক রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই ভারতে মুঘল রাজবংশ বিলুপ্ত হয়।

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতার উপর মুসলমান প্রভাব

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর মুসলমান প্রভাবঃ ভারতবর্ষে আরব বিজয়ের দিন হইতেই মুসলমানদের ধর্মমত এদেশে প্রচারিত হয় এবং তুর্ক-আফগান রাজত্বের যুগে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রভাব গভীরে বিস্তৃত হয়। পৌত্তলিকতা বিরোধী মুসলমান সমাজ ও পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া রহিল। হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা এবং হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করা মুসলমানেরা অনেকেই ধর্মানুমোদিত এবং অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত। সুলতান মামুদ স্বহস্তে সোমনাথের বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ফিরোজতুঘলক বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খলজি হিন্দুগণের উপর জিজিয়া কর ধার্য করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের রাজ্যে হিন্দুদের পক্ষে অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে মুসলমানগণের প্রতি হিন্দুদের মনে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। একাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে আচার ব্যবহারের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া অলবিরুণী লিখিয়াছিলেন—'হিন্দুরা যাহা বিশ্বাস করে, মুসলমান সম্প্রদায় তাহা বিশ্বাস করে না। আবার মুসলমানেরা যাহা বিশ্বাস করে, হিন্দুরা তাহা মানে না। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আহার ব্যবহার বা কোনরূপ সামাজিক সম্বন্ধ একেবারেই নাই।' অলবিরুণীর পরে তিনশত বৎসর কাটিয়া গেলেও এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। বরং বিরূপ মনোভাব আরও তীব্র হইয়াছিল। ইবন বতুতা লিখিয়াছেন—"হিন্দুরা মুসলমানদের নিজগৃহে প্রবেশ করিতে দেয় না, নিজেদের ব্যবহার্য বাসনপত্রে কোন মুসলমানকে খাদ্য বা পানীয় দেয় না।"

হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক সমাজ

পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির অভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ শুধু মাত্র পৃথক হইয়া রহিল না, হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল হইয়া পড়ায় ভারতে ইসলামের প্রসার দ্রুত ও ব্যাপক হইতে পারিল। ইহার পূর্বে হিন্দুসমাজ অহিন্দুকে আপন সমাজে স্থান দিয়া হিন্দু করিয়া লইত। এইজন্যই শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই আত্মনিমজ্জন করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজ গ্রহণের নীতি ত্যাগ করিয়া বর্জনের রীতি অবলম্বন করিল। কোন মুসলমানের স্পৃষ্ট অন্নজল গ্রহণ করিলে হিন্দুর জাতি যাইত, হিন্দু সমাজে তাহার আর স্থান থাকিত না। জাতিচ্যুত

হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতায় ইসলামের প্রসার

হিন্দু বাধ্য হইয়া মুসলমান হইত। যে কোন হিন্দু মুসলমান হইতে পারিত, কিন্তু কোন মুসলমান হিন্দু হইতে পারিতনা। অপরপক্ষে মুসলমানগণ হিন্দু বা অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া মুসলমান সমাজে গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইত। মুসলমানগণ ইহাকে ধর্মসঙ্গত সৎকার্য বলিয়া বিবেচনা করিত। হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতার জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বহুপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে মুসলমান সমাজ পরিচালিত হইত। মুসলমান সমাজে যে কোন ব্যক্তিই নিজগুণে সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হইতে পারিত। ক্রীতদাসও গুণবান হইলে বাদশাহের কন্যাকে বিবাহ করিত, বাদশাহ হইত। তাহা ছাড়া মুসলমান রাজত্বে হিন্দুগণকে বহু পীড়ন ও অপমানের অধীন হইতে হইত। কিন্তু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলে এই সকল পীড়ন ও অপমান হইতে অব্যাহতি মিলিত। উপরন্তু রাজদরবারে চাকুরী সুলভ হইত বলিয়া বৈষয়িক সমৃদ্ধিলাভ সহজ হইত। এই সকল কারণে বহু হিন্দু স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় মুসলমান হইয়া মুসলমান সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ইসলামের প্রসার

ধর্মান্তরিত অমুসলমানগণ মুসলমানসমাজে প্রবিষ্ট হইবার ফলে মুসলমানসমাজেও কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজেও কিছু সামাজিক বৈষম্য দেখা দিল। সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানগণ, বিশেষতঃ তুর্কী, আফগান, সৈয়দ ও শেখগণ সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান হইতে নিজেদের পৃথক রাখিতে চেষ্টিত হন এবং তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক হন।

মুসলিম সমাজে পরিবর্তন

ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-বিচারে প্রভেদ থাকিলেও দুইটি সমাজ যদি পরস্পরের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করে, তবে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াজাত বিদ্বেষ কালক্রমে হ্রাস পায় এবং প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি ও মিলনের ধারা প্রস্তুত হয়। ভারতেও তাহাই হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হইলেও সে তাহার পূর্বপুরুষের আচার, ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদি একেবারে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে না। কিছু রেশ থাকিয়াই যায়। ভারতীয় মুসলিম সমাজের এক বৃহৎ অংশ হিন্দুর বংশধর হওয়ায়, তাহাদের আচরণে কিছু পুরাতন প্রভাব থাকিয়া যায়। এইজন্যই মুঘল সম্রাট বাবর ভারতের মুসলমানগণের সহিত ভারতের বাহিরের মুসলমানগণের আচার ব্যবহারে সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রভাবেই মুসলমান পুরুষদের মধ্যে আঙটি, হার এবং কর্ণভূষণ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। মুসলমানেরাও রাজপুতগণের অনুকরণে মস্তকে চীর ও পাগ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। ইবন বতুতা মুসলিমদের বিবাহের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মুসলমানগণ অনেক হিন্দু প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল।

অভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে পানতাম্বূল, খাদ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত মসলা ও লঙ্কা

মরিচের ব্যবহার খুবই কম। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ এই সবে বিশেষ আসক্ত। ইহা হিন্দু প্রভাবের ফল। হিন্দু সমাজে মুসলমানী বেশভূষা ও খাদ্যাভ্যাস প্রচলিত হয়। মুসলিম রাজদরবারের অনেক আদব-কায়দা হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়। হিন্দুস্তানী রমণীগণের মধ্যেও পর্দা প্রথার প্রচলন হয়।

আর্থিক অবস্থা ঃ ঐশ্বর্যের জন্য দেশবিদেশে ভারতবর্ষের খ্যাতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত ছিল। এই খ্যাতি সুলতান মামুদ, তৈমুরলঙ এবং নাদির শাহের ন্যায় লুণ্ঠনকারিগণকে ভারতবর্ষে অভিযান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলে যুগযুগ সঞ্চিত ধনরত্ন ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। তথাপি ভারত ঐশ্বর্যহীন হয় নাই। ইহার কারণ ছিল উর্বর ভূমিতে অপর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকের পৃথিবী পরিক্রমা। উত্তর-পশ্চিমে কান্দাহারের পথে এবং উত্তর-পূর্বে তিব্বত ও নেপালের পথে বাণিজ্য চলাচল করিত। বাণিজ্য তরণী এ দেশেই নির্মিত হইত। পশ্চিমে পারস্যোসাগর ও আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের পথে পণ্য বিনিময় হইত। আগ্রা ও দিল্লীর সহিত লাহোর, কান্দাহার, সুরাট বরোচ (প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ), জৌনপুর, পাটনা এবং বাঙলা দেশের সপ্তগ্রাম রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। মুঘল রাজত্বকালে স্বয়ং বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ, এমন কি রাজপরিবারের মহিলাগণও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। আকবরের মাতা হামিদাবানু বেগম এবং জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের বাণিজ্যসম্ভার স্থল ও জল পথে বাহিত হইত। ইহার ফলে সমাজের ক্ষমতাবান অভিজাত শ্রেণী রীতিমত ধনী ছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী-জীবন যাপন করিতেন।

বাণিজ্য সমৃদ্ধি

দেশে কৃষি সম্পদের প্রাচুর্য ছিল অপরিসীম। তাভার্নিয়ে জানাইয়াছেন যে, ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও ময়দা, চিনি এবং মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। বাঙলা দেশের বিবরণে মানুচি লিখিয়াছেন—'ফলমূল, শস্য, মসলিন, স্বর্ণ ও রেশমের বস্ত্র—এখানে সকল কিছুরই প্রাচুর্য র'হয়াছে''। ইবন বতুতা দেখিয়াছিলেন—বাঙলা দেশে টাকায় আট মণ ধান পাওয়া যায়। শায়েস্তা খার আমলেও ঢাকায় চাউলের মূল্য ছিল টাকায় আট মণ। আলাউদ্দীন খলজীর আমলে দিল্লীতে এক সের গমের দাম ছিল এক পয়সা।

কৃষি সম্পদ

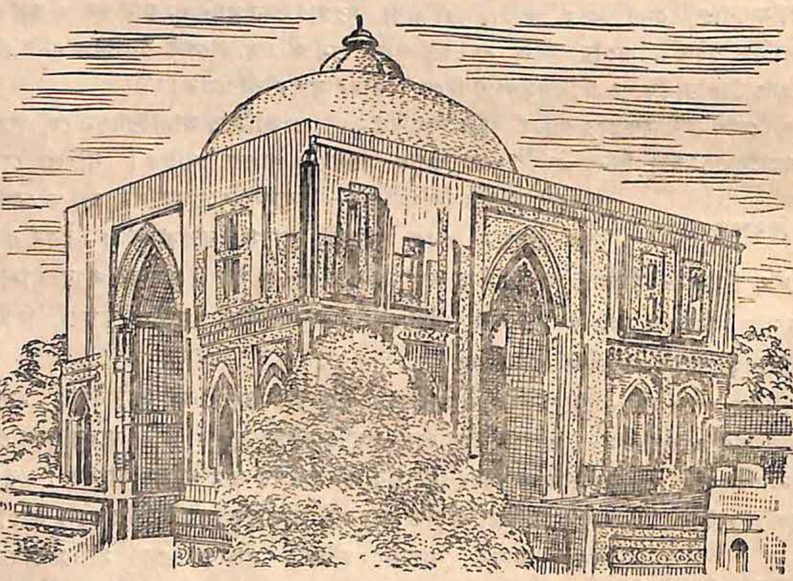
এত সম্পদ সত্ত্বেও দেশে কৃষক ও শ্রমিকেরা দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাইত। মজুরীর হার ছিল অত্যন্ত কম। তাহার উপর দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। নানা যুদ্ধের ফলে দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় চাষ করিবার লোকের অভাবে বহু জমি পতিত থাকিত। করভার ছিল অত্যধিক। হিন্দুগণকে জিজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত কর দিতে হওয়ায় তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইত। সাধারণ প্রজা মাটির দেওয়াল ঘেরা, তালগাছ, বাঁশ নির্মিত, খেজুরপাতা, খড় ইত্যাদির ছাউনি দেওয়া ঘরে বাস করিত। অধিকাংশের পরিধানে নিম্নাঙ্গে একটি বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অন্য কোন পরিচ্ছদ থাকিত না। দেশে মধ্যে মধ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তখন বহুলোক

জনসাধারণের দুরবস্থা

অনাহারে মারা যাইত। এই লোকক্ষয় নিবারণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাজকর্মচারিগণের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে কারিগর এবং কৃষকগণের দুর্দশার অন্ত থাকিত না। জায়গীরদার ও মহাজন অবাধে প্রজাশোষণ করিত। শাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঔরঙ্গজাবের রাজত্বকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণ লোকের দুঃখদুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল।

শিল্প ঃ হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পরকে প্রভাবিত করিবার ফলে ক্রমে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। ইহার ফলে মুসলমান রাজত্বের কালে ভারতীয়-সারাসেনীয় মিশ্র শিল্পরীতির জন্ম হয়। মুসলিম শাসকগণ ভারতে আসিবার সময় স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী অবশ্যই সঙ্গে লইয়া আসিতেন না। তাঁহারা এ দেশের শিল্পীকেই নিযুক্ত করিতেন। অনেকক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের অংশবিশেষ প্রাসাদ বা মসজিদ গঠনের জন্য ব্যবহৃত হইত। কখনও বা হিন্দু মন্দিরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইত। দিল্লীর কুতুব মসজিদ, আজমীড়ের "আড়াই দিনকা ঝোপড়া" এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। মুসলিম শাসকগণ সারাসেনীয় রীতিতে প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করাইতে চাহিতেন। কিন্তু হিন্দু মন্দিরের উপকরণ ব্যবহার এবং হিন্দুশিল্পী নিয়োগের ফলে সুলতানী যুগের স্থাপত্যে মিশ্ররীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয়-সারাসেনীয় মিশ্র শিল্পরীতি

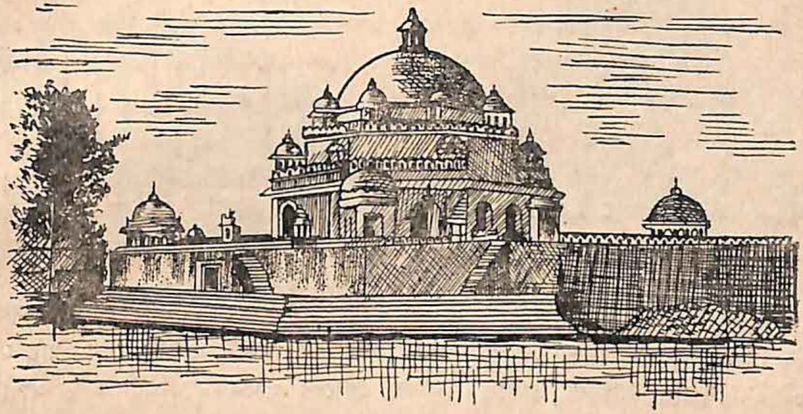


আলাই দরওয়াজা

মুসলিম শাসকগণ প্রত্যেকেই নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র নগর, প্রাসাদ অথবা মহল

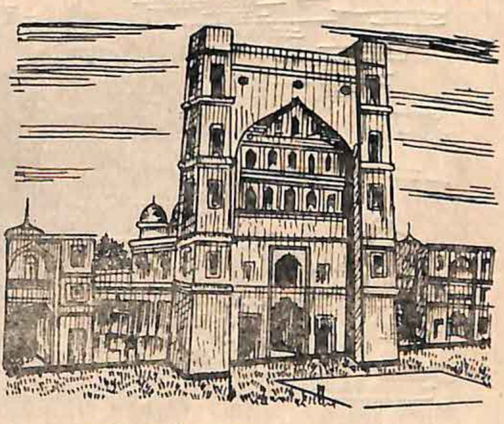
নির্মাণ করিতেন। এইভাবে রাজধানী দিল্লীর নিকট শিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরুজাবাদ প্রভৃতি শহর এবং উত্তর-ভারতে জৌনপুর, গুজরাটে আহম্মদাবাদ এবং বাঙলা দেশে পাণ্ডুয়া নগরী তুর্ক-আফগান যুগে নির্মিত হইয়াছিল। সিকান্দর লোদী আগ্রা শহরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই যুগের স্থাপত্যে দিল্লী, জৌনপুর, গুজরাট, বাঙলা প্রভৃতি কয়েকটি

স্থাপত্যে আঞ্চলিক রীতি



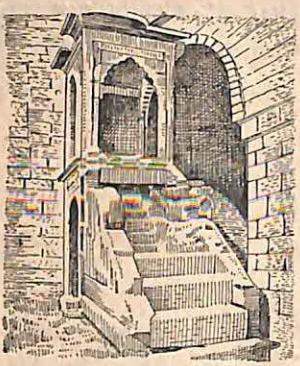
হুসঙ্গ শাহের সমাধি

আঞ্চলিক শিল্পরীতি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। গম্বুজ, খিলান এবং পাথরের জালি নির্মাণ মুসলিম স্থাপত্যের এক বিশেষত্ব। দিল্লীর স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব সমধিক। সুলতান আলাউদ্দীন নির্মিত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগা দিল্লী-শিল্পরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কুতুব মসজিদের আলাই দরওয়াজায় যে খিলান নির্মিত হয়, তাহা পরবর্তীকালের মুসলিম শিল্পরীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। গুজরাটি রীতিতে ভারতীয় প্রভাব সমধিক। গুজরাটের শিল্পিগণ কাঠ ও পাথরে খোদাই করিয়া অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন। এখানে বিধ্বস্ত জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নূতন গৃহ নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আহম্মদাবাদের জাম-ই-মসজিদ, মাণ্ডুর 'হিন্দোলা মহল' নামক দরবার-কক্ষ গুজরাটি শিল্পরীতির বিশিষ্ট নিদর্শন।

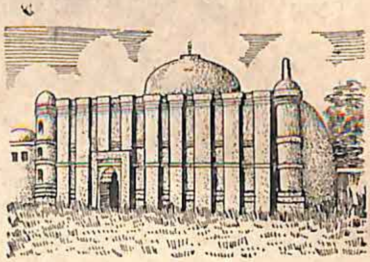


অটলাদেবী মসজিদ—জৌনপুর

জৌনপুরী স্থাপত্য রীতিতেও হিন্দু-প্রভাব সুস্পষ্ট। জৌনপুরের অনেক মসজিদই হিন্দু মন্দিরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া নির্মিত হইয়াছিল। অটলাদেবী বা অতাল মসজিদ

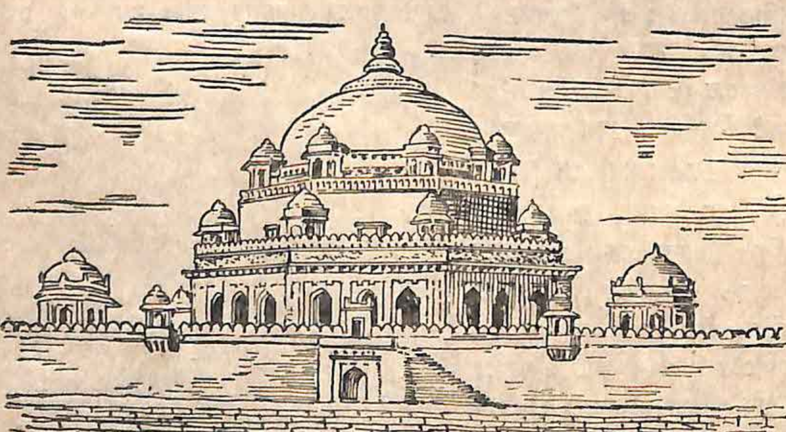


আদিনা মসজিদ



একলাখী মসজিদ

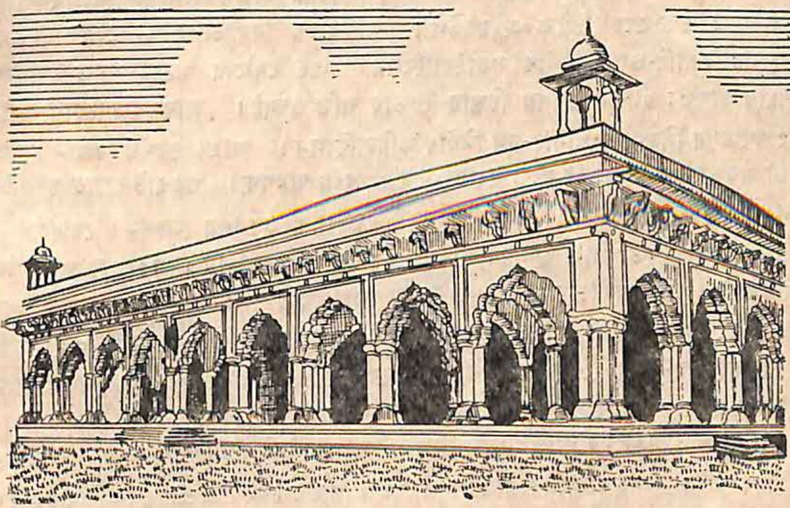
জৌনপুরী রীতির বিশেষ পরিচয় দান করে। তুঘলুক বংশের রাজত্বকালে যে সকল ইমারত নির্মিত হয় সেগুলিতে ভারতীয় শিল্পরীতির কোন প্রভাব দেখা যায় না। এই ইমারতগুলি আকারে প্রকাণ্ড। কিন্তু ইহাদের গঠনে কারুকার্য অতি সাধারণ শ্রেণীর। দিল্লীতে গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের সমাধি ইহার নিদর্শন। এই মসজিদের গম্বুজটি নূতন ধরনের।



শের শাহের সমাধি (সাসারাম)

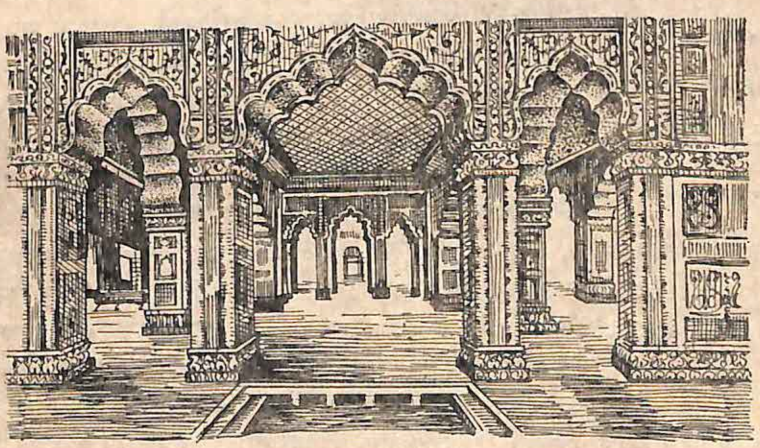
বাঙলা দেশের স্থপতিগণ প্রস্তরের অভাবে পোড়া ইটের দ্বারা গৃহাদি নির্মাণ করিত। হিন্দু-প্রভাবের ফলে বাঙলার স্থাপত্যে পদ্ম এবং অন্যান্য হিন্দু-বৈশিষ্ট্যসূচক

নকৃশার প্রচলন দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, একলাখী মসজিদ ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, কদমরসুল প্রভৃতিতে বাঙলার বিশিষ্ট রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।



দেওয়ান-ই-আম

তুর্ক-আফগান যুগে নির্মিত সমাধি-মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতি পরবর্তীকালে মুঘল-যুগের স্থাপত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেরশাহ বিহারের সাসারাম



দেওয়ান-ই-খাস

নামক স্থানে এক বিস্তৃত সরোবরের মধ্যে একটি সুউচ্চ চতুষ্কোণ নির্মাণ করিয়া তাহার

উপর যে সমাধি-সৌধ গঠন করেন তাহা এই বিশিষ্ট শিল্প-রীতির অপরূপ নিদর্শন। সুলতানী যুগে হিন্দু ও পারসিক রীতির যে সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল মুঘল যুগে তাহা পরিণতি লাভ করে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু-পারসিক শিল্প-রীতি অতি উচ্চ-স্তরে উন্নীত হইয়াছিল। আকবরের বিমাতা হাজী বেগম দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-ভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সৌধের গঠনে পারস্য এবং মধ্য-এশিয়ার স্থাপত্য রীতির ও শিল্প চিন্তার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। আকবর লাহোর, আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রীতে প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আগ্রা দুর্গের প্রধান তোরণ 'দিল্লী দরওয়াজা' ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার দ্বারপথ। গুজরাট জয়ের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে নির্মিত ফতেপুরসিক্রির 'বুলন্দ দরওয়াজা' এক বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শন। যোধবাই-এর প্রাসাদে হিন্দু-স্থাপত্য রীতি সুস্পষ্ট। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধে বৌদ্ধবিহারের গঠনরীতি লক্ষ্য করা যায়। আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইতিমাদউদ্দৌলার সমাধি এই যুগের স্থাপত্যশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন। এই সমাধি-সৌধটি আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলের বালু-প্রস্তরে গঠিত সৌধসমূহ এবং শাহজাহানের আমলে নির্মিত মর্মরপ্রস্তরের সৌধাবলীর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে গণ্য হয়।

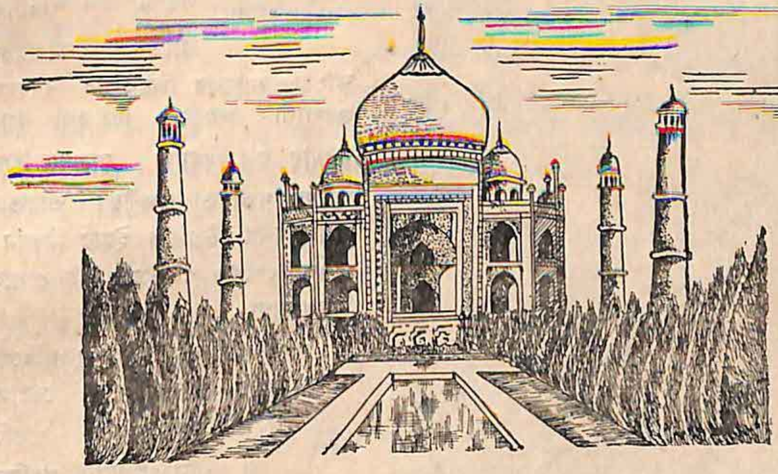
সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মুসলিম স্থাপত্যরীতির সহিত ইতালীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটে। শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল শিল্পের চরম উন্নতির যুগ। শাহজাহান অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় এবং শিল্পানুরাগী সম্রাট ছিলেন; তাঁহার নির্মিত প্রায় সমুদয় সৌধই মর্মরে গঠিত। আকবর-নির্মিত আগ্রা-দুর্গের অনেক অংশ শাহজাহান পুনঃনির্মাণ করাইয়াছিলেন। আগ্রা-দুর্গের অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, শীষমহল, মোতি মসজিদ এখনও শাহজাহানের কীর্তি ঘোষণা করে। দিল্লীতে যমুনার তীরে শাহজাহান যে প্রাসাদ-দুর্গ লালকেল্লা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই-খাস-এর একস্থানে তিনি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, "মর্ত্যে যদি স্বর্গ থাকে—তবে তাহা এইখানে।" এই কথাকয়টি নিতান্ত অসার গর্বোক্তি নহে। একুশ বৎসর সময় এবং পঞ্চাশলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মর্মর প্রস্তরে নির্মিত তাজমহল শুধুমাত্র শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি নহে, ইহা বিশ্বের বিস্ময়। সমসাময়িক লেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাজমহল নির্মাণের জন্য সমরকন্দ, বোখারা, বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি দূর দেশীয় শিল্পিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। তাজমহলের গঠনকার্যের ভার মুসলমান শিল্পীদের এবং কারুকার্যের ভার হিন্দু শিল্পীদের দেওয়া হইয়াছিল। এইজন্যই তাজমহলে হিন্দু-পারসিক রীতির অপরূপ সম্মিলন দেখা যায়। সিরাজের অধিবাসী উস্তাদ ঈশা তাজমহলের প্রধান স্থপতি ছিলেন। শাহজাহান নিমিত ময়ূর-সিংহাসন শিল্পসৃষ্টির এক অপূর্ব নিদর্শন। শিল্পী বেবাদল খাঁ বহু কারিগরের সহায়তায় সাত বৎসর পরিশ্রমে এই সিংহাসনটি নির্মাণ করেন। ইহার স্বর্ণনির্মিত চারিপায়াযুক্ত আসনের উপর বারোটি মণি-মাণিক্য খচিত স্তম্ভে ধৃত একটি চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভের

লালকেল্লা

তাজমহল

ময়ূর-সিংহাসন

চূড়ায় রত্নখচিত দুইটি ময়ূর মুখোমুখি বসানো ছিল। প্রত্যেক জোড়া ময়ূরের মধ্যখানে ছিল একটি করিয়া মণি-মাণিক্যখচিত বৃক্ষ, ময়ূর দুইটি উহার ফল ঠুকরাইয়া খাইতেছে। এই অপূর্ব সিংহাসনটি নাদির শাহ্‌ দিল্লী হইতে লুণ্ঠন করিয়া পারস্যে লাইয়া যান।



তাজমহল

মুঘলযুগে চিত্রকলারও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও পারসিক ও হিন্দুরীতির সংমিশ্রণে এক নূতন চিত্রাঙ্কণরীতির উদ্ভব হইয়াছিল। সৌধগুলির প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। ফতেপুরসিক্রীতে আকবরের প্রধান শিল্পী ছিলেন পারস্যদেশীয় আবদুল সামাদ এবং ভারতীয় বসাওন ও দাসোয়ানাথ। আকবরের রাজসভায় একশত জন চিত্রকরের মধ্যে সতেরোজন সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। এই যুগের শিল্পিগণ কাগজের উ র অঙ্কিত ক্ষুদ্রচিত্র এবং প্রাচীরচিত্র অঙ্কণে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। মুঘল চিত্রের মধ্যে রাজদরবার ও শিকারের দৃশ্যগুলি অতি প্রসিদ্ধ। সূক্ষ্ম রেখা, বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ, অঙ্কিত প্রতিকৃতির দেহসৌষ্ঠব এবং মণ্ডন পারিপাট্য মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। সুন্দর হস্তাক্ষরকে চিত্ররূপে গণ্য করা হইত। পুস্তকের মলাটে হস্তাক্ষরের বিচিত্র আলিপনা এবং পুস্তকের মধ্যে বর্ণিত ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া লিপিশিল্পকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছিল। বাবর এক বিশেষ ধরনের লিপিকলার প্রবর্তন করেন। ইহাকে বলা হয় বাবরখত। সম্রাট জাহাঙ্গীর চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং চিত্রাঙ্কন করিতেন। হিন্দু চিত্রকর মনোহর, হিরাতের আফগান চিত্রকর আবুলহাসান এবং উস্তাদ মনসুর জাহাঙ্গীরের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান—ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন কি আমীর ওমরাহগণের নিজস্ব চিত্রশালা ছিল।

চিত্রশিল্প

রাজপুত রাজাদের আনুকূল্যে এদেশে চিত্রশিল্পের এক বিশেষ রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। রাজপুত চিত্রের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের জীবন এবং হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইলেও অঙ্কন পদ্ধতি ছিল পারসিক রীতির। কাশ্মীরের কাংড়া অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা। জয়পুরের চিত্রকলা মণ্ডন সুষমার জন্য বিখ্যাত। রাজপুত চিত্রে ভাবের গভীরতা লক্ষণীয়। ভারতীয় রাগরাগিণীর চিত্রগুলি ইহার নিদর্শন। বাঙলা দেশের পটচিত্রও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত ও কাংড়া চিত্রকলা



রাজপুত চিত্র

সঙ্গীতকলাও মুসলমান যুগে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খেয়াল, ঠুমরী, গজল প্রভৃতি গান এই যুগেই প্রচলিত হয়। কবি আমীর-খসরু বহু বিদেশী ও পারসিক সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাইয়া ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ভারতীয় প্রাচীন দেশী সঙ্গীতকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ্ গানের প্রসার বৃদ্ধি করেন। এদেশে সেতার এবং তবলা নামক বাদ্যযন্ত্র দুইটির প্রবর্তনও তাঁহার নামের সহিত জড়িত। আবুল-ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর ধ্রুপদ গানকে জনপ্রিয়তা দান করেন। কালঞ্জরের রাজা কীর্তি সিংহের দরবারে এবং গুজরাটের সুলতান বাজবাহাদুরের দরবারে উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা হইত। মুঘলযুগে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান কলাকারগণ এই সময় রাগরাগিণীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বৈভব বৃদ্ধি করেন। বাদশাহ আকবরের দরবারের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন ব্যতীত, এই যুগে বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, হরিদাস স্বামী প্রভৃতি গায়কগণ ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল রাজত্বের শেষভাগে রাজপুতানার উদয়পুরে ধ্রুপদ গায়কগণের, জয়পুরে সেতার বাদকগণের, রামপুরের নবাবের দরবারে বীণাবাদকগণের সমাবেশ হয়। আজও ভারতের বহু খ্যাতিসম্পন্ন গায়ক ও বাদকগণের মধ্যে মুসলমান শিল্পীর সংখ্যা প্রচুর।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ সুলতানী আমলে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল উন্নতি ও প্রসার ঘটে। উত্তর ভারতে কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণগণ টোল ও চতুষ্পাঠিতে সংস্কৃত চর্চা করিতেন। ধর্ম, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, মাধবাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব" উত্তর-ভারতেও বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাধবাচার্য দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজের জন্য নিয়মাবলী রচনা করেন। সংস্কৃত কাব্য নাটক ও অলঙ্কার শাস্ত্র রচনায় জয়দেব গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দান করেন।

সংস্কৃত সাহিত্য

দাসগোষ্ঠীর সুলতানগণ কেহই মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা আরবীকে তাঁহাদের রাজ্যে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ফারসী ভাষাকে মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ফারসী সাহিত্যের অনুপম সম্পদ ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হিন্দুগণও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কথ্যভাষা হিসাবে 'উর্দু'র জন্ম হয়। তুর্কী ভাষায় 'উর্দু" শব্দের অর্থ 'শিবির'। শিবিরবাসী মুসলিম সৈন্যগণ হিন্দুদের সহিত কথোপকথনের জন্য এই ভাষা প্রচলিত করে। উর্দুভাষার শব্দ ভাণ্ডার ফারসী ও হিন্দীর সমন্বয়ে গঠিত। এই নূতন ভাষা বিজয়ী ও বিজিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পথ প্রস্তুত করিল। কবি আমীর খসরু উর্দু ভাষায় কবিতা ও গান রচনা করিয়া ইহাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিলেন।

উর্দু ভাষার উদ্ভব

সুলতানী আমলে প্রাদেশিক ভাষাগুলি উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘুরী, বলবন, মুহম্মদ তুঘলুক প্রভৃতি শাসকগণ তাঁহাদের মুদ্রায় আরবী অক্ষরের সহিত দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করেন। সিকান্দর লোদীর সময় হিন্দী ভাষায় সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইত। বিজাপুরে আদিলশাহের দরবারে দলিলপত্রসমূহ মারাঠিভাষায় লিখিত হইত। এইরূপে রাজানুকূল্যে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি মর্যাদাভূষিত হইয়া উঠিল।

সুলতানী আমলের শেষভাগে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্য উন্নত হইয়া উঠে। রামানন্দ ও কবীরের প্রচারে হিন্দীভাষা, চৈতন্যদেবের প্রচারে বাঙলাভাষা, নানকের প্রচারে পঞ্জাবের গুরুমুখীভাষা, নামদেবের প্রচারে এবং তুকারাম ও রামদাসের রচনায় মারাঠিভাষা এবং মীরাবাঈ এর ভক্তিমূলক সঙ্গীতে ব্রজভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মুঘলযুগে গুরুমুখী বর্ণমালা প্রবর্তিত হয় এবং শিখগণের গ্রন্থসাহেব ও গুরুগোবিন্দ সিংহের গ্রন্থসমূহ রচিত হয়। এই যুগে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি হয়। বাঙলা ও বিহারে মুসলমান সুলতানগণের রাজত্বকালে বাংলা ও মৈথিলীভাষা বিশেষ

প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্য

সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, বাংলার কবি চণ্ডীদাস অনুপম বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নাম দিয়া সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিবার জন্য কবি মালাধর বসু, সুলতান বারবক শাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিলাভ করেন। সুলতান নসরৎ শাহ এবং তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ সংস্কৃত মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন! কৃত্তিবাসের সুবিখ্যাত 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', বাংলাভাষার মঙ্গল কাব্যগুলি, চৈতন্যজীবনী বিষয়ক গ্রন্থসমূহ এবং পাঁচালী সাহিত্য বাঙলা দেশে মুসলমান রাজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মুঘল যুগে লিখিত হয়। কবি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের বৈষ্ণবপদাবলী, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' ও শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' মুসলমান যুগের সৃষ্টি। শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত 'গোরক্ষবিজয়' এবং সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবৎ' কাব্য মুসলমান লেখক রচিত বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। সৈয়দ মর্তুজা, সেখ মদন, হাসান মীর্জা প্রভৃতি প্রায় চল্লিশজন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্য

ইতিহাস রচনার প্রবর্তন ভারতে মুসলিম সভ্যতার এক বিশেষ দান। হিন্দুর বিশেষ গৌরব সংস্কৃত সাহিত্যে খাঁটি ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব আছে। ভারতীয় সাহিত্যের এই অভাবটি মুসলমানযুগেই পূরণ হয়। সুলতান নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে মীনহাজউদ্দীন 'তবাকৎ-ই-নাসিরী' নামে এক সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতের বাহিরে অবস্থিত বহু মুসলমান রাজ্যের বিবরণী আছে এবং সুলতান নাসিরুদ্দীনের শাসনকাল পর্যন্ত ভারতের মুসলমান শাসনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মীনহাজ যে কাল পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কালের ইতিহাস রচনা করেন জিয়াউদ্দীন বারানী। খিলজী এবং তুঘলুক বংশের ইতিহাস বারানীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। কবি আমীর খসরু রচিত 'তারিখ-ই-আলাই' গ্রন্থে আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বের প্রথমভাগের বিবরণ আছে।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

মুঘল যুগে ফেরিশ্‌তা, আবুল ফজল, বদাউনি এবং খাফি খাঁ এই চারজন ঐতিহাসিক সুবিখ্যাত। ফেরিশ্‌তা তাঁহার গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতের মুসলমান রাজত্বের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। আবুল ফজলের 'আকবর নামা' এবং 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে মুঘলসম্রাট আকবরের রাজত্বের বিশদ বিবরণ আছে। কেবলমাত্র মুসলমানগণ নহেন, হিন্দু লেখকেরাও এই যুগে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ভীমসেন এবং ঈশ্বরদাস নাগর সমসাময়িককালের ইতিহাস ফারসী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ, বাবর ও জাহাঙ্গীর তাঁহাদের আত্মচরিতে ভারতের ইতিহাসের বহু তথ্য উপহার দিয়াছেন।

মুসলমান যুগে ভারতে ফারসীভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। বহু মৌলিক এবং অনুবাদগ্রন্থ এই যুগে রচিত হইয়াছিল। সিকান্দর লোদী বহু সংস্কৃতগ্রন্থ ফারসী

ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন মহাভারত এবং রাজতরঙ্গিণী ফারসীভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের আদেশে মহাভারতের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ 'রজম-নামা' সঙ্কলিত হইয়াছিল। গণিতবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লীলাবতী', অথর্ববেদ, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থসমূহের অনুবাদও ফারসীভাষায় করা হইয়াছিল। বদাউনী সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো সংস্কৃত উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ফারসীতে অনুবাদ করেন। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান প্রভৃতি সংস্কৃত কথাসাহিত্যও ফারসীতে অনূদিত হয়। মুঘল রাজপরিবারের নারীপুরুষ সকলেই কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় উৎসাহী ছিলেন। বাবর ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার কন্যা গুলবদন বেগম ফারসীভাষায় হুমায়ুনের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করেন। জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা এবং ঔরঙ্গজীবের কন্যা জেবউন্নিসা ফারসী ভাষায় সুললিত কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

ফারসী সাহিত্য

মুঘলযুগে হিন্দীসাহিত্য চরম উন্নতিলাভ করে। মেবারের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বনে মালিক মুহম্মদ জায়সী বিখ্যাত 'পদুমাবৎ' কাব্য রচনা করেন। বাঙলা দেশের মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল এই কাব্যটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া ছলেন। হিন্দী সাহিত্যের অতুল সম্পদ তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' এবং আগ্রার অন্ধ কবি ভক্ত সুরদাসের ভজন ও দোঁহা এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক মুসলমান হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। খান-ই-খানান আবদুর রহিম, দরিয়াশাহ এবং ইয়ারশাহ হিন্দী ভাষায় সুললিত কবিতা রচনা করেন। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং দারাশিকো হিন্দী পদ রচনা করিতেন। মানসিংহ, বীরবল, তোডরমল, ভগবান দাস প্রভৃতি আকবরের সভাসদগণও হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দী সাহিত্য



তুলসীদাস

ধর্ম : মুসলমানযুগের প্রারম্ভে ইসলামের প্রবল সংঘাতে হিন্দুসমাজও ধর্ম বিচলিত হইয়া উঠে। বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল হইয়া পড়ে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে। ক্রমে সর্ব ভারতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখা দেয়। গুপ্তযুগ হইতে হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ পৌত্তলিক হইয়া উঠিলেও প্রাচীন হিন্দু ধর্মে একেশ্বরবাদের

ধারণা ছিল। ইসলামের সংঘাতে এই ধারণা পুনরায় পরিস্ফুট হইল এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইল। ইতিপূর্বেই হিন্দু সমাজে ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এখন ভক্তিমূলক মুসলমান স্থফী-মতবাদের প্রভাবে তাহা পুষ্ট হইয়া উঠিল। আউল, বাউল, পীর ও মুরশেদ সম্প্রদায় ধর্মসমন্বয়ের নূতন আদর্শ লইয়া আবির্ভূত হইল। হিন্দু ও মুসলমান সাধু-সন্ত, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারকগণের উপদেশে ধর্মবিরোধ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইল। সাধু, সন্ন্যাসী, পীর ও ফকিরগণ হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। ধর্মবিষয়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। বাঙলা দেশে ধর্মসমন্বয় বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল। তাহার ফলে "হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর। দুই কূলে লয় পূজা হইয়া জাহির॥" হিন্দুর সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানের সত্যপীর একই দেবতা হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের পূজ্য হইলেন। মুসলমান স্থফী সাধকগণ হিন্দু যোগীদের মতই ধ্যান, প্রাণায়ামে ও নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হন এবং হিন্দু সাধকগণের মতই সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনারীতি গ্রহণ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে যাহা কিছু মহান তাহার ভিত্তিতে এবং একেশ্বরের আদর্শে শিখধর্ম উদ্ভূত হইল। পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে বহু ধর্মপ্রচারক ও ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব হইল। বৃহৎ জনসমাজের মধ্যে অবশ্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মূল আচার আচরণ রহিয়া গেল।

একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের প্রসার

ধর্ম সংস্কারক ও ধর্মাচার্য

নিজামউদ্দীন আউলিয়া—আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ পীর নিজামউদ্দীন আউলিয়া হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। হিন্দু ধর্মের ভক্তিবাদের ন্যায় তাঁহার স্থফী মতবাদ সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করে। 'ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসিলে ঈশ্বরকেই ভালবাসা হয়' ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান অভিমত। দিল্লীতে এই বিখ্যাত পীরের দরগায় আজও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তগণ সমবেত হন। নিজামউদ্দীন ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের বদাউন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

রামানন্দ ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারক রামানন্দ আবির্ভূত হন। রামচন্দ্রের ভক্ত রামানুজ স্বয়ং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। সহজ সরল হিন্দী ভাষায় তিনি ঈশ্বরভক্তি প্রচার করিতেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই তিনি শিষ্য করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ভক্ত কবীর এবং রুইদাস প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

কবীর ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভক্তপ্রবর কবীর আবির্ভূত হন। অনেকের মতে, তিনি মুসলমান জোলার (তাঁতী) সন্তান

ছিলেন। তাঁহার বৃত্তি ছিল বস্ত্র বয়ন। কবীর হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিতেন এবং রামনাম গান করিতেন। অতি সহজ কথায় এবং কবিতায় তিনি দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি রাম ও রহিম, কৃষ্ণ ও করিমকে অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। কবীরের ভজন ও দোঁহা হিন্দী সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছিল।

মীরাবাঈ : রাজপুতনার মেবার রাজপরিবারের বধূ মীরাবাঈ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতেন। গানের মাধ্যমে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতার আরাধনা করিতেন। তাঁহার সুমধুর ভজনগুলি ব্রজভাষার সহিত রাজস্থানী ভাষার সংমিশ্রণে রচিত। কর্ণেল টডের মতে মীরাবাঈ ছিলেন রাণা রতন সিংহের কন্যা এবং ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সম্ভবতঃ ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে মীরাবাঈ এর জন্ম হইয়াছিল। অপর মতে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণা সঙ্গের পুত্র ভোজরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। রাজ-প্রাসাদের বিলাসব্যসন ত্যাগ করিয়া ভক্ত সাধিকা মীরাবাঈ মথুরা ও বৃন্দাবনে সাধুসঙ্গে জীবন যাপন করিতেন।

নামদেব : সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নামদেব মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। অনেকের মতে তিনি বৃত্তিতে ছিলেন দরজী। নামদেব মূর্তিপূজা ও বাহ্যাড়ম্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহার মতে ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং সর্বজীবে প্রেম হইল মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নামদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

নানক : ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে ক্ষেত্রী-বংশে এক ব্যবসায়ীর গৃহে নানক জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি উদাসীর বেশে ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে যে ইসলাম ধর্মের মর্মসত্য অনুসন্ধানের জন্য তিনি মক্কা ও বাগদাদ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলিম ধর্ম সমন্বয় নানকের জীবনে সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার তিনটি প্রধান উপদেশ হইল—নাম অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণকীর্তন; দান অর্থাৎ জীবসেবা এবং স্নান অর্থাৎ দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। নানক বলিতেন



গুরু নানক

"মস্তকমুণ্ডন করিলে, দেহে ভস্মলেপন করিলে কিম্বা শঙ্খধ্বনি করিলেই ধর্মসাধন হয় না। দেহ ও মন পবিত্র রাখিতে পারিলে তবেই প্রকৃত ধর্মসাধন সম্ভব হয়।' নানক সন্ন্যাস গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। নানকের শিষ্যগণ 'শিখ' নামে পরিচিত হয়। তাঁহার উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়া 'গ্রন্থসাহেব' (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) নামে আখ্যাত হয়। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গুরু নানক দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ঃ বাঙলাদেশে গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেন শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার পুরীধামে তিনি তিরোহিত হন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিলেই জীবের পক্ষে ঈশ্বরলাভ সম্ভব হয় ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। যবন, হরিদাস প্রভৃতি মুসলমানও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বাঙলাদেশের সমাজ ও ধর্মজীবনের উপর ব্যাপক হইয়াছিল।



চৈতন্যদেব

এই সকল ধর্মসংস্কার ও ধর্ম-প্রচারকগণের প্রভাবে জনসাধারণের মনোভাব অনেক পরিমাণে ধর্মসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। সুফী সাধকগণের ন্যায় কালন্দর নামে এক শ্রেণীর পরিব্রাজক ফকির সম্প্রদায় মুসলমান সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ইহারা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি আদ্যন্ত না মানিলেও নিষ্ঠাবান মুসলমানগণও ইহাদের ভক্তি করিতেন। এই মুসলমান ফকির সম্প্রদায়ের উপর হিন্দু সন্ন্যাসীগণের প্রভাব পড়িয়াছিল। এইরূপ পারস্পরিক প্রভাবের ফলে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায় | ভারতে মারাঠা ও শিখ শক্তির অভ্যুদয়

(ক) মারাঠা শক্তির উত্থান

দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলের অধিবাসীগণ চলিত কথায় মারাঠা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ মারাঠাগণের জীবন ও ইতিহাসকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত; উত্তরে সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; নর্মদা ও তাপ্তি নদী দ্বারা সুবেষ্টিত এবং নানা গিরিশ্রেণীতে সুরক্ষিত মহারাষ্ট্র স্বাভাবিক কারণেই দুর্ভেদ্য। এই অঞ্চলের ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও স্বল্প, সুতরাং জীবন-যাত্রা আয়াসসাধ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাঠাগণকে ভোগবিলাস ও আলস্যবিমুখ এবং কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী করিয়া তুলিয়াছিল। মারাঠাগণ প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকিলেও বিদেশী শাসনের সংঘাতে এবং একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণের প্রেরণায় তাহাদের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইতেছিল। দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর ও বিজাপুরের মুসলমান রাজত্বের আমলে মারাঠাগণ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। তাহার পর শিবাজীর ন্যায় একজন বিশিষ্ট সংগঠন প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধিমান ও সাহসী নেতার অভ্যুদয়ে মারাঠাগণ একতাবদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শিবাজী (১৬৬৪-১৬৮০ খ্রীঃ)ঃ শিবাজীর পিতা শাহজী প্রথমে দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পরে তিনি বিজাপুর রাজদরবারে কর্ম গ্রহণ করেন। পুণা জেলায় ও কর্ণাট প্রদেশে শাহজীর বিস্তৃত জায়গীর ছিল। পুণা জায়গীরের অন্তর্গত শিবনের গিরিদুর্গে শিবাজীর জন্ম হয় (১৬২৭ অথবা ১৬৩০ খ্রীঃ)। শাহজী সাধারণতঃ বিজাপুরে বাস করিতেন। শিবাজী ও তাঁহার মাতা জীজাবাঈ পুণায় বাস করিতেন। দাদাজী কোণ্ডদেব নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ শিবাজীর অভিভাবক ছিলেন। বাল্যবয়স হইতেই শিবাজী পুণার দুর্ধর্ষ মাওলি কৃষকগণের সহিত মিশিয়া অস্ত্রচালনা ও রণকৌশল আয়ত্ত করেন। কিশোর বয়সেই মারাঠাদের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের কল্পনা

বাল্য পরিচয়



শিবাজী

তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর তিনি মাওলিদের লইয়া এক ক্ষুদ্র অথচ সক্ষম সেনাদল গঠন করেন এবং তোরণ, পুরন্দর প্রভৃতি গিরিদুর্গ অধিকার করেন (১৬৪৭ খ্রীঃ)। তাঁহার পিতার জায়গীরের পশ্চিমভাগ ইতিপূর্বেই তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। সেই সমুদয় অঞ্চল ও বিজিত এলাকা একত্র করিয়া শিবাজী তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন।

রাজ্য পত্তন

উৎসাহিত হইয়া শিবাজী এইবার রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। তিনি কোঙ্কন প্রদেশে অভিযান করিয়া উহার কিয়দংশ অধিকার করিলেন (১৬৪৮ খ্রীঃ)। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন। অগত্যা শিবাজী কিছুকালের জন্য তাঁহার বিজয়াভিযান বন্ধ রাখিলেন। তাহারপর শাহজী মুক্ত হইলে শিবাজী পুনরায় রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। তিনি জাওলি রাজ্য অধিকার করিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান একদল সৈন্যসহ আফজল খাঁ নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। আফজল খাঁ নিহত হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত হইল (১৬৫৯ খ্রীঃ)।

রাজ্য বিস্তার

শিবাজী সুবিধা পাইলেই মুঘল অধিকৃত অঞ্চলেও অভিযান করিতেন। ঔরঙ্গজীব তখন দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। তিনি শিবাজীকে দমন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসনের জন্য ঔরঙ্গজীব কিছুকালের জন্য দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে শিবাজী শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিলেন। ঔরঙ্গজীব বাদশাহ হইয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে আদেশ দান করিলেন। অসম সাহসী শিবাজী এক রাত্রে পুনা নগরীতে শায়েস্তাখাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর এক পুত্র নিহত হইল। শায়েস্তা খাঁ আহত হইয়া অতিকষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। ঔরঙ্গজীব এইবার শাহজাদা মুয়াজ্জমকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী শাহজাদাকে গ্রাহ্য না করিয়া সুরাট ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করিলেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৬৬৪ খ্রীঃ)। ঔরঙ্গজীব অবশেষে অম্বরের রাজপুত রাজা জয়সিংহ এবং বিখ্যাত সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এইবার শিবাজী সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। পুরন্দরের সন্ধির শর্তে শিবাজী মুঘল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং মাত্র এগারোটি দুর্গ নিজের অধিকারে রাখিয়া বিজিত অবশিষ্ট দুর্গগুলি মুঘলের হস্তে সমর্পণ করিলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)।

মুঘলের সহিত সংঘর্ষ

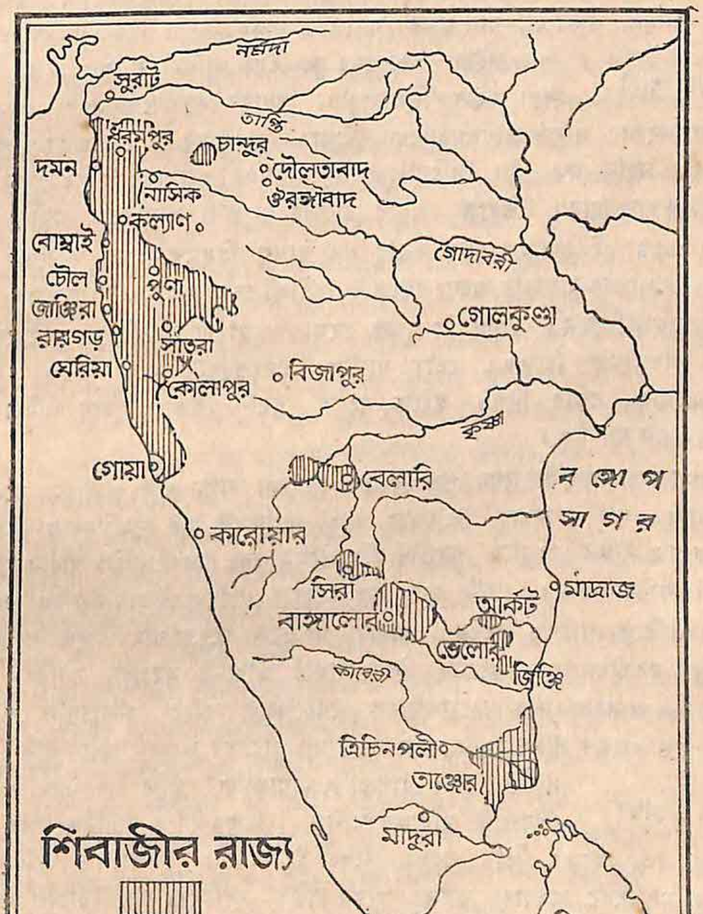
কূটকৌশলী ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজা জয়সিংহ তাঁহার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে শিবাজী দিল্লী দরবারে উপস্থিত হইলেন। ঔরঙ্গজীব সুযোগ বুঝিয়া শিবাজীকে তাঁহার বাসভবনে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু শিবাজী আপন বুদ্ধিকৌশলে মুঘলের সতর্ক প্রহরা এড়াইয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করিলেন এবং সন্ন্যাসীর বেশে মথুরা,

বন্দীদশা ও কৌশলে মুক্তিলাভ

বৃন্দাবন, বারাণসী ইত্যাদি তীর্থ পরিক্রমা করিয়া উড়িষ্যার মধ্য দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)।

রাজ্যাভিষেক

অতঃপর শিবাজী মুঘলের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঔরঙ্গজীব বাধ্য হইয়া শিবাজীকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন (১৬৬৮ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করিলেন এবং খান্দেশ প্রদেশ হইতে বলপূর্বক চৌথ সংগ্রহ করিলেন। যে সকল দুর্গ তিনি ইতিপূর্বে মুঘলগণকে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কতকগুলি পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার পর রাজধানী রায়গড়ে মহাসমারোহে শিবাজীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল



(১৬৭৪ খ্রীঃ)। তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করিলেন। রাজনীতিকুশলী শিবাজী সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সুলতানগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এইরূপে বলীয়ান হইয়া তিনি দক্ষিণ প্রদেশের বেলারি, জিঞ্জি, ভেলোর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। বিচ্ছিন্ন এই অংশগুলি ব্যতীত তাঁহার মূল রাজ্য কল্যাণ হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

শাসনপ্রণালী

শিবাজী স্বয়ং তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেন। আটজন মন্ত্রী তাঁহাকে রাজকার্যে সাহায্য করিতেন। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত 'পেশোয়া'। শিবাজীর অশ্বারোহী সেনাদল দুইঅংশে বিভক্ত ছিল। যাহারা রাজার নিকট হইতে অশ্ব এবং নিয়মিত বেতন পাইত তাহাদের বলা হইত 'বর্গীর'। আর যাহারা নিজেদের অশ্ব এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া কিছুদিনের জন্য সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিত, তাহাদের বলা হইত 'শিলাদার'। শিবাজী সৈন্যগণকে নগদ বেতন দিতেন এবং কঠোরতার সহিত তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষা করিতেন। তাঁহার সামরিক বলের অন্য দুই প্রধান অঙ্গ ছিল গিরিদুর্গ এবং নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর প্রধান বন্দর-ঘাঁটি ছিল মালওয়ান। শিবাজী তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি জরীপ করাইয়া উৎপন্ন শস্যের দুই পঞ্চমাংশ অথবা উহার মূল্য রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করিতেন। নিজ রাজ্যের এলাকার বহির্ভূত অঞ্চল হইতেও শিবাজী চৌথ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ পরিমাণ কর সংগ্রহ করিতেন। চৌথ দিলে অন্য রাজ্যের প্রজাগণকে তিনি মারাঠাসৈন্যের লুণ্ঠন হইতে অব্যাহতি দিতেন। চৌথ ব্যতীত 'সরদেশমুখী' নামে আরও একটি কর ভিন্ন রাজ্যের প্রজার নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইত। ইহার পরিমাণ ছিল রাজস্বের এক দশমাংশ।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

সামান্য এক জায়গীরদারের পুত্র হইলেও শিবাজী আপন শক্তি ও সাহস বলে প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজীব এবং প্রতিবেশী দুই মুসলিমরাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পরিণামে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মারাঠা গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক শক্তি-শালী জাতিতে পরিণত করেন। মারাঠা জাতিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি তাহাদের নবজীবন দান করেন। ইহা তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি। তাঁহার সাহস, বুদ্ধি ও সমরকৌশল মারাঠাশক্তিকে এমনই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরও একশত পঁচিশ বৎসর কাল মারাঠাগণ ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল। মাতৃভক্তি, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বধর্মানুরাগ শিবাজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুর ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা তাঁহার জীবনের ব্রত হইলেও তিনি পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। যুদ্ধকালেও তিনি মুসলমান নারী বা মসজিদের অমর্যাদা কখনও করেন নাই। মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। যে কালে ঔরঙ্গজীব হিন্দু প্রজার উপর ধর্মের নামে অত্যাচার করিতেন সেই ধর্মান্ধতার পরিবেশের মধ্যেও শিবাজী শত্রুর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

করিতেন। ইহা তাঁহার অসামান্য চরিত্রবলের পরিচায়ক। মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁ তাঁহার গ্রন্থে শিবাজীর প্রতি বহু কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও শিবাজীর উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মহানুভবতার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শিবাজী কেবলমাত্র একটি রাজ্য স্থাপনই করেন নাই, তিনি ছিলেন একটি জাতির জনক।

শিবাজীর বংশধরগণঃ শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০ খ্রীঃ) পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন। শম্ভুজীর দুর্বলতার জন্য মারাঠা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। নয় বৎসর পরে শম্ভুজী মুঘল সৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন (১৬৮৯ খ্রীঃ)। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীকে ঔরঙ্গজীব মুঘল অন্তঃপুরে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শম্ভুজীর মৃত্যুতেই মারাঠা শক্তি হতোদ্যম হইল না। শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই রাজারামের মৃত্যু হইলে (১৭০২ খ্রীঃ) তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাই তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া অভিভাবিকারূপে স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজীব বহু যুদ্ধ করিয়াও মারাঠা শক্তিকে দমন করিতে পারিলেন না। বাদশাহ বহু পরিশ্রমে যে সকল মারাঠা দুর্গ অধিকার করিতেন, তিনি সেখান হইতে অন্যত্র গেলেই মারাঠাগণ তাহা পুনরায় অধিকার করিয়া লইত।

ঔরঙ্গজীব প্রথমে তাচ্ছিল্য করিয়া মারাঠাগণকে 'পার্বত্য মূষিক' আখ্যা দিয়াছিলেন। পরে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সকল শক্তি সমবেত করিয়াও তিনি এই পার্বত্য মূষিকগণকে দমন করিতে ব্যর্থ হইলেন। মারাঠাগণ মুঘলের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মালবে অভিযান করে এবং খান্দেশ ও বেরার লুণ্ঠন করিয়া গুজরাটে প্রবেশ করে। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু কালে মারাঠা সৈন্য মুঘল বাদশাহের শিবিরের নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত লুণ্ঠন করিত।

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীঃ) শম্ভুজীর পুত্র শাহু মুঘল বাদশাহের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তারাবাই বিরোধিতা করিলেও শাহু সাতারায় মারাঠা সিংহাসনে আরোহন করিলেন (১৭০৮ খ্রীঃ)। মারাঠাগণ ক্রমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। কিন্তু শীঘ্রই শিবাজীর বংশধরগণের প্রভুত্বের অবসান হইল।

শিবাজীর বংশের কর্তৃত্বের অবসান

শাহু এক দানপত্রের দ্বারা তাঁহার সকল রাজকীয় ক্ষমতা তাঁহার প্রধানমন্ত্রী পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহার পর হইতে শিবাজীর বংশধরগণ নামে মাত্র রাজা হইয়া রহিলেন। মারাঠা রাজ্যে পেশোয়াগণের শাসন প্রবর্তিত হইল।

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০ খ্রীঃ)ঃ তারাবাই এর সহিত বিরোধিতার দিনে বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক কোঙ্কনী ব্রাহ্মণ শাহুকে প্রভূত সাহায্য করেন। সিংহাসন লাভ করিয়া শাহু পুরস্কারস্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার পেশোয়া পদে নিযুক্ত করেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। বালাজী অত্যন্ত কর্মদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেশোয়া পদকে রাজ্যের সর্বপ্রধান পদে পরিণত করিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা

রাজ্যে যে গোলযোগ দেখা দিয়াছিল, বালাজী তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া রাজ্যশাসনে পুনরায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিলেন। মন্ত্রীর কর্মগৌরব রাজার মহিমাকেও ম্লান করিয়া দিল। রাজপদের উপরেও পেশোয়া পদ স্থান লাভ করিল।

শিবাজী তাঁহার রাজ্যবহির্ভূত অঞ্চল হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংগ্রহ করিতেন। পেশোয়া পদলাভের পরবৎসরেই বালাজী মুঘল বাদশাহ ফারুখশিয়রের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে ঐ দুই প্রকার কর সংগ্রহের অধিকার আদায় করিলেন। শিবাজীর রাজ্যভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত খান্দেশ, বেরার, গণ্ডোয়ানা, কর্ণাটক অঞ্চল মুঘল বাদশাহ এক সনদদ্বারা শাহুকে প্রদান করিলেন। পরিবর্তে শাহু মুঘল বাদশাহকে বার্ষিক দশলক্ষ টাকা কর দিতে এবং যুদ্ধের সময় পনেরো হাজার অশ্বারোহী সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে শান্তিরক্ষার ভার বাদশাহ মারাঠাগণের হস্তে তুলিয়া দিলেন। বালাজীর কৃতিত্বের ফলে দাক্ষিণাত্যে মুঘল কর্তৃত্বের অবসান হইল।

মুঘল সনদ লাভ

পেশোয়া প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০ খ্রীঃ)ঃ বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়াপদ লাভ করিলেন। রাজ্যশাসনের সকল ক্ষমতাই শাহু তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। বাজীরাও মারাঠারাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। তিনি মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া দিল্লী অভিযান করিলেন। মারাঠাগণের চিরাচরিত রণরীতি অনুসারে মারাঠাসৈন্য সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া মোগল বাহিনীকে এড়াইয়া সহসা দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু দিল্লী অধিকার করিবার পূর্বেই হায়দরাবাদের নিজামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মারাঠা সৈন্যকে দাক্ষিণাত্যে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। দিল্লীর বাদশাহের আদেশেই নিজাম আসফজাহ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মারাঠাগণ নিজামকে পরাজিত করিলে তিনি বাধ্য হইয়া বাজীরাও-এর সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৩৮ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্তানুসারে সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ মারাঠাগণের অধিকারভুক্ত হইল। বাদশাহ এই মর্মে সনদ দান করিলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাদশাহ বাজীরাওকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর ত্রিশবৎসরের মধ্যেই মারাঠাগণের দ্বারা বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল।

মারাঠা রাজ্য বিস্তার

বাজীরাও সুবিস্তৃত মারাঠারাজ্য শাসন করিবার জন্য, সমগ্ররাজ্যকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের শাসন ভার এক একজন সেনাপতির হস্তে অর্পণ করেন। রাণাজী সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রের এবং মলহররাও হোলকার ইন্দোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। বেরারে রঘুজী ভোঁসলা এবং গুজরাটে প্রথমে প্রধান সেনাপতি দাভারে পরে পিলাজী গাইকোয়াড় নিযুক্ত হইলেন। পুণা স্বয়ং পেশোয়ার অধীনে রহিল। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে কালক্রমে সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র রাজ্য, হোলকারের ইন্দোর রাজ্য, ভোঁসলার নাগপুর রাজ্য এবং গাইকোয়াড়ের বরোদারাজ্য সৃষ্ট হইল।

মারাঠার পঞ্চরাজ্য

পেশোয়া বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১ খ্রীঃ) ঃ পেশোয়া প্রথম বাজীরাও এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়াপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পুণা নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। বালাজীর শাসনকালে আফগান নেতা আহম্মদ শাহ তুরানী বা আহম্মদ শাহ আবদালি পঞ্জাব অধিকার করেন (১৭৫০ খ্রীঃ)। সাত বৎসর পরে তুরানী আফগানিস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ আফগানদের বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন (১৭৫৮ খ্রীঃ)। তুরানী পর বৎসরেই পঞ্জাব পুনরাধিকার করেন। মারাঠা অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বালাজী বাজীরাও এক বিরাট মারাঠাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতা রঘুনাথ এই বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে অসম্মত হইলে পেশোয়া তাঁহার সতেরো বৎসর বয়স্ক পুত্র বিশ্বাসরাওকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। সদাশিবরাও প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন, যদিও যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না।

তুরানীর সহিত সংঘর্ষ

মারাঠা সৈন্য সহজেই দিল্লী অধিকার করিয়া অগ্রসর হইল। পাণিপথের প্রান্তরে মারাঠা ও আফগান পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উত্তর প্রদেশের রোহিলাগণ এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠাগণের বিপক্ষে আহম্মদশাহ তুরানীর দলে যোগ দিলেন। যুদ্ধকালে (১৪ই জানুয়ারি ১৭৬১ খ্রীঃ) বিশ্বাসরাও আহত হইয়া অশ্বচ্যুত হইয়া পড়িলে সেনাপতিকে না দেখিয়া মারাঠা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। আফগান সৈন্য প্রায় কুড়ি মাইল পর্যন্ত মারাঠাগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই হত্যা করিল। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে প্রায় দুইলক্ষ মারাঠাসৈন্য এবং বিশ্বাসরাও, সদাশিবরাও প্রভৃতি প্রায় সকল মারাঠা সেনাপতির মৃত্যু হইল। নিদারুণ পরাজয়ের ফলে উত্তর ভারতে মারাঠাসাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইল। পেশোয়া বালাজী বাজীরাও এর গৌরব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাইল।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

পেশোয়া মাধবরাও (১৭৬১-১৭৭২ খ্রীঃ) ঃ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাগণের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে ছয়মাসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সতেরো বৎসর বয়স্ক পুত্র মাধবরাও নূতন পেশোয়া হইলেন। বয়সে তরুণ হইলেও মাধবরাও কর্মদক্ষ ছিলেন। তিনি মহীশূরের সুলতান হায়দর আলিকে দুইবার পরাজিত করিলেন। ভোঁসলা ইতিপূর্বে যে সকল অঞ্চল বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও পেশোয়ার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। খুল্লতাত রঘুনাথরাও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। নবীন পেশোয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াও ক্ষমা করিলেন। ইহার ফলে পেশোয়া বংশের পূর্বগৌরব অনেক পরিমাণে পুনরুদ্ধার হইল। স্বরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের পর মাধবরাও উত্তর ভারতের নষ্ট সাম্রাজ্য উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুত ও জাঠগণ পরাজিত হইয়া কর দিতে বাধ্য হইল। মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ আলমকে দিল্লীর মসনদে স্থাপন করিল। তারপর গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব

বংশগৌরব পুনরুদ্ধার

অঞ্চল অধিকার করিয়া মারাঠাগণ যখন অযোধ্যা জয় করিতে উদ্যত, সেই সময় মাধবরাও এর মৃত্যু হইল।

পেশোয়াবংশে গৃহযুদ্ধ: মাধবরাও এর মৃত্যুতে মারাঠাগণের অপরিসীম ক্ষতি হইল। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হইলেন। কিন্তু রঘুনাথরাও এর চক্রান্তে নারায়ণরাও আট মাস পরেই গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হইলেন (১৭৭৩ খ্রীঃ)। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রঘুনাথরাও নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সিন্ধিয়া এবং হোলকার দুইজনে নারায়ণরাও এর নবজাত পুত্র মাধবরাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিলেন। গাইকোয়াড় পরিবারের কেহ মাধবরাও নারায়ণের পক্ষ, কেহ রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

ইংরেজ-মারাঠা যুদ্ধ

রঘুনাথরাও নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বোম্বাই-এর ইংরাজশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সলসেটি দ্বীপ, বেসিন বন্দর এবং বোম্বাই-এর নিকটবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির অধিকার দাবী করিল। রঘুনাথরাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সুরাটে সন্ধি-চুক্তি করিলেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)। রঘুনাথরাও ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইলেন। ইংরাজ গভর্ণর হেষ্টিংসের অনুমোদন-ক্রমে বোম্বাই হইতে ইংরাজ সৈন্যদল পুণার মারাঠা নায়কগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইল (১৭৭৮ খ্রীঃ)। বরগাঁও-এর যুদ্ধে পর্যুদস্ত হইয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। রঘুনাথের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে ইংরাজ স্বীকৃত হইল। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য বোম্বাইতে প্রত্যাগত হইলে ইংরাজ বরগাঁও-এর সন্ধি-চুক্তি পালন করিতে অস্বীকার করিল। হেষ্টিংস বাঙলাদেশ হইতে সেনাপতি গডার্ডের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সুরাটে উপস্থিত হইয়া গডার্ড গাইকোয়াড়ের সহিত পারস্পরিক সাহায্যদানের শর্তে সন্ধি করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। সিন্ধিয়া এবং হোলকারের অসতর্কতার সুযোগে গডার্ড আহম্মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিলেন। হেষ্টিংস আর একটি বৃটিশ সৈন্যদলকে পপ্‌হামের নেতৃত্বে সিন্ধিয়া রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। পপ্‌হাম গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিলেন। সিন্ধিয়া ইংরাজদের সহিত পৃথকভাবে সন্ধি করিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় ইংরাজ ও পুণার মারাঠা সরকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহা সালবাই-এর সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) নামে খ্যাত। সন্ধির সর্ত অনুসারে ইংরাজ মারাঠা রাজ্যের সকল অধিকৃত অংশ ত্যাগ করিল। স্থির হইল রঘুনাথরাও বাৎসরিক তিনলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন। প্রথম ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধ এইরূপে সমাপ্ত হইল।

সালবাই-এর সন্ধি

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান: সালবাই-এর সন্ধির পর মারাঠা রাজ্যগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মারাঠা নায়কগণের মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া কর্মদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রাজ্য উত্তর-ভারতে বিস্তৃত ছিল। মুঘল বাদশাহ শাহ আলমকে আশ্রয় দিয়া তিনি উত্তর ভারতে আপন প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ইউরোপীয় সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে

সিন্ধিয়া

ইউরোপীয় প্রথায় রণ-কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর (১৭৯৪ খ্রীঃ) পর তাঁহার তেরো বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পৌত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

নানা ফড়নবিশ

মারাঠা শক্তির কেন্দ্র পুণাতে তখন শিশু পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের নামে তাঁহার অভিভাবক নানা ফড়নবিশ নামে এক ব্রাহ্মণ নিজেই মারাঠা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহীশূরের স্থলতান টিপুকে আক্রমণ করিলে নানা ফড়নবিশ ইংরাজকে সাহায্য করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ টিপুর রাজ্যের কতক অংশ লাভ করিয়া মারাঠা রাজ্যের সীমা তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ফড়নবিশের পরামর্শে সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ নিজামকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে খর্দার যুদ্ধে পরাজিত করেন (১৭৯৫ খ্রীঃ)। এদিকে মারাঠারাজ্যে এক দুর্বিপাক উপস্থিত হইল। পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যু হইল। পেশোয়া পদের অধিকার লইয়া রাজ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। নানা ফড়নবিশ কারাগারে বন্দী হইলেন। চার বৎসর পরে ফড়নবিশের মৃত্যু হইলে মারাঠা রাজ্যের সুদিন গত হইল।



নানা ফড়নবিশ

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮ খ্রীঃ) ঃ মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যুর পর রঘুনাথরাও এর পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার পদ অধিকার করিলেন। যশোবন্তরাও হোলকার মারাঠারাজ্যের প্রধান হইবার আশায় পেশোয়াকে আক্রমণ করিলেন। পেশোয়া এই বিপদে সিন্ধিয়ার সাহায্য কামনা করিলেন। কিন্তু যশোবন্ত রাও পুণার নিকট এক যুদ্ধে পেশোয়া এবং সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। অপরিণামদর্শী পেশোয়া বাজীরাও বেসিনের সন্ধি দ্বারা (১৮০২ খ্রীঃ) ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং ইংরাজ সৈন্যের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার প্রতিদানে ইংরাজ সৈন্য তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল।

দ্বিতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধ

কিছুকাল পরে পেশোয়া ইংরাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত মিলিত হইলেন। হোলকার এই দলে যোগ দিলেন না। সকল সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গভর্ণর ওয়েলেসলী মারাঠাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দ্বিতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৮০৩ খ্রীঃ)। আসাই এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া এবং আরগাঁও এর যুদ্ধে ভোঁসলা পরাজিত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লাসোয়ারীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে পুনরায় পরাজিত করিল। সিন্ধিয়া ও

ভোঁসলা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। দেওগাঁও-এর সন্ধির শর্ত অনুসারে ভোঁসলা কটক, বালেশ্বর এবং মধ্য-ভারতের কিছু অংশ ইংরাজকে সমর্পণ করিলেন। অর্জুনগাঁও-এর সন্ধিদ্বারা সিন্ধিয়া চম্বল নদীর উত্তরস্থ ভূভাগ, পশ্চিম-ভারতের কিছু অংশ এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াবে ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন।

হোলকার এতকাল নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি এইবার একাকী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও দীগের যুদ্ধে (১৮০৪ খ্রীঃ) পরাজিত হইয়া তিনি পঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। দ্বিতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধ ইংরাজের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া সমাপ্ত হইল। ইংরাজের সহিত হোলকারের সন্ধি হইল (১৮০৬ খ্রীঃ)।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এযাবৎকাল হীন হইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন, দ্বিতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধ সমাপ্তির প্রায় দশ বৎসর পরে নূতন ইংরাজ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা (ইনি লর্ড হেষ্টিংস নামেও পরিচিত) পেশোয়াকে নূতন একটি সন্ধি চুক্তি করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির (১৮১৭ খ্রীঃ) শর্ত অনুসারে কোঙ্কনপ্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গ পেশোয়া বাজীরাও এর হস্তচ্যুত হইল। পেশোয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজকে আক্রমণের সুযোগ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় মধ্যভারত এবং রাজপুতানায় পিণ্ডারী নামে এক দলবদ্ধ দস্যুসম্প্রদায় নৃশংস অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। ইহাদের কোন কোন দল সিন্ধিয়া এবং হোলকারের সমর্থনপুষ্ট ছিল। লর্ড ময়রা পিণ্ডারী দমনে মনোযোগী হন। লর্ড ময়রা যখন পিণ্ডারী দমনে ব্যস্ত, পেশোয়া তাহার সুযোগ লইয়া পুণার নিকটবর্তী কিরকি নামক স্থানে অবস্থিত বৃটিশ দূতাবাস আক্রমণ করিলেন। কিরকিতে তখন ইংরাজসৈন্যের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল না। অপরপক্ষে পেশোয়া বাজীরাও-এর বাহিনীতে ছিল ছাব্বিশ হাজার সৈন্য। তথাপি পেশোয়া পরিচালিত অভিযান ব্যর্থ হইল। পেশোয়া পুণা হইতে পলায়ন করিলেন (১৮১৭ খ্রীঃ)। আপ্পাসাহেব ভোঁসলাও পেশোয়া বাজীরাও এর দৃষ্টান্তে ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি নাগপুরের নিকটবর্তী সীতাবলদী নামক স্থানের বৃটিশ দূতাবাস আক্রমণ করিলেন এবং পরাজিত হইলেন। হোলকারের সৈন্যদল উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী মাহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইল। পর বৎসর পেশোয়া কোরেগাঁও এবং উস্তির যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইলেন।

তৃতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধ

মারাঠা শক্তির বিনাশ: তৃতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে মারাঠাসাম্রাজ্যের পতন হইল। পেশোয়াপদ বিলুপ্ত হইল। পেশোয়া তাঁহার রাজ্য হারাইয়া ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুর নামক স্থানে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার জন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বার্ষিক আটলক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। শিবাজীর এক বংশধর বৃটিশের অধীনে সাতারায় মারাঠা সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। আপ্পাসাহেব ভোসলা সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহার রাজ্যের নর্মদা

নদীর উত্তর-তীরবর্তী অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তাঁহার এক নাবালক বংশধরকে ইংরাজ নাগপুরের সিংহাসনে স্থাপন করিল। হোলকার নর্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত রাজ্যাংশ ইংরাজকে সমর্পণ করিয়া বৃটিশের অধীনতা-মূলক-মিত্রতা গ্রহণ করিলেন। রাজপুতানায় হোলকারের যে অধিকার ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল। রাজপুত রাজগণ সিন্ধিয়া এবং হোলকারকে কর প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ইংরাজের অধীনতা-মূলক-মিত্রতা স্বীকার করিল। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' অনুসরণ করিয়া ভারতে মারাঠাশক্তির ইতিহাসের শেষ অধ্যায় রচিত হইল।

(খ) শিখ শক্তির উত্থান

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুরু নানক (১৪৬৯- ১৫৩৮ খ্রীঃ) যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। প্রথম দিকে শিখেরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন, কিন্তু পরে তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বতন্ত্র সমাজে পরিণত হন। নানকের পরবর্তী তিনজন শিখ গুরু অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক ছিলেন। রাজনীতির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। মুঘল বাদশাহ আকবর শিখধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শিখদের জন্য গুরু রামদাসের হস্তে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে বিস্তৃত পরিমাণ ভূমি দান করেন। অমৃতসর শিখগণের প্রধান পীঠস্থানে পরিণত হয়।

আদিশিখ গুরুগণ

শিখগণের পঞ্চমগুরু অর্জুন এর সময় হইতে শিখগুরুর পদ বংশানুক্রমিক হইয়া যায়। গুরু অর্জুন পূর্ববর্তী গুরুগণের সরল সন্ন্যাসীতুল্য জীবনযাত্রা ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ গৃহীজীবন যাপন করিতে থাকেন। অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি ভক্তগণের উপর কর ধার্য করেন। গ্রন্থসাহেব নামে খ্যাত শিখগণের আদি ধর্মগ্রন্থ তিনিই প্রথমে প্রচার করেন। গুরু অর্জুন রাজনীতির সহিতও জড়িত হইয়া পড়েন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া যখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন গুরু অর্জুন দয়াপরবশ হইয়া খসরুকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করেন। জাহাঙ্গীর এই অপরাধে গুরু অর্জুনকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিনি অর্থদানে অসম্মত হইলে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (১৬০৬ খ্রীঃ)।

শিখগুরু অর্জুন

এই ঘটনায় শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর আলোড়ন উপস্থিত হইল। অর্জুনের পুত্র ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ খ্রীঃ) আত্মরক্ষার্থে শিখ সম্প্রদায়কে সশস্ত্র যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে তাঁহার পিতার অর্থদণ্ড পরিশোধ করিতে আদেশ দান করিলেন। গুরু হরগোবিন্দ অর্থদণ্ডের একাংশ মাত্র পরিশোধ করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বারো বৎসর গোয়ালিয়র দুর্গে

গুরু হরগোবিন্দ

বন্দী করিয়া রাখিলেন। মুক্তিলাভের পর গুরু হরগোবিন্দ সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেন এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘলসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন।

গুরু হরগোবিন্দের পরবর্তী সপ্তম গুরু হররায় (১৬৪৫-১৬৬১ খ্রীঃ) শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দারাশিকোর পক্ষ সমর্থন করেন। ইহার ফলে ঔরঙ্গজীব শিখগণের প্রতি বিরাগ পোষণ করিতে থাকেন। অষ্টম গুরু হরকিষেণের (১৬৬১-১৬৬৪) সময় উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে শিখগণ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। নবম গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫ খ্রীঃ) ঔরঙ্গজীবের বিশেষ বিরাগভাজন হন।

তেগ বাহাদুর

ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে বন্দী করেন এবং হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, না হয় মৃত্যু বরণ করিতে আজ্ঞাদান করেন। গুরু তেগ বাহাদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ঔরঙ্গজীবের আদেশে তাঁহাকে দিল্লীতে হত্যা করা হইল। তাঁহার এই আত্মদান প্রসঙ্গে বলা হইয়া থাকে "শির দিয়া তো সর নেহি দিয়া"—মস্তক দিয়াছি, কিন্তু ধর্ম দিই নাই।

তেগবাহাদুরের পুত্র দশম ও শেষ শিখগুরু গোবিন্দসিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ) শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিলেন। গুরু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি 'খালসা' নামে ধর্মভিত্তিক সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিখধর্মের মূল দার্শনিক মতবাদ অপরিবর্তিত রহিল, কিন্তু বাহিক আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইল। শিখগণের মধ্যে জাতিভেদ নিষিদ্ধ করিয়া গুরুগোবিন্দ আদেশ দিলেন যে প্রত্যেক শিখের উপাধি হইবে 'সিংহ'। 'পাহুল' নামে এক নূতন দীক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। গুরু নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক শিখ পুরুষকে 'পঞ্চক' ধারণ করিতে হইবে। এই পঞ্চ'ক' হইল—কেশ, কঙ্কতী, কঙ্কণ, কঞ্চুক, কৃপাণ। কোন শিখ মস্তকের কেশ কর্তন করিবে না, ধূমপান করিবে না। তাহারা কঞ্চুক অর্থাৎ খাটো পায়জামা পরিধান করিবে, হস্তে লৌহ বলয় ধারণ করিবে এবং সর্বদা কৃপাণ বা তরবারি সঙ্গে রাখিবে। কেশবিন্যাসের জন্য কঙ্কতী বা চিরুণী সঙ্গে রাখিবে। শিখেরা লৌহ অর্থাৎ অস্ত্রের উপাসক হইবে এবং ধর্মরক্ষার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকিবে। জাতিভেদপ্রথা সমূলে বিনাশ করিবার জন্য একত্রে ভোজন শিখধর্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইল। এইরূপে শিখেরা খালসা অর্থাৎ পবিত্র হইল। নূতন নাম,

গুরুগোবিন্দ ও খালসা



গুরু গোবিন্দ

নূতন বেশ, নূতন আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া শিখসম্প্রদায় এক সুসম্বদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত হইল। গুরু গোবিন্দ আরও নির্দেশ দিলেন যে, অতঃপর শিখদের মধ্যে আর কেহ গুরু হইবেন না। শিখদের আদিগ্রন্থই গুরুর স্থান গ্রহণ করিবে। গুরু হরগোবিন্দের সময়ে শিখগণের মধ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল গুরুগোবিন্দের সময়ে তাহা পরিণতি লাভ করিল।

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর মুঘল মসনদের উত্তরাধিকার লইয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুরুগোবিন্দ সিংহ তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া বাহাদুর শাহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে যান, সেখানে এক আফগান আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করে (১৭০৮ খ্রীঃ)।

গুরুগোবিন্দ নিহত হইলে শিরহিন্দের মুঘল সেনাপতি অতি নিষ্ঠুরভাবে গুরুগোবিন্দের শিশুপুত্রগণকে হত্যা করিলেন। গুরু গোবিন্দের পরবর্তী শিখনেতা বান্দা শিরহিন্দ লুণ্ঠন করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। বাহাদুর শাহ শিখগণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বান্দা (১৭০৮-১৭১৭ খ্রীঃ) পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া বান্দা পঞ্জাবের পূর্বাংশ লুণ্ঠন করিলেন। অবশেষে ফারুখশিয়রের রাজত্বকালে বান্দা মুঘল হস্তে বন্দী হইলেন। অনুচরগণের সহিত তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল।

শিখনেতা বান্দা

বান্দার মৃত্যুতে শিখশক্তি নিরুদ্যম হইল না। মুঘল সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এবং আহম্মদ শাহ দুরাণীর ভারত অভিযানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিখগণ পঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। দুরাণীর বংশধরগণ বহু চেষ্টা করিয়াও শিখগণকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল না। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর তিন বৎসরের মধ্যে শিখগণ লাহোর অধিকার করিল এবং শিখ সর্দারগণ ঝিলম হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করিয়া সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন। আহম্মদ শাহ দুরাণী ভারত ত্যাগ করিবার পর তাঁহার পুত্র তৈমুরশাহের নিকট হইতে শিখগণ আহম্মদশাহের ভারতে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ কাড়িয়া লইল। ইহার পর ছয় বৎসরের মধ্যে পূর্বে শাহরানপুর হইতে পশ্চিমে আটক এবং উত্তরে জম্মু হইতে দক্ষিণে মূলতান পর্যন্ত শিখ অধিকার বিস্তৃত হইল।

শিখরাজ্যের পত্তন

শিখগণ বারোটি মিশল বা দলে বিভক্ত ছিল। এই বারোটি মিশলের নাম হইল আহলুওয়ালিয়া, করোড়া সিংঘীয়া, কাহ্নাইয়া, ডালেওয়ালিয়া, নকাই, নিশালওয়ালা, ফয়জুল্লাপুরিয়া, ফুলকিয়া, ভাঙ্গি, রামগড়িয়া, সুখের চকিয়া এবং শাহিদ ও নিহাঙ্গ। এই বারোটি মিশলের সর্দারগণ প্রতিবৎসর দুইবার অমৃতসরে এক সভায় সম্মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্য হইতে একজন নায়ক বা সরবৎ-ই-খালসা নির্বাচন করিতেন। এই বারোটি মিশল পূর্বে শাহরাণপুর হইতে পশ্চিমে আটক এবং উত্তরে জম্মু হইতে দক্ষিণে মূলতান

পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিত। তাহাদের সম্মিলিত শক্তির পরিমাণ ছিল সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। শিখগণ মারাঠাদের মতই সম্মুখযুদ্ধ যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিত। আহম্মদশাহ দুরাণী যখন সসৈন্যে ভারত অভিযানে অগ্রসর হইতেন, শিখগণ তখন পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় লইত। আবার দুরাণী যখন প্রত্যাবর্তন করিতেন, তাহারা তখন আফগান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিত ও সুযোগ মত রসদ লুণ্ঠন করিয়া লইত। মারাঠাগণ চৌথ আদায় করিত, শিখরাও তেমনি "রাখী" অর্থাৎ রক্ষা কর আদায় করিত।

বারোটি মিশলের মধ্যে কয়েকটি ক্রমে খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভাঙ্গী মিশল লাহোর, অমৃতসর এবং পশ্চিম পঞ্জাব অধিকার করে। কাহ্নাইয়া মিশল হিমালয়ের পাদদেশ অধিকার করে। ফুলকিয়া মিশল পাতিয়ালা এবং সরহিন্দে আধিপত্য বিস্তার করে। পাতিয়ালার পনেরো মাইল পশ্চিমে ফুলকিয়া শিখ হামির সিং নাভা রাজ্য স্থাপন করেন (১৭৫৫ খ্রীঃ)। অপর এক ফুলকিয়া শিখ গজপৎ সিং পাণিপথের বিয়াল্লিশ মাইল পশ্চিমে ঝিন্দ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদশাহ দুরাণী যখন দিল্লী অভিযানে ব্যস্ত, সেইসময় কাপুরওলা শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জস্‌সা সিং আহলুওয়ালিয়া, জয় সিং কাহ্নাইয়া, গুজর সিং ভাঙ্গী, লেহনা সিং রামগড়িয়া একত্রে লাহোর অবরোধ করেন। লাহোরের শাসনকর্তা দুরাণীর প্রতিনিধি ত্রিশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়া তবেই রক্ষা পান। বারংবার শিখ আক্রমণে বিব্রত হইয়া দুরাণী অবশেষে ফুলকিয়া মিশলের অমর সিং জাঠকে পাতিয়ালার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে সরহিন্দের ফৌজদার নিযুক্ত করেন (১৭৬৭ খ্রীঃ)।

রণজিৎসিংহ (১৭৮০—১৮৩৯ খ্রীঃ)ঃ রণজিৎসিংহের পূর্বপুরুষ বুধ সিংহ গুজরানওয়ালার এক সামান্য কৃষক ছিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি শিখ হন। বুধ সিংহের পুত্র নৌধ সিংহ সুখেরচক গ্রামটিকে সুরক্ষিত করেন এবং সুখেরচকিয়া মিশল জন্মলাভ করে। আহম্মদশাহ দুরাণীর সহিত নৌধ সিংহ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হন এবং দুরাণীর প্রত্যাবর্তনের পর কয়েকটি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। নৌধ সিংহের পুত্র চরহৎ সিংহ গুজরানওয়ালায় দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আহম্মদশাহ দুরাণীর সহিত তাঁহারও সংঘর্ষ হয়। চরহৎ সিংহের পুত্র মহাসিংহ ঝিন্দ-এর শাসক গজপৎ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া

বংশ পরিচয়

তিনি রসুলনগর, শাহীওয়াল ও শিয়ালকোট জয় করেন এবং জম্মু লুণ্ঠন করেন। কাহ্নাইয়া মিশলের সহিত যুদ্ধে মহাসিংহ জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে কাহ্নাইয়া মিশলের দলনায়কের একমাত্র পুত্র গুরুবখ্‌শ সিংহ নিহত হন। সন্ধির সর্তানুসারে গুরুবখ্‌শ সিংহের কন্যা মেহতাব কাউর-এর সহিত মহাসিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহের বিবাহ হয়। এইরূপে ফুলকিয়া এবং কাহ্নাইয়া মিশলের সহিত

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সুখেরচকিয়া মিশল আদিতে ক্ষুদ্র এবং অখ্যাত হইলেও ক্রমে শক্তিশালী এবং প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

রণজিৎ সিংহ যখন সুখেরচকিয়া মিশলের নায়কপদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। এই সময়েই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মহাসিংহ কয়েকটি শিখ মিশলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শিখরাজ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ পিতার আরব্ধ কর্মকে সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার বয়স যখন তেরো বৎসর তখন আফগানিস্তানের আমীর জমান শাহ ভারতে অভিযান করেন

রাজপদ লাভ

এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পঞ্জাবের কতকাংশ অধিকার করেন। এই অভিযানে কিশোর রণজিৎ সিংহ নানাভাবে জমান শাহকে সাহায্য করেন বলিয়া আফগান অধিপতি রণজিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দান করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)।



রণজিৎ সিংহ

এক বৎসরের মধ্যেই রণজিৎ সিংহ আফগান প্রভুত্ব অস্বীকার করেন এবং বাহুবলে অন্যান্য শিখ মিশলগুলি অধিকার করিতে থাকেন। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী শিখ মিশলগুলি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ শিখতীর্থ অমৃতসর অধিকার করেন। ইহাতে সমগ্র শিখজাতির

রাজ্যবিস্তার

নিকট তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ইংরাজ-মারাঠা যুদ্ধের সময় যশোবন্তরাও হোলকার পঞ্জাব অধিকার করিয়া রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান রণজিৎ সিংহ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অস্বীকার করেন হোলকার পরাজিত হইয়া পঞ্জাব ত্যাগ করিলে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করেন (১৮০৬খ্রীঃ)। রণজিৎ সিংহের রাজ্যবিস্তারে ভীত হইয়া শতদ্রুর পূর্বতীরে অবস্থিত শিখ রাজ্যগুলি ইংরাজদের শরণাপন্ন হইল। বড় লাট লর্ড মিণ্টো এই রাজ্যগুলিকে আশ্রয়দান করিলে ইংরাজের সহিত রণজিৎ সিংহ অমৃতসরে সন্ধি স্থাপনা করিলেন (১৮০৯ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্তানুসারে রণজিৎ সিংহ লুধিয়ানা ত্যাগ করিলেন। বিনাযুদ্ধে যমুনা হইতে শতদ্রু পর্যন্ত বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল। সমগ্র পঞ্জাবে সম্মিলিত শিখরাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা লুপ্ত হইল।

অমৃতসরের সন্ধির পর রণজিৎ সিংহ উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সকল অঞ্চল তখনও আহম্মদশাহ দুরাণীর বংশধরগণের অধিকারে ছিল।

ফলে, আফগানদের সহিত রণজিৎ সিংহের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি প্রথমে গুর্খাগণের নিকট হইতে কাংড়া অধিকার করেন (১৮১১ খ্রীঃ)। কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীর শাহসুজা লাহোরে রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহার বিনিময়ে জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর হীরকখণ্ডটি রণজিৎ সিংহকে উপহার দান করেন। ইহারপর রণজিৎ সিংহ মূলতান এবং কাশ্মীর জয় করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব স্বীকার করেন এবং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সেনাপতি হরিসিংহ পেশোয়ার জয় করিয়া উহা শিখরাজ্যভুক্ত করেন। ইংরাজেরা বাধা দেওয়ায় রণজিৎ সিংহ সিন্ধু অধিকার করিতে পারেন নাই। এইরূপে রাজ্যবিস্তারের ফলে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখরাজ্য সিন্ধুর সীমান্ত হইতে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ এবং পেশোয়ার, কাংড়া ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

রণজিৎ সিংহ নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু আপন শৌর্য ও বুদ্ধিবলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিখশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তিনি বিচ্ছিন্ন শিখগণকে একত্র করিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজ এবং তাঁহার স্বদেশবাসী স্বধর্মীয়গণ বিরোধিতা না করিলে তিনি হয়ত সাফল্যলাভ করিতেন। দূরদর্শী রণজিৎ সিংহ ইংরাজদের সম্পর্কে অভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। শোনা যায় ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্রে ইংরাজ অধিকৃত স্থানগুলি লালরঙে রঞ্জিত দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন 'সব লাল হো যায়েগা'। অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষই ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী আচিরেই সত্য হইয়াছিল। অতএব ইংরাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তিনি বরং ভারতের পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। শাহীরাজ জয়পালের পরে ভারতীয়গণের মধ্যে একমাত্র রণজিৎ সিংহই ভারতের বাহিরে আফগানিস্থান অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ শিখগণের সহজাত সামরিক প্রবণতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্ত্য প্রথায় শিক্ষিত করেন ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কয়েকজন ইউরোপীয় সেনানায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অলার্ড ভেনতুপ নামে একজন ফরাসী তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনী ছিল রীতিমত রণদক্ষ।

দলীপ সিংহ ঃ পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই শিখরাজ্যে গোলযোগ দেখা দিল। বিশাল খালসা বাহিনী শক্তিমান নেতার অভাবে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। লাহোর দরবারের মন্ত্রিগণ সৈন্যবাহিনীকে বশে রাখিতে অসমর্থ হইলেন। সৈন্যদলের পঞ্চায়েৎই রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করিল। চার বৎসর পরে তাহারা রণজিৎ সিংহের পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিল (১৮৪৩ খ্রীঃ)। রাণী ঝিন্দন নাবালক রাজার অভিভাবিকা এবং লালসিংহ মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে শিখসৈন্য শতদ্রু অতিক্রম করিল। শিখরাজ্যের

সীমান্তে বৃটিশের কার্যকলাপ তাহাদের সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল যে ইংরাজেরা গোপনে পঞ্জাব অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

শিখেরা শতদ্রু অতিক্রম করিলে বৃটিশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মাত্র তিন মাসের মধ্যে মুদকী, ফিরোজ শাহ, আল ওয়াল এবং সোব্রাওঁ নামক স্থানে চারটি যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধগুলিতে অপরিসীম বীরত্বসত্ত্বেও তেজসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় শিখবাহিনী পরাজিত হইল। শিখসৈন্য শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। লাহোরের সন্ধির (১৮৪৬ খ্রীঃ) শর্তে স্থির হইল যে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর দক্ষিণ দিকের সমগ্র শিখ অধিকারভুক্ত ভূভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

প্রথম শিখ যুদ্ধ

কাশ্মীর প্রদেশ এবং হজার জেলাও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজের প্রাপ্য হইবে। শিখগণকে আরও পঞ্চাশ লক্ষ (মতান্তরে দেড় কোটি) টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইল। শিখসৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া লাহোর দরবারের ক্ষমতা খর্ব করা হইল। বালক দলীপ সিংহ নামেমাত্র রাজা রহিলেন। আটজন শিখ সর্দার লইয়া গঠিত এক দরবারের উপর পঞ্জাবের শাসনভার ন্যস্ত হইল। কিছুদিন পরে আরও একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। একদল বৃটিশসৈন্য লাহোরে মোতায়েন করা হইল এবং বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি স্যার হেনরী লরেন্স কার্যতঃ শিখরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ লাহোর দরবারের এক সর্দার গুলাব সিংহের নিকট কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য পঞ্চাশলক্ষ (মতান্তরে দেড়কোটি) টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিল এবং তাঁহাকে কাশ্মীর ও জম্মুর রাজা বলিয়া স্বীকার করিল।

শিখগণের সহিত ইংরাজদের এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে রাজমাতা ঝিন্দনকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ লাহোর হইতে নির্বাসিত করিলে শিখগণ চঞ্চল হইল। লাহোর দরবার মূলতানের শাসনকর্তা মূলরাজের নিকট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাবী করিলে দেওয়ান মূলরাজ পদত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। অন্যান্য শিখ সর্দারগণ মূলরাজের পক্ষে যোগ দিলেন। ইংরাজ বড়লাট লর্ড ডালহৌসী শিখগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়ালা প্রান্তরে শিখ ও বৃটিশ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইল (জানুয়ারি ১৮৪৯ খ্রীঃ)। যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিছুদিন পরেই ইংরাজ সৈন্য মূলতান অধিকার করিল এবং কয়েক সপ্তাহ পরে চিনাব নদীর তীরে গুজরাতের যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণা দ্বারা পঞ্জাবকে বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। দলীপ সিংহকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া তাঁহার মাতা ঝিন্দনের সহিত ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইল। এইরূপে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর দশবৎসরের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিখরাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেল।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ

দ্বাদশ অধ্যায়	ভারতে ইউরোপীয়গণের আগমন

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অনুপ্রবেশঃ প্রাচীনকালে পশ্চিম-এশিয়া আফ্রিকা এবং সংলগ্ন ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে আরবগণ পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকায় প্রাধান্য বিস্তার করিবার পর ইউরোপের সহিত ভারতের সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। আরব বণিকগণ ভারত হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহা উচ্চমূল্যে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিক্রয় করিত। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরের ইতালীয় বণিকেরা আবার ঐ পণ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিক্রয় করিত। এই বাণিজ্যে আরব এবং ইতালীয় বণিকেরা প্রচুর লাভবান হইত। ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বণিকেরা ভারতের সহিত সরাসরি বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। স্থলপথ আরবগণের অধিকারে, অতএব জলপথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক বার্থো লোমিউ দিয়াজ আটলান্টিক মহাসাগর বাহিয়া আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত জলপথ আবিষ্কার করেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্‌কো-দা-গামা নামে অপর এক পোর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের পশ্চিম-উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ভারতে আসিবার এই জলপথ আবিষ্কৃত হইলে ইউরোপের বণিকমহলে সাড়া পড়িয়া যায় এবং তাহারা নিজেদের বাণিজ্য কোম্পানী গঠন করিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে।

জলপথ সন্ধান



ভাস্‌কো-দা-গামা

পোর্তুগীজ ঃ ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কার করিলে পোর্তুগালের রাজার উৎসাহে এবং আনুকূল্যে পোর্তুগীজগণ ভারতে বাণিজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করে। তাহারা উত্তরে এডেন হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত নানাস্থানে কয়েকটি বাণিজ্য

কুঠি নির্মাণ করে। বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত গোয়া বন্দর তাহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। পোর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক (১৫০৯-১৫১৩ খ্রীঃ) ভারতের পশ্চিম-উপকূলে পোর্তুগীজ নৌবলের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনি বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করিয়া গোয়া অধিকার করেন। ক্রমে পোর্তুগীজগণ পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই, দমন, দিউ, বেসিন এবং সলসেটি বন্দরে এবং পূর্ব-উপকূলে মাদ্রাজের সামথোম ও বাঙলা দেশের হুগলী ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। পোর্তুগীজগণ শুধুমাত্র বাণিজ্যই করিত না, তাহারা সুযোগ পাইলেই ভূমি অধিকার করিয়া রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিত। ইহার ফলে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া, ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেসিন এবং ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সলসেটি তাহাদের হস্তগত হয়। জলদস্যু বা বোম্বেটে রূপে পোর্তুগীজগণ ভারতে কুখ্যাত হইয়া উঠে। তাহাদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের সমৃদ্ধ অঞ্চল উৎসন্ন হইয়া যায়। খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রতি গোঁড়ামী বশতঃ তাহারা হিন্দু এবং মুসলমান সকলের উপরই অত্যাচার করিতে থাকে। তাহারা ক্রীতদাসের ব্যবসাও করিত। ঔদ্ধত্যেরবশে পোর্তুগীজগণ হিন্দু-মন্দির এবং দেবমূর্তি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা মুসলমান তীর্থ-যাত্রীপূর্ণ চারখানা জাহাজ অধিকার করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজ্যে সকল পোর্তুগীজকে কারারুদ্ধ করেন। খ্রীষ্টান গীর্জাসমূহ বন্ধ করিয়া প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান রহিত করা হয়। ভারতের উপকূল হইতে পোর্তুগীজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য জাহাঙ্গীর ওলন্দাজগণের সহিত সন্ধি করেন (১৬১৫ খ্রীঃ)। ইহাতেও পোর্তুগীজগণের উৎপাত বন্ধ হইল না। শাহজাহানের রাজত্বে তাহারা বাদশাহের পত্নী মমতাজের দুইটি বাঁদীকে আটক করিলে, বাদশাহের আদেশে বাঙলার সুবাদার কাশিম খাঁ পূর্ব-ভারতে পোর্তুগীজগণের প্রধান ঘাঁটি হুগলী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন (১৬৩২ খ্রীঃ)। চার হাজার বন্দী পোর্তুগীজকে আগ্রায় প্রেরণ করা হইল। ইহার পর হইতে ভারতে পোর্তুগীজগণের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের পোর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ওলন্দাজগণের হস্তগত হয়। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ সলসেটি ও বেসিন হইতে পোর্তুগীজগণকে বিতাড়িত করে। ইহার পর কেবলমাত্র গোয়া, দমন ও দিউ পোর্তুগীজগণের অধিকারে থাকে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর তিনটিও স্বাধীন ভারতের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ভারতের মাটিতে পোর্তুগীজগণের আর স্থান নাই।

পোর্তুগীজদের অত্যাচার

ইংরাজঃ ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার সনদ লাভ করে। ইংরাজ বণিকগণ প্রথমে সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য করিত। আট বৎসর পরে তাহারা ভারতে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করে, কিন্তু পোর্তুগীজগণের বাধা-দানের ফলে সেই চেষ্টা বিফল হয়। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজগণ জলযুদ্ধে ইংরাজদের

বোম্বাই-কেন্দ্র

নিকট পরাজিত হইল। মুঘল-বাদশাহ জাহাঙ্গীর ইংরাজগণকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দান করেন (১৬১৩ খ্রী:)। ইহার দুই বৎসর পর ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস তাঁহার দূতরূপে 'স্যার টমাস রো'কে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করিলেন। টমাস রো মুঘল বাদশাহের নিকট হইতে বহু সুবিধা আদায় করেন এবং বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। সুরাট ব্যতীত বরোচ, আহম্মদাবাদ এবং আগ্রায় ইংরাজ বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পোর্তুগীজ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক-স্বরূপ বোম্বাই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উহা বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইজারা দান করেন (১৬৬৮ খ্রী:)। বোম্বাই ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে এবং সুরাটের পরিবর্তে ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভারতের পূর্ব-উপকূলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের অন্তর্গত মসুলিপটম বন্দরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল (১৬১৬ খ্রী:)। তাহার পর

মাদ্রাজ কেন্দ্র

চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে জমি ইজারা লইয়া ইংরাজেরা মাদ্রাজ শহরে সেণ্ট জর্জ নামে দুর্গ এবং বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে (১৬৩৯ খ্রী:)। ক্রমে বালেশ্বর, হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজগণের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রগুলি সবই মাদ্রাজ কেন্দ্রের অধীন ছিল। করমণ্ডল উপকূলে মাদ্রাজ ইংরাজগণের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহানের পুত্র বাঙলার সুবাদার সুজা বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্কে ইংরাজগণকে বাঙলাদেশে অবাধ বাণিজ্য করিবার অনুমতি দান করেন।

বাঙলাদেশে ইংরাজ

নবাব শায়েস্তা খাঁ এবং বাদশাহ ঔরঙ্গজীবও ইংরাজগণকে অতি সামান্য শুল্ক দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুল্ক সংগ্রহের ব্যাপারে মুঘল কর্মচারীগণের সহিত ইংরাজ বণিকগণের বিবাদ দেখা দিতে লাগিল। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইংরাজেরা হুগলীতে দুর্গ নির্মাণ করিলে মুঘলসৈন্য তাহাদের হুগলী হইতে বিতাড়িত করিল। ইংরাজেরা আরব সাগরে মুসলমান তীর্থ-যাত্রীগণের জাহাজ আটক করিলে মুঘল-বাহিনী বোম্বাই অবরোধ করিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মুঘলের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরাজগণ মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছিল। সন্ধির পর তাহারা বাঙলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের

কলিকাতার পত্তন

নেতা জব-চার্নক ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী সুতানুটি গ্রামে নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেন (১৬৯০ খ্রী:)। ছয় বৎসর পরে বাঙলার নবাবের বিরুদ্ধে বর্ধমানের জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময় আত্মরক্ষার অজুহাতে ইংরাজেরা সুতানুটিতে দুর্গ নির্মাণ করে। আরও দুই বৎসর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বারো শত টাকা মূল্যে সুতানুটি, কালীঘাট এবং গোবিন্দপুর এই তিনখানি

গ্রামের জমিদারীস্বত্ব ক্রয় করে। এই গ্রামগুলি জুড়িয়া কলিকাতা নগরীর পত্তন হইল। ইংরাজরা এখানে ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক দুর্গ নির্মাণ করিল (১৬৯৮ খ্রীঃ)। কলিকাতা ক্রমে ইংরাজগণের পূর্ব-ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। এইরূপে একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই তিনটি স্থানে ইংরাজের তিনটি প্রধান দুর্গ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইল।

ওলন্দাজ ঃ প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অধিবাসী ওলন্দাজগণ কোম্পানী গঠন করে। তাহারা প্রথমে কালিকটে ও সুরাটে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্যেই তাহারা অধিকতর আগ্রহী ছিল; কারণ সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং মলক্কায় উৎপন্ন মরিচ ও মসলা বিক্রয় খুবই লাভজনক হইত। মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর পোর্তুগীজগণকে বিতাড়নের জন্য ওলন্দাজগণকে উৎসাহিত করেন। ইহার ফলে ওলন্দাজগণ মালাবার হইতে পোর্তুগীজদের উচ্ছেদ করে এবং কুইলন, ক্র্যাঙ্গানোর ও কোচিন অধিকার করে। নেগাপত্তমে ওলন্দাজগণের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হয়। বাঙলাদেশে চুঁচুড়া ও কাশিবাজারে তাহারা কুঠি স্থাপন করে। বাঙলাদেশে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে ওলন্দাজগণ বিদেরার যুদ্ধে (১৭৫৯ খ্রীঃ) ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভের নিকট পরাজিত হয়। কিছুকাল পরে নেগাপত্তম ইংরাজগণের দ্বারা অধিকৃত হইলে ওলন্দাজগণ ভারত হইতে তাহাদের বাণিজ্য অন্যত্র সরাইয়া লইল।

ফরাসী ঃ বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আসিবার বহুকাল পরে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই এর রাজত্বকালে মন্ত্রী কোলবার্টের আনুকূল্যে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। চার বৎসর পরে এই কোম্পানী প্রথমে সুরাটে এবং পর বৎসর গোলকুণ্ডার সুলতানের অনুমতিক্রমে মসুলিপত্তমে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফরাসীগণের প্রধান উপনিবেশ মাদ্রাজের পঁচাশী মাইল দক্ষিণে পণ্ডিচেরী নামক স্থানে স্থাপিত হয়। মার্টিন নামে এক ফরাসী পণ্ডিচেরীর পত্তন করেন এবং কয়েক বৎসর পরেই এখানে দুর্গ নির্মিত হয়। ইহার পর বাঙলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর নিকট হইতে ফরাসীগণ বাঙলাদেশের চন্দননগরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে এবং কয়েক বৎসর পর সেখানে কুঠি নির্মাণ করে (১৬৯০ খ্রীঃ)। ভারত মহাসাগরে মরিশস, মালাবার উপকূলে মাহে, এবং করমণ্ডল উপকূলে কারিকল বন্দরেও ফরাসীগণের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী এবং চন্দননগর ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি ঃ ডেনমার্কের অধিবাসী দিনেমারগণ ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কোম্পানী গঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। দিনেমারগণ তেমন কোন সাফল্য বা প্রতিপত্তি অর্জন করিতে পারে নাই। বাঙলাদেশের শ্রীরামপুর এবং তাঞ্জোরের ট্রাঙ্কুইবার নামক স্থানে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা দিনেমারগণের এই দুইটি কেন্দ্র ক্রয় করিয়া লয়। দিনেমার ব্যতীত ফ্লাণ্ডার্সের

বণিকগণ অস্টেণ্ড কোম্পানী (১৭২২ খ্রীঃ) এবং সুইডেনের বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৭৩১ খ্রীঃ) গঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ ও ফরাসীগণের মধ্যে বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা ক্রমে ভারতে তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। ফরাসীগণের পক্ষে যোসেফ্ ডুপ্লে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নেতৃত্বকরেন। ডুপ্লে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন। দশ বৎসরকাল চন্দননগরের শাসন পরিচালনার পর তিনি পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ডুপ্লে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি এদেশে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে ফরাসীগণের কোন সামরিক নৌবহর ছিল না। লাবুর্দোনে নামক এক ফরাসী সেনানায়কের অধীনে মরিশস দ্বীপে ফরাসীগণের একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। ডুপ্লে এই নৌবহরের সহায়তা গ্রহণের জন্য লাবুর্দোনেকে আহ্বান করিলেন। এই সময় ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরাজ ও ফরাসীগণ এই যুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষে অংশ গ্রহণ করে। ফলে ভারতেও তাহাদের মধ্যে চার বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ডুপ্লের আবেদন ক্রমে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দীন ইংরাজগণকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। পরবৎসর লাবুর্দোনে তাঁহার নৌবহর লইয়া ভারতে উপস্থিত হইলেন এবং মাদ্রাজ অধিকার করিলেন। তাঁহার বিনা অনুমতিতে ফরাসীগণ মাদ্রাজ অধিকার করায় নবাব আনোয়ারউদ্দীন ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীগণের বিরুদ্ধে দশহাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লের রণকৌশলে মাত্র পাঁচশত ফরাসী সৈন্য নবাবের বাহিনীকে মৈলাপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। ইহার পর ইংরাজেরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিয়া ডুপ্লের নিকট পরাজিত হইল (১৭৪৮ খ্রীঃ)। ইংরাজের সৌভাগ্যক্রমে এই বৎসরই ইউরোপে "আয়-লা-শাপেল" এর সন্ধিতে ইংরাজ ও ফরাসীগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষেও ইংরাজ ও ফরাসী যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। ফরাসীরা মাদ্রাজ ইংরাজদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। ডুপ্লের সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা ফলবতী হইল না।



যোসেফ্ ডুপ্লে

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসীগণের আশা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের মধ্যে গৃহ বিবাদে অংশগ্রহণ করিয়া ভারতে ফরাসীপ্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যোগী হইলেন। হায়দরাবাদের নিজামের মৃত্যু হইলে মসনদ লইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র নাজির জঙ্গ এবং দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। কর্ণাটকের নবাবের পদ লইয়াও আনোয়ারউদ্দীন এবং প্রাক্তন এক নবাবের জামাতা চাঁদ সাহেবের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। ডুপ্লে দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায়ে মুজফ্‌ফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মুজফফর জঙ্গ, চাঁদ সাহেব এবং ফরাসী বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে আনোয়ারউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭৪৯ খ্রীঃ)। আনোয়ারউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলি পলায়ন করিয়া ত্রিচিনোপল্লীতে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডুপ্লের অধীনে চাঁদ সাহেব কর্ণাটকের নবাব নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ

হায়দরাবাদে নাজির জঙ্গ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ সহজেই নিজামের পদলাভ করিলেন। প্রতিদান স্বরূপ তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে সমুদয় মুসলমান রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। উপরন্তু মসুলিপত্তম্ বন্দর তিনি ফরাসীগণকে দান করিলেন। ডুপ্লে এক বৃহৎ জায়গীর এবং এবং নগদ দুই লক্ষ পাউণ্ড অর্থ লাভ করিলেন। কিছুকাল পরে মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিহত হইলে ফরাসী সেনাপতি বুসী পরলোকগত নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে হায়দরাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বয়ং একদল সৈন্যসহ হায়দরাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজাম "উত্তর সরকার" নামক অঞ্চলের রাজস্ব ফরাসীগণকে সমর্পণ করিলেন।

ডুপ্লের সাফল্য

ফরাসীগণের এই সাফল্যে ইংরাজেরা বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে চাঁদ সাহেব ত্রিচিনোপল্লীতে মুহম্মদ আলিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ নামে এক তরুণ ইংরাজ সেনানায়ক অতর্কিতভাবে চাঁদ সাহেবের রাজধানী আর্কট অধিকার করিয়া লইলেন। চাঁদ সাহেব আর্কট উদ্ধারের জন্য তাঁহার পুত্র রাজাসাহেবকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ক্লাইভের রণনৈপুণ্যে রাজা সাহেব পরাজিত হইলেন। ক্লাইভ অগ্রসর হইয়া চাঁদ সাহেব ও ফরাসীগণের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া ত্রিচিনোপল্লী অবরোধ মুক্ত করিলেন (১৭৫২ খ্রীঃ)। মুহম্মদ আলি আর্কটের নবাবেরপদ লাভ করিলেন। ডুপ্লে আরও দুই বৎসর যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ বা সাহায্যদান না করায় ডুপ্লে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ফরাসী ও ইংরাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল।

রবার্ট ক্লাইভ

এই সন্ধি অবশ্য স্থায়ী হইল না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতে ফরাসী ও ইংরাজগণ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বাঙলাদেশে

এবং মাদ্রাজে ইংরাজ ও ফরাসীগণ নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে সচেষ্ট হইল। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৭৫৭ খ্রীঃ) বাঙলাদেশে ইংরাজের চূড়ান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। অপর ইংরাজ সেনানায়ক ওয়াটসন চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। কর্ণাটকে ফরাসীগণ কিছু প্রাথমিক সাফল্যলাভ করিল। সেনাপতি বুসী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কতক অংশ অধিকার করিলেন। পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা কাউন্ট লালী ইংরাজের সেন্ট ডেভিড দুর্গ জয় করিলেন। কিন্তু কাউন্ট লালী তাঁহার স্বদেশ হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন পাইলেন না। অপরপক্ষে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতের ইংরাজগণকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফলে ফরাসীগণ সর্বত্র পরাজিত হইতে লাগিল। ক্লাইভের নির্দেশে সেনাপতি কর্ণেল ফোর্ড বাঙলাদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া মুসলিপত্তম অধিকার করিলেন। নিজাম ফরাসীগণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন এবং ফরাসীগণ তাঁহার রাজ্যে যে সমুদয় জায়গীর ভোগ করিতেছিল তাহা ইংরাজকে দান করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকূট বন্দিবাসের যুদ্ধে (১৭৬০ খ্রীঃ) কাউন্ট লালীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। পরবৎসর পণ্ডিচেরীর পতন হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইলে, ভারতে ফরাসীগণ তাহাদের হৃতস্থানগুলি ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। ইংরাজ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল।

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ

ইংরাজের সাফল্য

ত্রয়োদশ অধ্যায় | বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রসার ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্য তখন নিতান্ত হীনবল। পেশোয়া বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠাশক্তি গৃহবিবাদে বিচ্ছিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজন্যগণ সিংহাসনের দাবীতে আত্মকলহে মত্ত। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নবাবগণ কার্যতঃ স্বাধীন এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বিব্রত। এই অস্থির পরিবেশের মধ্যে সুযোগ সন্ধানী এবং উন্নত প্রণালীর সমরবিদ্যায় নিপুণ পাশ্চাত্য জাতিগুলি ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজশক্তি অধিকারের প্ররোচনা লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি ভারতের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিকক্ষেত্রেও প্রাধান্য বিস্তার করে এবং দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধের কালে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরাজজাতি ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের পথে সুনিশ্চিত এবং দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়।

ক্লাইভের পরিচালনায় কর্ণাটকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুদ্ধে ফরাসীগণের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা সমূলেবিনষ্ট হয় এবং ইংরাজশক্তি মাদ্রাজ ও কর্ণাটকের প্রভুত্ব লাভ করে। বাঙলাদেশে সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় জীবনাবসানের পর ক্লাইভের অধিনায়কত্বে ইংরাজই কার্যতঃ পূর্বভারতের শাসনভার হস্তগত করে। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর নিযুক্ত হন (১৭৫৮ খ্রীঃ) এবং কলিকাতা ইংরাজের ভাবী ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়।

বাঙলাদেশে প্রভুত্ব

বাঙলার মসনদে মীরজাফরকে বসাইয়া ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভ্যানসিটার্ট কলিকাতার গভর্ণর নিযুক্ত হন। ইংরাজ কোম্পানী তাঁবেদার নবাব মীরজাফরের নিকট ক্রমেই অধিকতর অর্থ দাবী করিতে থাকে। তিনি দাবী মিটাইতে অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজেরা তাঁহাকে মসনদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে নবাবী প্রদান করিল। মীরকাসিম নবাবী লাভ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারী স্বত্ব দান করিলেন। মীরজাফর ইতিপূর্বেই কোম্পানীকে চব্বিশ পরগনার জমিদারী দান করিয়াছিলেন। শীঘ্রই ইংরাজেরা মীরকাসিমের উপর অসন্তুষ্ট হইল। নবাব ইংরাজবণিকগণের অন্যায় ব্যবহার হইতে দেশীয় বণিকগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পাটনার ইংরাজকুঠির অধ্যক্ষ এলিস অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া পাটনা অধিকার করিলে মীরকাসিম অনুচরবর্গ সমেত এলিসকে

বন্দী করেন। ইহার ফলে উভয় পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মীরকাসিম তাঁহার সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় পর পর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হন। অতঃপর মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হন। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি মুনরো এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। মীরকাসিম পলায়ন করেন এবং মীরজাফর দ্বিতীয়বার বাঙলার নবাব হন।

লর্ড ক্লাইভ ঃ রবার্ট ক্লাইভ ইতিমধ্যে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি কোম্পানীর গভর্নর হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভারতে আসিয়া লর্ড ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি করিলেন। এলাহাবাদের সন্ধির শর্তানুসারে সুজাউদ্দৌলা কোম্পানীকে নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ দান করিলেন। বার্ষিক ছাব্বিশলক্ষ টাকা কর এবং এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশের বিনিময়ে দিল্লীর মুঘল বাদশাহ শাহআলম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। পলাশীর যুদ্ধ জয় করিয়া ক্লাইভ যে ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবে রূপলাভ করিল। মাদ্রাজের 'উত্তর সরকার' ইতিপূর্বেই কোম্পানীর অধীন হইয়াছিল। লর্ড ক্লাইভ এই অঞ্চলের জন্যও বাদশাহী সনদ সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর আইনসিদ্ধ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরাজ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করিবার পর বাঙলার নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদের একটি সন্ধি চুক্তি হইল।

দেওয়ানী লাভ



ক্লাইভ

দেওয়ানীলাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাঙলাদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করিলেন। এই ব্যবস্থায় কোম্পানী রাজস্ববিভাগ, দেওয়ানী বিচারবিভাগ দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিল। বাঙলায় মহম্মদ রেজাখাঁ এবং বিহারে সিতাবরায় নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা নবাবের কর্মচারী হইলেও তাঁহাদের নিয়োগ কোম্পানীর অনুমোদনসাপেক্ষ হইল। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার নবাবের উপর থাকিলেও রাজস্ব ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় কার্যতঃ নবাবের কোন ক্ষমতাই রহিল না। দ্বৈতশাসনের কুফল মারাত্মকরূপে দেখা দিল।

দ্বৈতশাসন

ভারতে ইংরাজ উপনিবেশ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী দুইজন গভর্নর ভেরেলেস্ট(১৭৬৭-১৭৬৯ খ্রীঃ) এবং

কার্টিয়ার (১৭৬৯-১৭৭২ খ্রীঃ) এর আমলে বাঙলাদেশের শাসনব্যবস্থায় নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বাঙলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-১৭৭০ খ্রীঃ) এক ভীষণ দুর্ভিক্ষে বাঙলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মৃত্যু হইল। নবাব বা ইংরাজ কেহই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিলেন না।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রীঃ)ঃ অবস্থা বিবেচনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বাঙলার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ভারতে প্রেরন করিলেন। হেষ্টিংস ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব আরও বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। উপযুক্ত সুযোগও উপস্থিত হইল। মারাঠারাজ্যে গৃহবিবাদ দেখা দিলে রঘুনাথ রাও ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বোম্বাই এর ইংরাজ গভর্নর এবং কাউন্সিলের সহিত সুরাটে সন্ধি করিয়া ইংরাজকে সলসেটি ও বেসিন বন্দর দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার বিনিময়ে ইংরাজগণ রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু কলিকাতার কাউন্সিল হেষ্টিংসের আপত্তি সত্ত্বেও সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া রঘুনাথের প্রতিপক্ষ পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের সহিত পুরন্দরে সন্ধি করিল (১৭৭৬ খ্রীঃ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরাজগণ সলসেটি লাভ করিল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করায় ইংরাজেরা পুনরায় রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিল। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরাজগণ বরগাঁও এর সন্ধিতে রঘুনাথের পক্ষত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল। হেষ্টিংস বরগাঁওএর সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে মারাঠা ও ইংরাজের মধ্যে সলবাই-এর সন্ধি স্থাপিত হইল (১৭৮২ খ্রীঃ)। সলসেটি বন্দর ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইল।

মারাঠা যুদ্ধ



ওয়ারেন হেস্টিংস্

মারাঠা যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির সহিত ইংরাজগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলির সহিত ইংরাজদের চুক্তি হইয়াছিল যে হায়দর ও ইংরাজ পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করিবে। কিন্তু মারাঠাগণ হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরাজ হায়দরকে কোন সাহায্য দিল না। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ উপলক্ষে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতে ইংরাজগণ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে আক্রমণ করিল। হায়দর আলি ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। হায়দরের সেনাবাহিনী ফরাসী সেনাপতির পরিচালনায় মাদ্রাজের উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হইল। ইংরাজ সেনাপতি বেইলী পরাজিত হইলেন। হায়দর আলি

মহীশূর যুদ্ধ

মারাঠা এবং হায়দরাবাদের নিজামকে দলভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ভোঁসলাকে অর্থ দিয়া এবং নিজামকে ঘুণ্টুর অঞ্চল সমর্পণ করিয়া নিরস্ত করিলেন। ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণের বিপদ হইতে ইংরাজ উদ্ধার পাইল। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকূট একক হায়দর আলিকে পোর্টোনোভোর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন (১৭৮১ খ্রীঃ)। কিন্তু হায়দর আলির পুত্র টিপুর হস্তে ইংরাজসৈন্য পরাজিত হইল। এই সময় হায়দর পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার পুত্র টিপু মহীশূরের সুলতান হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ম্যাথুস সসৈন্যে বন্দী হইলেন। বহু ইংরাজবন্দীকে ধর্মান্তরিত করিয়া মুসলমান করা হইল। মাঙ্গালোর-এর সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল (১৭৮৪ খ্রীঃ)। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিজিত রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিল। হেষ্টিংসের বুদ্ধিবলে ভারতে ইংরাজের অস্তিত্ব এক বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।


হায়দর আলি

নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোম্পানীর অর্থাভাব দেখা দিল। অর্থাভাব মোচনের জন্য হেষ্টিংস অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার সহিত নূতন চুক্তি করিলেন। তিনি নবাবের সৈন্যদলকে সামরিক শিক্ষা দিবার অজুহাতে কয়েকটি জেলার রাজস্বের অধিকার নবাবের নিকট হইতে দান হিসাবে সংগ্রহ করিলেন। বারাণসীর করদরাজা চৈৎ সিংহ কোম্পানীকে বার্ষিক বাইশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। হেষ্টিংস চৈৎসিংহকে অপসারিত করিয়া বার্ষিক চল্লিশলক্ষ টাকা ইজারায় বারাণসীর শাসনভার চৈৎ সিংহের এক আত্মীয়কে দিলেন। উত্তর প্রদেশে ইংরাজের আধিপত্যের প্রতিবাদ করিবার কেহ রহিল না।


লর্ড কর্ণওয়ালিশ

লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৪--১৭৯৩ খ্রীঃ) ঃ হেষ্টিংসের পর গভর্ণর হইয়া আসিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। ক্লাইভ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস সেই ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া ঐ ভিত্তিকে

দৃঢ়তর করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনসংস্কার এবং ভূমিব্যবস্থা ভারতে ইংরাজ শাসনকে এক নূতনরূপ দান করিল। ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিয়া তিনি এক শ্রেণীর রাজভক্ত-জমিদারগোষ্ঠী সৃষ্টি করিলেন।

কর্ণওয়ালিশের আমলে মহীশূরের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সুলতান টিপু ইংরাজের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৮৯ খ্রীঃ)। পেশোয়া এবং নিজাম ইংরাজপক্ষে যোগদান করিলেন। সুলতান টিপু শ্রীরঙ্গপত্তন-এর সন্ধিদ্বারা (১৭৯২ খ্রীঃ) তাঁহার রাজ্যের অর্ধাংশ এবং তিনকোটি ত্রিশলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইলেন। জামীন স্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে কলিকাতায় আটক রাখা হইল। টিপুর রাজ্যাংশ ইংরাজ, পেশোয়া ও নিজামের মধ্যে বণ্টিত হইল। অবসর গ্রহণের পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে বিশ বৎসরের সনদ লাভ করেন।

স্যার জন শোর (১৭৯৫-১৭৯৮ খ্রীঃ): লর্ড কর্ণওয়ালিশের পর গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন স্যার জন শোর। দেশীয় রাজ্যগুলির পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিলেন। মারাঠাগণ নিজামের রাজ্যের অর্ধাংশ অধিকার করিলেও তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না। তবে অযোধ্যায় ইংরাজের অধিকার আরও কিছু বৃদ্ধি করিলেন। নবাব সাদাৎ আলিকে অযোধ্যার নবাবের পদে স্থাপিত করিয়া তিনি নবাবের নিকট হইতে এলাহাবাদ দুর্গ এবং বাৎসরিক ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা বৃত্তি সংগ্রহ করিলেন।

লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ): ওয়েলেসলী ছিলেন পুরাপুরি সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ভারতে বৃটিশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ভারতে আগমন করেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ববর্তী বড়লাট জন শোরের নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিয়া এক সক্রিয় আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করেন। ইহার নাম হইল "অধীনতা মূলক মিত্রতা" নীতি। যে সকল দেশীয় রাজা ইংরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবেন, তাঁহাদিগকে তিনটি শর্ত পালন করিতে হইবে—(১) মিত্র রাজা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিবেন;

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি



লর্ড ওয়েলেসলী

(২) ইংরাজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তাঁহারা অপর কোন রাজ্যের সহিত

রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না ; (৩) তাঁহাদের রাজ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখিতে হইবে এবং এই সৈন্যদলের ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করিবেন অথবা রাজস্বের একাংশ কিম্বা নগদ অর্থ ইংরাজ কতৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিবেন। ইহার পরিবর্তে ইংরাজ সরকার দেশীয় মিত্ররাজ্যকে গৃহশত্রু এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। এই নীতি গ্রহণ করিলে দেশীয় রাজার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে বটে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব ইংরাজ গ্রহণ করিবে।

মারাঠার ভয়ে ভীত নিজাম সর্বপ্রথমে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন। ফরাসীগণের দ্বারা শিক্ষিত তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে তিনি ভাঙ্গিয়া দিলেন। লর্ড ওয়েলেসলী টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। টিপু অসম্মত হইলে ইংরাজ ও নিজামের সম্মিলিত বাহিনী দুই দিক হইতে টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিল (১৭৯৯ খ্রীঃ) টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। টিপুর রাজ্যকে তিন ভাগ করা হইল। একভাগে প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশের এক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল ; এক ভাগ হায়দরাবাদের নিজাম লাভ করিলেন। অপর ভাগে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম-উপকূল ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইল।

চতুর্থ ইঙ্গমহীশূর যুদ্ধ



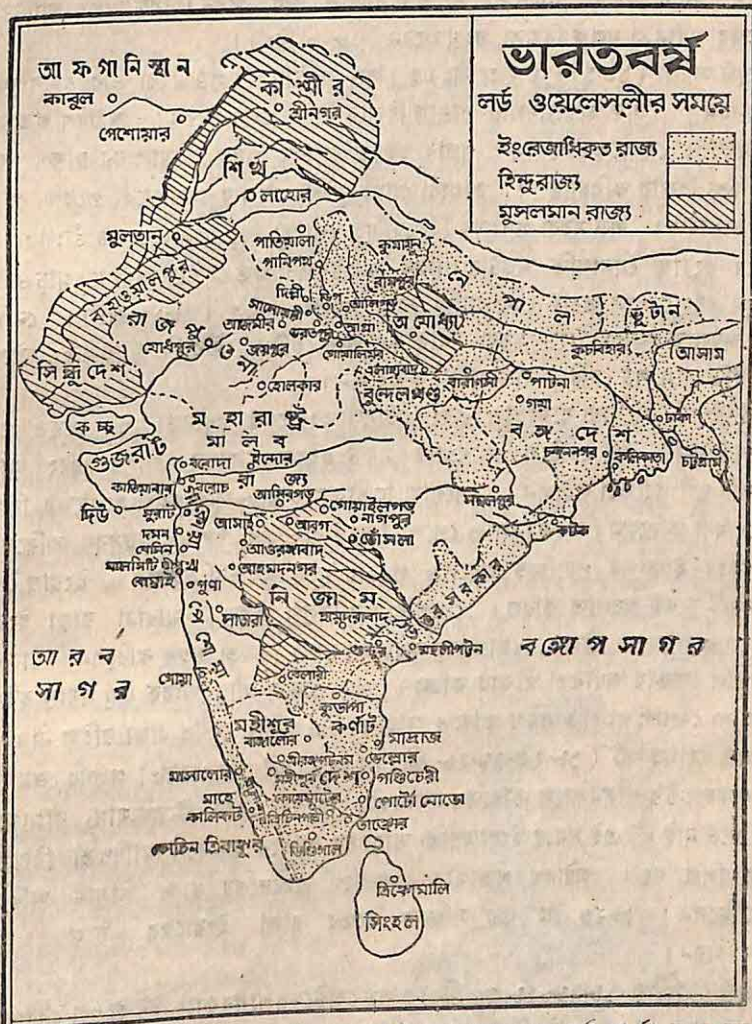
টিপু সুলতান

টিপুর পতনের পর লর্ড ওয়েলেসলী তাঞ্জোরের রাজা এবং সুরাটের নবাবেররাজ্য গ্রাস করিলেন। কর্ণাটের নবাবকে পদচ্যুত করিয়া কর্ণাটকরাজ্যকে অধিকার করিলেন। কুশাসনের অভিযোগ তুলিয়া অযোধ্যার নবাব সাদৎআলির নিকট হইতে গোরক্ষপুর এবং রোহিলাখণ্ড সমেত গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াবঅঞ্চল ইংরাজের রাজ্যভুক্ত করিলেন।

দেশীয় রাজ্য গ্রাস

এদিকে মারাঠারাজ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন। তিনি ইংরাজকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহার রাজ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন হইল। সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলার বিরুদ্ধে ওয়েলেসলী যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভোঁসলা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অধীনতা-মূলক মিত্রতা স্বীকার করিয়া উড়িষ্যার কটকঅঞ্চল ইংরাজকে সমর্পণ করিলেন। সিন্ধিয়াও ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী গঙ্গা-যমুনার দোয়াব ইংরাজকে প্রদান করিলেন (১৮০৩ খ্রীঃ)। মাত্র পাঁচমাসের মধ্যে বিশাল মারাঠা রাজ্যে ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও স্যার জর্জ বার্লো (১৮০৫-১৮০৭ খ্রীঃ)ঃ ওয়েলেসলীর পর লর্ড কর্ণওয়ালিশ দ্বিতীয়বার ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিন মাসের



মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শাসন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য স্যার জর্জ বার্লো নূতন বড়লাট নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বড়লাটের কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৮১৩ খ্রীঃ)ঃ অতঃপর লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে ভারতের অভ্যন্তরে কোন দেশীয় রাজার সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয় নাই। শিখরাজ্যের অধিপতি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধির ফলে বিনাযুদ্ধেই

পঞ্জাবে কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপিত হয়। ভারত মহাসাগরে ফরাসীগণের প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড মিণ্টো মরিশস এবং বুরবোঁ দ্বীপ অধিকার করেন (১৮১০ খ্রীঃ)। পরবৎসর ওলন্দাজগণের নিকট হইতে তিনি যবদ্বীপ জয় করেন। সিন্ধুদেশের আমীরগণ ইংরাজের অধীনতা মূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন (১৮০৯ খ্রীঃ)।

লর্ড ময়রা (১৮১৩-১৮২৩ খ্রীঃ)ঃ লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড ময়রা ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে নেপালের গুর্খাগণ পঞ্জাব হইতে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা প্রায়ই বৃটিশ রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন চালাইত। লর্ড ময়রা গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮১৪ খ্রীঃ)। দুই বৎসরে ইংরাজ সেনাপতি অকৃটারলোনির নিকট পরাজিত হইয়া গুর্খাগণ গাড়ওয়াল, কুমায়ুন এবং নেপাল তরাই কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিল (১৮১৬ খ্রীঃ)। নেপাল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড ময়রা 'মার্কুইস অব হেষ্টিংস' উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং ইতিহাসে লর্ড হেষ্টিংস নামে পরিচিত হইলেন।

ইতিপূর্বে পেশোয়া বাজীরাও এবং ভোঁসলা ইংরাজের অধীনতা মূলক মিত্রতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস পেশোয়ার নিকট হইতে কোঙ্কন প্রদেশ এবং আরও কয়েকটি দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভোঁসলাও পেশোয়া বাজীরাও-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। হোলকার ইতিপূর্বে পরাজিত হইলেও পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংরাজ সৈন্য সব কয়টি যুদ্ধেই জয়লাভ করিল। পেশোয়া পদ বিলুপ্ত হইল। মারাঠা রাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। হোলকার অধীনতা মূলক মিত্রতা গ্রহণ করিলেন। রাজপুত রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় অধীনতা স্বীকার করিল। লর্ড ওয়েলেসলীর আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত হইল। পঞ্জাব ও নেপাল ব্যতীত সমগ্র ভারতে আর একটিও স্বাধীন দেশীয় রাজ্য রহিল না।

লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-১৮২৮ খ্রীঃ)ঃ লর্ড হেষ্টিংসের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্যজয়ের ঘটনা ঘটে নাই। এই সময়ে ইংরাজশক্তি ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রহ্মদেশের রাজা আসাম অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীঃ এর সন্ধিতে ব্রহ্মের রাজা ইংরাজের হস্তে আসাম সমর্পণ করেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫ খ্রীঃ)ঃ লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার যে অধিকার কুড়ি বৎসরের জন্য লাভ করিয়াছিল তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পুনরায় আরও কুড়ি বৎসরের জন্য সনদ লাভ করে। এই নূতন সনদ বলে বাংলার বড়লাট সমগ্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট হইলেন। সপরিষদ বড়লাটকে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান করা হইল। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের জন্য একজন

লেফটেনাণ্ট গভর্নর বা ছোটলাট নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হইল। লর্ড বেন্টিঙ্ক হইলেন ভারতের প্রথম বড়লাট। লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে আসামে ইংরাজের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কাছাড় এবং জয়ন্তিয়া ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়।

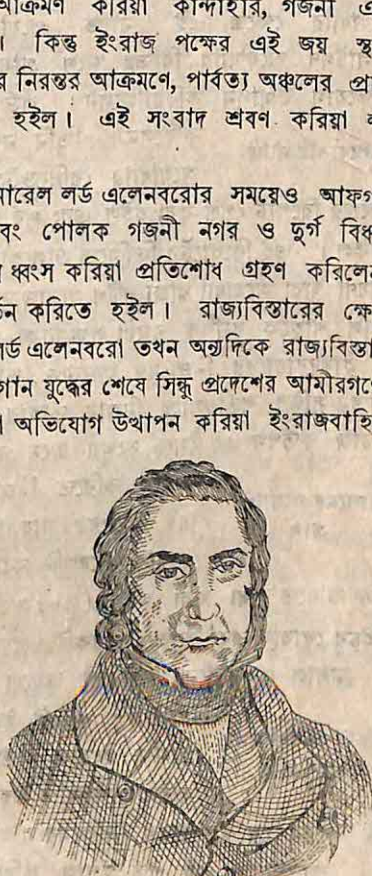
লর্ড অকল্যাণ্ড ঃ লর্ড বেন্টিকের পরবর্তী তিনজন বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-১৮৪২ খ্রীঃ), লর্ড এলেনবরো (১৮৪২-১৮৪৪ খ্রীঃ) এবং লর্ড হার্ডিং (১৮৪৪-১৮৪৮ খ্রীঃ) এর শাসনকালে ইংরাজের প্রভুত্ব পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিস্তৃত হয়। লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে আফগানিস্তানের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ, ইংরাজ আশ্রিত আফগানিস্তানের প্রাক্তন আমীর শাহ সুজা এবং ইংরাজ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া কান্দাহার, গজনী এবং কাবুল অধিকার করে। কিন্তু ইংরাজ পক্ষের এই জয় স্থায়ী হইল না। আফগানদের নিরন্তর আক্রমণে, পার্বত্য অঞ্চলের প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতে সমগ্র ইংরাজবাহিনী ধ্বংস হইল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড পদত্যাগ করেন।

আফগান যুদ্ধ ও ইংরাজের ক্ষতি

লর্ড এলেনবরো ঃ পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরোর সময়েও আফগান যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইংরাজ সেনাপতি নট এবং পোলক গজনী নগর ও দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া এবং কাবুলের বাজার কামানের গোলায় ধ্বংস করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ বাহিনীকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধে ইংরাজের কোনই লাভ হইল না। লর্ড এলেনবরো তখন অন্যদিকে রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলেন। আফগান যুদ্ধের শেষে সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ইংরাজবাহিনী সিন্ধু আক্রমণ করিল। ইংরাজ সেনাপতি নেপিয়ার অল্প আয়াসে সিন্ধুদেশ জয় করিলেন। সিন্ধুদেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল।

সিন্ধু বিজয়

লর্ড হার্ডিং (১৮৪৪-১৮৪৮ খ্রীঃ) ঃ লর্ড এলেনবরোর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিং-এর সময়ে রণজিৎ সিংহের শিখরাজ্য ইংরাজগণের অধিকারভুক্ত হইল। আইন সম্মতভাবে না হইলেও কার্যত ইংরাজশক্তি পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিল।


লর্ড ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রীঃ) ঃ ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়া লর্ড ডালহৌসী একদিকে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার, অন্যদিকে ভারতের শাসনব্যবস্থার

আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। তাঁহার কার্যক্রমের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে ইংরাজ শক্তির পূর্ণ অধিকার বা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হার্ডি-এর সময়ে প্রথম শিখযুদ্ধ পঞ্জাবে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ জয় করিয়া সমগ্র পঞ্জাবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। অযোধ্যা প্রদেশে অধীনতা মূলক মিত্রতার সুযোগ লইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ও স্যার জন শোর এবং লর্ড ওয়েলেসলী অযোধ্যা রাজ্যে ইংরাজ প্রভুত্ব ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস করিলেন।

লর্ড ডালহৌসীর প্রধান নীতি ছিল সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই পররাজ্য গ্রাস করা। এই নীতিবলেই তিনি ভারতে পঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশ ও পেগু অধিকার করেন। অযোধ্যার ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা হইল। ডালহৌসীর পূর্ববর্তী বড়লাটগণ অযোধ্যার বিভিন্ন অংশ গ্রাস করিবার কালে নবাবের বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসীও সেই পুরাতন পন্থা অনুসরণ করিলেন। তিনি নবাবের শাসন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য অযোধ্যার রেসিডেন্টকে আদেশ দান করিলেন। যথাসময়ে এই তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হইল এবং পূর্ব ব্যবস্থা মত তাহাতে নবাবের কুশাসনের উল্লেখ থাকিল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ডালহৌসী অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। এক ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যা রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নির্বাসিত করা হইল।

ডালহৌসীর নীতি

হায়দরাবাদের নিজামের ক্ষেত্রেও ডালহৌসীর আগ্রাসী নীতি প্রসারিত হইল। পূর্বতন সন্ধির শর্তানুসারে নিজাম তাঁহার রাজ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য পোষণ করিতেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এই সৈন্য সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়াছিল। ফলে তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করিতে নিজামের অসুবিধা হইতে থাকে। ডালহৌসী এই সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে নিজামের নিকট হইতে বেরার প্রদেশটি কাড়িয়া লইলেন। নিজামকে এক নূতন সন্ধি চুক্তি করিতে বাধ্য করা হইল (১৮৫৩ খ্রীঃ)। এই সন্ধির শর্তানুসারে বেরার প্রদেশ, রাইচুর দোয়াব এবং আরও কয়েকটি গ্রামের শাসনভার ইংরাজ সরকার গ্রহণ করিল।

নিজামের রাজ্যাংশ গ্রাস

নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত সিকিমের রাজা বার্ষিক খাজনায় দার্জিলিং শহরটি ইংরাজকে ইজারা দিয়াছিলেন। দার্জিলিং-এর স্থানীয় ইংরাজ কর্তা ক্যাম্পবেল হিমালয় দর্শনের জন্য সিকিমে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করেন। সিকিমের রাজা এই শর্তে অনুমতি দান করেন যে ক্যাম্পবেল সিকিমের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবেন না। ক্যাম্পবেল এই শর্ত অগ্রাহ্য করিলে সিকিমের রাজা তাঁহাকে বন্দী করেন। লর্ড ডালহৌসী অজুহাত পাইয়া দার্জিলিং এর খাজনা দান বন্ধ করিলেন এবং সিকিমের একাংশ অধিকার করিলেন।

দার্জিলিং ও সিকিমের একাংশ গ্রাস

দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিবার জন্য লর্ড ডালহৌসী অতঃপর এক নূতন নীতি প্রয়োগ করিলেন। ইহার নাম হইল "স্বত্বলোপ নীতি"। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তি অপুত্রক হইলে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতেন এবং ঐ দত্তক পুত্র তাঁহার সম্পত্তির আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃত হইত। লর্ড ডালহৌসী ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর ইংরাজ আশ্রিত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুত্রকে ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করা হইবে না। ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকার স্বত্বলোপ পাইবে এবং রাজ্যটি বৃটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যাইবে। এই নূতন নীতি প্রয়োগে লর্ড ডালহৌসী সাতারা, ঝান্‌সী, নাগপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জৈৎপুর এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিলেন। ইংরাজের বৃত্তিভোগী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে ডালহৌসী বৃত্তি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে ডালহৌসী নবাবের পদ বিলোপ করিলেন। তাঞ্জোর রাজ্য সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা কার্যকর হইল। বড়-লাট দিল্লীর মুঘল বাদশাহের উপাধিলোপের সংকল্পও করেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ তাহা অনুমোদন না করায় এই সংকল্প কার্যে পরিণত হইল না। স্বত্বলোপ নীতি অবশ্য ডালহৌসী উদ্ভাবন করেন নাই। তাঁহার ভারতে আগমনের বিশ বৎসর পূর্বে এই নীতিটি উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষও ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাটগণের তুলনায় লর্ড ডালহৌসী অধিকতর কঠোর ও ব্যাপকভাবে এই নীতিকে প্রয়োগ করেন।

স্বত্বলোপ নীতি

লর্ড ডালহৌসী রাজ্যবিস্তার এবং রাজ্যশাসন উভয় ক্ষেত্রেই অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তাঁহার শাসনকালে পশ্চিমে আফগানিস্তান সীমান্ত হইতে পূর্বে ব্রহ্মদেশের সলউইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পরিসর ভূভাগে ইংরাজের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেকের মতে ভারতের ইংরাজ বড় লাটগণের মধ্যে তিনিই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার শাসনকালেই ভারতে আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ হয়। ভারতে আগমনের পূর্বে লর্ড ডালহৌসী ইংলণ্ডের প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য, বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি এবং ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার সদস্য হইয়া শাসন কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ইষ্ট-কোম্পানীর পূর্বতন সনদের মেয়াদ শেষ হইয়া যায়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নিকট হইতে নূতন সনদ লাভ করে। এই সনদ বলে পার্লামেণ্টের পুনরাদেশ পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হস্তে রহিল। আইন-প্রণয়নের জন্য বারো জন সদস্য লইয়া একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইল। বাঙলার জন্য একজন ছোট লাট নিযুক্ত হইলেন।

কোম্পানীর নূতন সনদ লাভ

চতুর্দশ অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সংস্কার

(ক) কোম্পানীর রাজত্বকালে শাসন-সংস্কার

লর্ড ক্লাইভ বাঙলাদেশে যে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাহার ফল বিষময় হইয়াছিল। বাঙলায় শাসন বিভ্রাট এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থারই পরোক্ষ ফল। বাঙলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই ওয়ারেন হেষ্টিংস দ্বৈত শাসন প্রণালী রহিত করিলেন। তিনি রাজস্ব ও শাসন-বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন করিলেন। দেওয়ানীর কার্য হইতে রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়কে অবিলম্বে পদচ্যুত করিয়া ভূমি রাজস্বের নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি কালেক্টর নামে ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করিলেন এবং বাঙলা সরকারের রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। এখন হইতে কলিকাতা বাঙলাদেশের রাজধানী হইল। রাজস্ব বিভাগের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি 'রাজস্ব সমিতি' গঠিত হইল। পুরাতন জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল করিয়া ভূমি রাজস্ব নীলামে দেওয়া হইল। যে সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে খাজনা দিতে স্বীকৃত হইল, তাহাকেই পাঁচ বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হইল। এই নূতন ব্যবস্থার নাম হইল পাঁচশালা বন্দোবস্ত।

পাঁচশালা বন্দোবস্ত

রাজস্ব বিভাগের সংস্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস বিচার বিভাগেরও সংস্কার করিলেন। পুরাতন জমিদারগণের আদালত তুলিয়া দিয়া তিনি প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরের হস্তে দেওয়ানী আদালতের বিচার-ভার অর্পিত হইল। ফৌজদারী আদালতে এ-দেশীয় বিচারক নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য কলিকাতায় 'সদর দেওয়ানী আদালত' এবং 'সদর নিজামত আদালত' স্থাপিত হইল। গভর্ণর স্বয়ং সদর দেওয়ানী আদালতের অধ্যক্ষ হইলেন। সদর নিজামত আদালতে একজন মুসলমান কাজী নিযুক্ত হইলেন।

বিচার বিভাগের সংস্কার

শাসন-সংস্কার করিয়াই হেষ্টিংস ক্ষান্ত হন নাই। শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও তিনি উদ্যোগী হন এবং কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৭৮১ খ্রীঃ)। হেষ্টিংসের উৎসাহে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার জন্য স্যার উইলিয়ম জোনস্ কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮৪ খ্রীঃ) এবং সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বারাণসীতে রেসিডেণ্ট জোনাথন ডানকান একটি সংস্কৃত কলেজ

শিক্ষা-সংস্কার

স্থাপন করেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। হেষ্টিংসের নির্দেশে হলহেড সাহেব বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানী আইন-শাস্ত্র ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। হেষ্টিংসের উৎসাহে চার্লস উইলকিন্স্ বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপন করেন এবং ইংরাজী ভাষায় ভাগবদ্গীতার অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার সাধ্যমত সুশাসনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

ইংরাজ অধিকৃত ভারতের জন্য হেষ্টিংস যে শাসন-সংস্কারের সূচনা করেন, তাহা লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে আরও বিস্তৃত হয়। ক্লাইভ এবং হেষ্টিংস ভারতে ইংরাজ রাজত্বের পত্তন এবং প্রতিষ্ঠা করিলেও দুর্নীতির অভিযোগে উভয়েই ইংলণ্ডে অপদস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতস্থিত কর্মচারীগণ সকলেই অর্থ লোভে নানাপ্রকার অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

কর্ণওয়ালিশের শাসন সংস্কারঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত ব্যবসা, নজরানা, পুরস্কার, উৎকোচ দান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। উপযুক্ত কর্মীদের মনে আস্থা সঞ্চারের জন্য তিনি কয়েকজন বিশেষ দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীকে বরখাস্ত করিলেন এবং কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য পদমর্যাদা অনুসারে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্থির হইল যে কালেক্টরগণ মাসিক পনেরশত টাকা বেতন এবং আদায়ীকৃত রাজস্বের শতকরা একটাকা কমিশন হিসাবে পাইবেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী বড়লাট বাঙলাদেশকে পঁয়ত্রিশটি জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিশ এই সংখ্যা হ্রাস করিয়া তেইশ করিলেন। শাসনকার্যের জটিলতা নিবারণের জন্য তিনি সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই বিভাগ তিনটি হইল শাসন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ এবং বাণিজ্য বিভাগ। বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের দপ্তর পুনর্গঠন করিয়া আয়ব্যয়, পুলিশ প্রশাসন, ডাক ও শুল্ক ইত্যাদি শাখা বিভাগ স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক জেলাকে কয়েকটি থানায় এবং প্রত্যেকটি থানাকে কয়েকটি গ্রাম এলাকায় বিভক্ত করিয়া একজন দারোগাকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হইল। দারোগার অধীনে রহিল গ্রামের চৌকিদার। দারোগার মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা ধার্য হইল। তদুপরি ডাকাতি এবং নরহত্যার জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধীর বিচারে দণ্ড হইলে প্রত্যেক মামলার জন্য দশ টাকা পুরস্কার, এবং চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করিতে পারিলে উহার কিছু অংশ দারোগার প্রাপ্য হইল।

কর্ণওয়ালিশ বিচার বিভাগেও কিছু পরিবর্তন করিলেন। কালেক্টরের হস্তে কিছু ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার অর্পিত হইল। জেলা ফৌজদারী আদালত তুলিয়া দিয়া কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং পাটনার জন্য চারটি ভ্রাম্যমান আদালত স্থাপিত হইল। দুইজন ইংরাজ বিচারক, বিভিন্ন জেলায় বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ভ্রমণ করিয়া

হিন্দুপণ্ডিত ও মুসলমান কাজীর সাহায্যে বিচারকার্য সমাধা করিতে লাগিলেন। কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখিবার এবং ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড কার্যকর করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইল। কালেক্টর জেলার অভ্যন্তরে ইংরাজ সরকারের সর্বপ্রধান প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইলেন। দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ইংরাজ জজের পদ সৃষ্টি করা হইল। দুইশত টাকা পর্যন্ত দাবী সম্বলিত মামলার বিচারের ভার রেজিষ্ট্রার নামে এক দেশীয় কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনই কর্ণওয়ালিশকে ভারতের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়াছে। হেষ্টিংস প্রথমে এককালীন পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে প্রত্যেক বৎসরের জন্য জমি ইজারা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে কাহারও জমিতে স্থায়ী স্বত্ব না থাকায় কেহই জমির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিত না। জমির অস্থায়ী মালিকেরা প্রজাপীড়ন করিয়া অল্পকালের মধ্যেই যতদূর সম্ভব টাকা আদায়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইত। জমি নীলামে ইজারা দেওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত বটে, কিন্তু ইহাতে সরকারের কোন বৎসর কত আয় হইবে, তাহার স্থিরতা থাকিত না। লর্ড কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন তিনি প্রথমে দশশালা অর্থাৎ দশ বৎসরের জন্য জমি ইজারা দানের ব্যবস্থা করিলেন (১৭৮৯ খ্রীঃ)। পরে ইংলণ্ডের জমিদারী প্রথার অনুসরণে জমিতে জমিদারগণের স্বত্ব চিরকালের জন্য স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। জমিদারগণের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হইল। ঐ পরিমাণ রাজস্ব যথাসময়ে আদায় দিলে জমির ইজারা গ্রহণকারী পুরুষানুক্রমে জমির স্বত্বভোগ করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ লর্ড কর্ণওয়ালিশের এই ভূমি ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন। ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে প্রসিদ্ধ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথমে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এবং দুই বৎসর পরে বারাণসীতে প্রবর্তিত হইল। দেশে ইংরাজভক্ত একদল জমিদারের সৃষ্টি হইল।।



লর্ড বেণ্টিঙ্ক

বেণ্টিঙ্কের আমলে শাসন সংস্কারঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ শাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চপদে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ না করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকারী সমস্ত উচ্চ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। ঐ সকল বিদেশীয় ব্যক্তিগণ এদেশের লোকের প্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, এবং ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ায় কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত শাসন সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রদ

হয় নাই। লর্ড বেন্টিঙ্ক এ বিষয়ে পূর্বতন নীতি ত্যাগ করিয়া শাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চপদে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়গণকে নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। কোম্পানীর নূতন সনদে ঘোষণা করা হইল যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য ভারতবাসীকে শাসনকার্যের সকল বিভাগেই নিয়োগ করা যাইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত ভ্রাম্যমান প্রাদেশিক বিচারালয় গুলি লর্ড বেন্টিক তুলিয়া দিলেন। জেলায় কালেক্টরগণের উপর ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার অর্পন করা হইল। আদালতের কাজকর্মে ফরাসী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হইল। ভারতীয়গণের জন্য সাবজজের পদ সৃষ্টি করা হইল।

বিচারবিভাগের সংস্কার

ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে কোম্পানীর তহবিলে অর্থাভাব দেখা দিয়াছিল। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য লর্ড বেন্টিক বহু রাজকর্মচারীর বেতনও ভাতা হ্রাস করিয়া দিলেন। সৈন্যদলের ভাতা হ্রাস করা হইল। আয় বৃদ্ধির জন্য বেন্টিঙ্ক মালবের আফিম এর উপর শুল্ক ধার্য করিলেন। মাদ্রাজে ও আগ্রায় ভূমিরাজস্বের নূতন বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি হইল।

ব্যয় সঙ্কোচ ও আয়বৃদ্ধি

শাসন সংস্কার অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের জন্যই লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। মুঘল বাদশাহ্ আকবর এবং ঔরঙ্গজীব সতীদাহ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। ইংরাজ রাজত্বকালে বাঙলা দেশে সতীদাহ প্রথা এতবেশী প্রসারলাভ করিয়াছিল যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একবৎসরে সাতশত সতীদাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাঙালী জননায়কের সহযোগিতা লাভ করিয়া লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘোষণা করিলেন যে সতীদাহের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কঠোর দণ্ডদান করা হইবে (১৮২৯ খ্রীঃ)। এই ঘোষণার ফলে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রহিত হইল।

সমাজ সংস্কার

ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও লর্ড বেন্টিঙ্কের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট নির্দেশ দিয়াছিল যে, ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক বৎসর সরকারী তহবিল হইতে অন্ততঃ পক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে এইজন্য বার্ষিক দশলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইল। আইন সচিব মেকলের পরামর্শ অনুসারে স-পারিষদ বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট সরকারী অর্থ কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারী অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইল। কলিকাতায় একটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইল। সরকারী আনুকূল্যে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসার সুগম হইল।

লর্ড ডালহৌসীর আমলে শাসন সংস্কার ঃ মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হইলেও লর্ড ডালহৌসী ভারতের শাসন পদ্ধতির উন্নতি বিধান এবং ভারতীয় প্রজাগণের কল্যাণ

সাধনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন করিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নিকট হইতে সনদ লাভ করে। ইতিপূর্বে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতের জন্য সিভিল সার্ভিস নিয়োগের জন্য ইংলণ্ডে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

জনহিতকর আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

পথঘাট, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি কার্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য ডালহৌসী একটি পূর্তবিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শেরশাহ নির্মিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটির সংস্কার এবং গঙ্গার খাল খনন সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার শাসনকালেই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়, টেলিগ্রাফ বা তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয় এবং এক আনা মাশুলে ভারতের সর্বত্র পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

সমাজ সংস্কার

সমাজ সংস্কারের প্রতি লর্ড ডালহৌসী বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাবী আমলে রাজা রাজবল্লভ বাঙলাদেশে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিলে বড়লাট হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বিবাহ অনুমোদন করিয়া আইন প্রবর্তন করেন। ইতিপূর্বে দেশীয় নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। লর্ড ডালহৌসী আইন দ্বারা এই ব্যবস্থা রহিত করেন।

শিক্ষাবিস্তার

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর পরিচালক সমিতির সভাপতি স্যার চার্লস উড ভারতে শিক্ষা বিস্তারে জন্য এক নির্দেশ প্রেরণ করেন। এই নির্দেশ পত্র লাভ করিবামাত্রই লর্ড ডালহৌসী তদনুসারে কার্য আরম্ভ করেন। তিনি শিক্ষাবিভাগ সৃষ্টি করিয়া দেশের নানাস্থানে বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ব্যবস্থার ফলেই পরবর্তী বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।



লর্ড রিপন

লর্ড রিপনের আমলে শাসন সংস্কার : লর্ড রিপনের শাসনকাল (১৮৮০-১৮৮৪ খ্রীঃ) ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি ভারতে আদমসুমারী বা লোক গণনার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা গণনা করা হয় এবং স্থির হয় যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর এইরূপ লোকগণনা করা হইবে। শিশু-শ্রমিকদের নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কারখানা আইন প্রবর্তন করেন। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য তিনি রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ পুনর্গঠন করেন। জমিদারগণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি

প্রজাস্বত্ব আইনের যে খসড়া প্রস্তুত করেন, তাহা পরবর্তী বড়লাট লর্ড ডাফরিণের সময় বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়। দরিদ্র জনসাধারণের কষ্ট লাঘবের জন্য লর্ড রিপন লবণ শুল্ক হ্রাস এবং বস্ত্র শুল্ক রহিত করেন। পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড লিটন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া "দেশীয় সংবাদপত্র আইন" প্রবর্তন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপন এই আইন বাতিল করিয়া ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে স্বাধীন মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার দান করেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি এক কমিশন নিয়োগ করেন। ইহা 'হাণ্টার কমিশন' নামে প্রসিদ্ধ। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

নানাবিধ সংস্কার

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া লর্ড রিপন বিশেষ গৌরব অর্জন করেন। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের পর বহু ভারতবাসী উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইয়াছিল। তাঁহারা রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। লর্ড রিপন শিক্ষিত ভারতবাসীর এই নবজাগ্রত রাজনৈতিক আশাআকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। শাসনবিষয়ে ভারতবাসীকে অধিকার দানের উদ্দেশ্যে তিনি 'বঙ্গীয় পৌরশাসন আইন' বিধিবদ্ধ করেন (১৮৮৪ খ্রীঃ)। এই আইনে পৌর এলাকার করদাতাগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার লাভ করেন এবং পৌরসভার জন্য বেসরকারী সভাপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। লর্ড রিপন প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা পরিষদ এবং প্রত্যেক মহাকুমায় একটি লোকাল বোর্ড বা স্থানীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিষদগুলির হস্তে স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পথঘাটের ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইল।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

বিচার ক্ষেত্রে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে সমতা স্থাপনের জন্য লর্ড রিপণের নির্দেশে আইন সচিব ইলবার্ট এক আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইহা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এতকাল কোন ভারতীয় বিচারক কোন ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিত না। তাহাদের জন্য ইউরোপীয় বিচারক নিযুক্ত হইতেন। এক্ষেত্রে প্রায়ই পক্ষপাতিত্বের ফলে বিচার বিভ্রাট ঘটিত। লর্ড রিপণ এই ব্যবস্থা রহিত করিতে মনস্থ করেন। স্বার্থান্ধ ইউরোপীয় মহল এই বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাইল। অবশেষে এক মধ্যপন্থা অবলম্বিত হইল। স্থির হইল যে ভারতীয় বিচারক ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিবেন, তবে বিচারকালে তাঁহাকে শ্বেতাঙ্গ জুরীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

ইলবার্ট বিল

(খ) ভারতবাসীর উদ্যোগে সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মসংস্কার

ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যেমন শাসন সংস্কার বিষয়ে সচেতন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা ভারতীয় সমাজ

ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিশ, বেণ্টিঙ্ক, ডালহৌসী প্রভৃতি কোম্পানীর নিযুক্ত লাটসাহেবগণ যেমন শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তেমনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সংস্কারেও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। শাসন সংস্কার সরকারী আদেশ বলে কার্যকর হয়, কিন্তু শুধুমাত্র আইন পাশ করিয়া সমাজ সংস্কারমূলক ব্যবস্থা সুফল দায়ী করা যায় না। এজন্য সমাজের অভ্যন্তর হইতেই আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। সমাজের মধ্য হইতেই কোন সংস্কারপন্থী স্বাদেশিক ব্যক্তির উদ্ভব না হইলে, কোন বিদেশীর পক্ষে, শুভাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। পরাধীন ভারতের সৌভাগ্যক্রমে দেশের মধ্য হইতেই একদল স্বজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী মনীষীর আবির্ভাব হয়। পাশ্চাত্য সামরিক শক্তি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সংঘাতে এদেশে যে পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য ইহারা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং পরিবর্তিত পরিবেশে এদেশের প্রথানিবদ্ধ সমাজ ও ধর্মাদর্শের পরিমার্জনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রথাগত অন্ধ-সংস্কারের প্রাচীর ভাঙিয়া ইহারা স্বাধীন চিন্তার মুক্ত প্রবাহে সমাজদেহকে নির্মল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই সকল মনীষীর প্রবর্তিত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার আইনগত অনুমোদন দানের কীর্তি অর্জন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বাঙালী হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষা এবং অগ্রগতির জন্য সমাজসংস্কার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙালীর অদম্য প্রাণশক্তি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষে কয়েক শতাব্দীর জড়তা ত্যাগ করিয়া নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতির অগ্রবর্তী নায়ক হইলেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩ খ্রীঃ) : বাঙলাদেশের হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহনের জন্ম হয়।



রামমোহন রায়

বহুমুখী প্রতিভাবলে ধর্ম ও সমাজসংস্কার, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, বাঙালাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন প্রভৃতি বহুবিধ জনহিতকর কার্যে আজীবন লিপ্ত থাকিয়া রামমোহন রায় ভারতে নবযুগ প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। বাল্যকালে তিনি পাটনায় বাস করিবার সময় আরবী ও ফারসী ভাষা এবং পরে বারাণসীতে গিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র আয়ত্ত করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংরাজী, ফরাসী, গ্রীক, লাতিন এবং ইহুদী ভাষা শিক্ষা করেন। বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি

লাভ করিয়া রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার রচনা করেন এবং উপনিষদসমূহ ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহার ফলে তাঁহার যশ ইউরোপেও বিস্তৃত হয়।

হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রামমোহন সুনিশ্চিত হন যে হিন্দুগণের পক্ষে বহু দেবদেবীর পূজা করা কিম্বা পৌত্তলিক হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক নহে। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ একেশ্বরবাদ সমর্থন করে এবং বৈদিক যুগে মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল না। অতএব রামমোহন হিন্দু সমাজে একেশ্বরবাদ প্রচলন এবং পৌত্তলিকতা নিবারণে উদ্যোগী হন। একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তিনি প্রথমে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করেন (১৮১৫ খ্রীঃ)। পরে "ব্রহ্ম সমাজ" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে (১৮২৮ খ্রীঃ)।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে বেদ ও উপনিষদ পাঠ, বেদের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত হইত। ব্রাহ্ম সমাজের জন্য রামমোহন একটি উপসনাগৃহ নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্দেশ ছিল 'জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় সামাজিক পদ বিচার না করিয়া যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত সৃষ্টি কর্তা পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন। তবে এখানে কোন সাম্প্রদায়িক নামে ভগবানের পূজা করা চলিবে না, কোন প্রকার মূর্তি বা চিত্র ব্যবহৃত হইবে না, প্রাণিহিংসা কিম্বা পান ভোজন হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের বিষয়ে ধ্যান ধারণার প্রসার হয়, সুনীতি, প্রেম, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, তদুপযোগী উপদেশ বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।'

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া রামমোহন যেমন একদিকে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি কঠোর আঘাত করেন, অপরদিকে তেমনই খ্রীষ্টান পাদরীগণের অপপ্রচারের বিরোধিতা করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেন। মূঢ়ের মত প্রচলিত প্রথা অনুসরণ না করিয়া তিনি যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিতেন। ইহার ফল সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের আচার হইতে কু-প্রথা গুলিকে উচ্ছেদ করিবার

সমাজ সংস্কার

জন্য রামমোহন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য তাঁহার প্রয়াস বিশেষ ভাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। বাল্য-বিবাহ রোধ, নারী স্বাধীনতা ও নারী শিক্ষার প্রসার রামমোহনের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। নিজ ব্যয়ে তিনি একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় সরকারী অর্থে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইল রামমোহন তাহার বিরোধিতা করিয়া বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "যদি এ দেশবাসীর মানসিক উন্নতি ও উদার

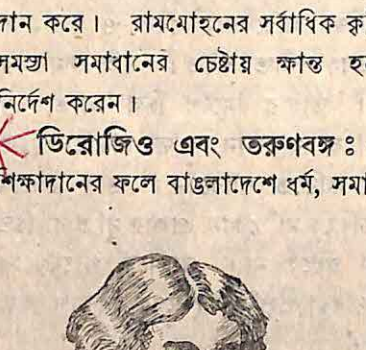
শিক্ষা-বিষয়ক মত

জ্ঞানলাভই সরকারের লক্ষ ও আদর্শ হয় তবে আধুনিক ও উন্নত পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, শরীর সংস্থান বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক পরিচালিত একটি কলেজ স্থাপন এবং ইহার সঙ্গে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে।" আইন সচিব মেকলে ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করিলে রামমোহন উহা সমর্থন করেন।

ধর্ম ও সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার যেমন রামমোহনের লক্ষ ছিল, তেমনই স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ এবং জাতীয়তাবোধের প্রসারের জন্যও তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা নিরলস ছিল। এ বিষয়ে তিনিই প্রথম ও প্রধান পথ প্রদর্শক। শাসন ব্যাপারে নূতন নূতন অধিকার লাভের জন্য জনমত গঠন করিয়া আইনসম্মত উপায়ে সরকারের নিকট দাবী উত্থাপন করিবার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর নামে মাত্র মুঘল বাদশাহ তাঁহার স্বপক্ষে কিছু ওকালতি করিবার জন্য রামমোহনকে রাজা উপাধি দান করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। স্বাধীনতার স্বপক্ষে রামমোহনের বক্তব্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান দান করে। রামমোহনের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, তিনি কেবলমাত্র দেশের সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ক্ষান্ত হন নাই, জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও পন্থাও নির্দেশ করেন।

স্বাধীনতার অগ্রদূত

ডিরোজিও এবং তরুণবঙ্গঃ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষাদানের ফলে বাঙলাদেশে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিভাগে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা এ বিষয়ে আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ছাত্রগণের মধ্যে সর্বসংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ যাহাতে হয় তাহার জন্য এই কলেজের তরুণ অধ্যাপক লুই হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রী:) সর্ব প্রকারে চেষ্টা করিতেন। ডিরোজিও মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পাঁচ বৎসর এই কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার ছাত্রগণের উপর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যেমন কলেজের মধ্যে তেমনি কলেজের বাহিরেও তিনি ছাত্রগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতেন এবং বিতর্ক ও আলোচনা সভা এবং কলেজের পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে অবহিত করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রগতিশীল মতবাদ আলোচনার জন্য ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রগণকে লইয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করেন। এই সমিতির অধিবেশনে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস সমাজ সংস্কার, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, পৌত্তলিকতা, পাপ-পুণ্য, পুরোহিত সম্প্রদায়, স্বদেশ প্রীতি, নারীশিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিয়া তিনি যুক্তি তর্কের সাহায্যে সংস্কারমুক্ত মতামত ব্যক্ত করিতেন এবং



ভিভিয়ান ডিরোজিও

মতবাদ

তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীকেও এই সব বিষয়ে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে চিন্তা করিতে উৎসাহিত করিতেন। যুক্তিবাদী ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমিতে শিক্ষালাভ করিয়া ডিরোজিও যুক্তিবাদী হইয়া উঠেন। তাঁহার শিক্ষার মূল কথা ছিল—"জীবনে সর্বদা সত্যের অনুসরণ করিবে, যাহা কিছু অন্যায় ও অসৎ তাহা পরিহার করিবে। কোন প্রথাগত সংস্কার অন্ধ-ভাবে অনুসরণ করিবে না, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা জীবনে মত ও পথ নির্বাচন করিবে। সর্বদাই সকল প্রকার সদ্‌গুণের অনুশীলন করিবে।" তিনি তাঁহার ছাত্রদের নিকট ইতিহাস হইতে দেশপ্রেম, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতা ও স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্তগুলি তুলিয়া ধরিতেন এবং এমন উদ্দীপনাময় স্বচ্ছন্দ কথাবার্তায় সেগুলি ব্যক্ত করিতেন যে, ছাত্রগণের চিত্তে তাহা গভীর ভাবে রেখাপাত করিত।

ফ্রান্সিস ডিরোজিও এবং সোফিয়া জনসনের পুত্র হেনরীলুই ডিরোজিও কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া নিজেকে ভারতীয় বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার ছাত্র-মণ্ডলীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করিতেন। দেশপ্রেম বলিতে বর্তমানে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাঙালীর চিত্তে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। ডিরোজিওর নিকট হইতেই আমরা এ বিষয়ে প্রেরণালাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রদল প্রগতিশীল উদারপন্থী হইয়া উঠে এবং তরুণবঙ্গের অভ্যুদয় হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনুলাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারি চাঁদ মিত্র প্রভৃতি প্রতিভাবান ছাত্রগণ বিতর্কের মাধ্যমে প্রগতির স্বপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করিতেন। ডিরোজিওর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কলিকাতায় আরও সাতটি বিতর্ক সভা স্থাপিত হয় এবং ডিরোজিও ইহাদের প্রত্যেকটিতেই যোগদান করেন। তাঁহার উপদেশ ছাত্রসমাজের মধ্যে কার্যকর হইয়া প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতি ছাত্রগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

প্রভাব

ডিরোজিও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাঁহার প্রভাব ছাত্রমহলে থাকিয়া যায়। 'তরুণবঙ্গ' নামে আখ্যাত ডিরোজিওর শিষ্য সম্প্রদায় ডেভিড হেয়ার এর সহিত যুক্ত হইয়া 'এপিসোলারি এসোসিয়েশন' এবং 'সাধারণজ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল অধীত বিদ্যার অনুশীলন এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়। দ্বিতীয়টি এদেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ইহার পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ বঙ্গের সভ্যগণ জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এই সোসাইটির সম্পাদক হন। রামগোপাল ঘোষ, তাঁরাচাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার সভ্য হন। কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার সংস্কার দাবী এই সোসাইটির অন্যতম কর্মসূচী ছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'বেথুন সোসাইটি' এবং 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান সভার' সহিতও তরুণবঙ্গের

তরুণবঙ্গের কার্যকলাপ

অনেকে সহযোগিতা করেন। বাঙলাদেশের বাহিরেও তরুণবঙ্গের কার্যকলাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যায় 'তালুকদার সভা' প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন (১৮৬১ খ্রীঃ)।

পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা জনমত গঠন এবং জনশিক্ষা বিস্তার তরুণবঙ্গ সমাজের প্রধান লক্ষ ছিল। হিন্দু কলেজে পাঠের সময়েই তাঁহারা 'পার্থিনন' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'এনকোয়ারার' নামে পত্রিকা, দক্ষিণারঞ্জন প্রকাশ করেন 'সমাচার হিন্দুস্থানী' এবং 'ভারত পত্রিকা', রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ করেন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা, রামগোপাল প্রকাশ করেন 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'; প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদনা করেন 'মাসিক পত্রিকা'।

পত্রিকা প্রকাশ

শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারে তরুণবঙ্গের উদ্যম ছিল প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশানাল লাইব্রেরী) প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা জড়িত ছিলেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার গ্রন্থাগারিক রূপে ইহাকে বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেন। বস্তুত সাহিত্য সাধনা, শিল্পবাণিজ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি, শিক্ষা ও শাসনসংস্কার, সমাজ সংগঠন প্রভৃতি প্রগতিশীল নানাবিষয়ে তরুণবঙ্গের সভ্যগণ যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতেই বাঙলা দেশ তথা ভারতের জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

শিক্ষা বিস্তার নানামুখী উদ্যোগ

ব্রাহ্ম সমাজ ও উহার নেতৃবৃন্দ ঃ রাজা রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যগণ নানাবিধ সমাজসংস্কার প্রবর্তন করিয়া বাঙলার নবজাগরণকে সার্থক ও সুচিরস্থায়ী করিয়া তুলিলেন।



দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ঃ রামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ' এর পত্তন করিলেও কোন নূতন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠনের অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। দেবেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'ব্রাহ্মসমাজ' এর রূপান্তর ঘটাইয়া ব্রাহ্মসম্প্রদায় সৃষ্ট করিলেন। প্রতিমা পূজা বর্জন ও একেশ্বরবাদ যে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত, রামমোহন ইহাই প্রমাণ ও প্রচার করিতেন। তাঁহার উপাসনা মন্দিরের অধিবেশনে যোগদানের জন্য কাহাকেও ইহার নিয়মিত সভ্য বা সদস্য হইতে হইত না। দেবেন্দ্র নাথ ব্রাহ্মসমাজের জন্য সভ্যপদ প্রবর্তন করিলেন।

তিনি স্থির করিলেন যে, যাঁহারা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া একেশ্বর বাদী হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবেন, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই ব্রাহ্ম সমাজে গ্রহণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকটি বিধি সম্বলিত এক প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি একুশজন এবং পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে আরও পাঁচশতজন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার মন্ত্র হইল উপনিষদ হইতে গৃহীত কয়েকটি বচন 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি এবং শান্তম্ শিবমদ্বৈতং', এইরূপে রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন "বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য তাহা লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম সংগঠিত হইল।"

ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রীঃ): কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরর সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি অধ্যক্ষ সভা গঠন করেন এবং কেশচন্দ্র তাহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষাদানের জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় এবং কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী ভাষণ এবং প্রবন্ধাবলী বহু যুবককে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি সেকালের বহু প্রতিভাবান যুবক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচীকে আরও



কেশবচন্দ্র সেন

প্রসারিত করেন এবং ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যে ব্রতী হন। তাঁহার উদ্যোগে ধর্মালোচনার জন্য 'সঙ্গতসভা' এবং সমাজ উন্নয়নের জন্য 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' স্থাপিত হয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত অঞ্চলে ত্রাণ ও সেবা কার্য পরিচালনা করা, জনসাধারণের মধ্যে এবং অন্তঃপুরে নারীগণের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি জনহিতকর কার্যাবলী ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচীর অন্তর্গত হয়। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বিধানের জন্য কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য সভায় মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ভাষণে তিনি নীতি ধর্মমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। দেশবাসীকে নীতিধর্ম শিক্ষাদানের জন্য ইংলণ্ড হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া 'কলিকাতা কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেশবচন্দ্র ইহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'

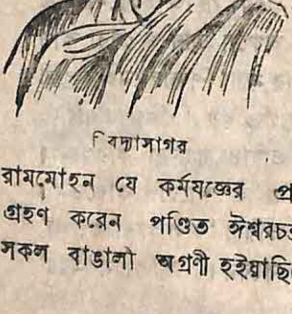
নামে একখানি ইংরাজী পাক্ষিক পত্র এবং 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্র পরিচালনার ভারও কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন।

ধর্মপ্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। মাদ্রাজ, পুণা, বোম্বাই, কালিকট প্রভৃতি স্থানে তাঁহার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া ধর্মসমাজ স্থাপিত হয়। বাঙলাদেশের নানাস্থানে, আসাম, বিহারে, অযোধ্যায়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, সিন্ধুদেশে ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয় এবং ইংরাজী ও প্রাদেশিক ভাষায় একুশটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে সমগ্র ভারত ব্যাপী যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্র ধর্মনীতিক্ষেত্রে তাহার সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬৬ খ্রীঃ)। তরুণ সদস্যবৃন্দ জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীজাতির অবরোধ বা পর্দা প্রথা বিলোপ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক কার্যে অগ্রসর হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

ধর্মপ্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডেও গমন করেন। বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলক, ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল, ইংরাজ রাষ্ট্রনায়ক গ্ল্যাডস্টোন, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাদর সাহচর্যলাভ করিয়া কেশবচন্দ্র সাত মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নানাবিধ সমাজ সংস্কার মূলক কার্যে আরও অধিক সময় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রমিকগণের শিক্ষা ও মানসিক উন্নতি, জনসাধারণের জন্য স্বল্পমূল্যে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি লোক হিতকর ব্যাপার তাঁহার কর্মসূচীর অন্তর্গত হয়। তিনি এক পয়সা মূল্যে 'সুলভ সমাচার' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং শ্রমিক গণের জন্য নৈশবিদ্যালয় এবং অসহায়া বিধবা নারীগণের জন্য 'বিধবাশ্রম' স্থাপন করেন।

সমাজসেবা



বিদ্যাসাগর

ব্রাহ্মধর্মকে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উপযোগী এক বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত করিবার জন্য কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষভাগে 'নববিধান' নামে এক সমন্বয়মূলক ধর্মমত প্রচার করেন। নববিধানের মধ্যে তিনি হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ, শৈবের শক্তি উপাসনা ও খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সার সত্যগুলি র সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

নববিধান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রীঃ) ঃ এদেশে শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের জন্য রামমোহন যে কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে তাহার নায়কত্ব গ্রহণ করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে যে সকল বাঙালী অগ্রণী হইয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন। তাঁহারই

সহযোগিতায় ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন (বেথুন সাহেব) বাঙলাদেশে কলিকাতায় প্রথম নারী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৪৯ খ্রীঃ)। শিক্ষা বিভাগে তিনি কিছুকাল বিদ্যালয় পরিদর্শকের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় ছয় মাসের মধ্যে কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই চারটি জেলায় তিনি পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হইল কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইন্‌সটিটিউসন (বর্তমানে ইহার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ)। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং বাঙালীর পরিচালনায় কলেজ স্থাপন এই প্রথম।

শিক্ষা বিস্তার

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজের প্রশাসন ব্যবস্থা ও পাঠ্য সূচীর সংস্কার করেন। সংস্কৃত কলেজে এতকাল কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের শিক্ষালাভের অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগর এই কলেজের দ্বার কায়স্থ এবং ভদ্রশ্রেণীর সকল হিন্দু ছাত্রের জন্যই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথিতে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাদান বন্ধ থাকিত। এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া তিনি সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারঃস্থির করিলেন। পাঁজি পুঁথির প্রভাব মুক্ত করিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া তুলিলেন। ইংরাজীতে গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা হইল এবং ইংরাজাভাষা অবশ্য পাঠ্য হইল। সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের সঙ্গে ইংরাজ দার্শনিক মিল লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ্যক্রমের অন্তভুক্ত হইল। একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরাজী অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইবার ফলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধনের সুযোগ লাভ করিল। দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধ বোধ' এর পরিবর্তে তিনি বাংলা ভাষায় 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতি সহজ করিয়া দিলেন।

শিক্ষা সংস্কার

জন-শিক্ষার প্রসার কল্পে বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে উদ্যোগী হইলেন। বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা ও চরিতাবলী রচনা করিয়া তিনি বাঙলা ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিলেন। সীতার বনবাস, শকুন্তলা, আখ্যান মঞ্জরী, বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া বাঙলা গদ্য ভাষার রূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বাংলা গদ্যই বর্তমান কালের লিখিত সাধু ভাষা।

যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমনি সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। বাঙলার বিধবাগণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। হিন্দু শাস্ত্র ঘাঁটিয়া তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্র বচন উদ্ধার করিলেন। পত্র পত্রিকায় এবং পুস্তিকাতে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন এবং এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর যুক্ত এক আবেদন পত্র সরকারের নিকট পেশ করিলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য গোঁড়া হিন্দুর দল তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু নির্ভীক বিদ্যাসাগর সংকল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। অবশেষে বহু বাদ-

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন

বিসংবাদের পর ইংরাজ সরকার বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়" বিদ্যাসাগর এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজ পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের সহিত এক বিধবা বালিকার বিবাহ দিয়া আদর্শ স্থাপন করেন। বহু বিবাহ নিবারণের জন্যও বিদ্যাসাগর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সফল হইতে পারেন নাই।

অ্যানুয়িটি ফাণ্ড

আর একটি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। উপার্জনক্ষম গৃহস্থের মৃত্যুতে তাহার পরিবারবর্গ যাহাতে নিতান্ত অসহায় না হইয়া পড়ে, তাহার জন্য তিনি আধুনিক বীমা ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপে এক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি '১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে' 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ সমাজ সংগঠক হিসাবে বিদ্যাসাগর ছিলেন অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী।

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রীঃ): ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয়গণের দ্বারা সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র হিন্দুগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলমান সমাজেও এই প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের বিস্তার প্রধানতঃ মুসলমান শাসনাধিকারের বিলোপের ইতিহাস। বাঙলা, অযোধ্যা, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান শাসক শ্রেণীকে পরাভূত ও অপসারিত করিয়া ইংরাজ শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল। এইজন্য মুসলমান সম্প্রদায় ইংরাজদের প্রতি বিরাগ পোষণ করিত। হিন্দু জনসাধারণ, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেমন সহজে ইংরাজের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া সরকারী চাকুরীতে যোগদান করে, মুসলমান সম্প্রদায় তাহা করে নাই। তাহারা পুনরায় মুসলমান শাসন প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত এবং এই কারণে ইংরাজ সরকারের সুনজর তাহাদের প্রতি ছিল না। শিক্ষা এবং সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা লক্ষ করিয়া অবশেষে কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ খাঁ।


সৈয়দ আহম্মদ খাঁ

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ দিল্লী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষ মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়া মুঘল বাদশাহের দরবারে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। সৈয়দ আহম্মদও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকারের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ক্রমে সাবজজের পদে উন্নীত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং ইহার জন্য সরকারের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠেন। ইহার পর হইতেই তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা

আলিগড় আন্দোলন

প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলিগড়ে অ্যাঙ্গলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ অচিরেই মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের বৈষয়িক উন্নতির জন্য সৈয়দ আহম্মদ এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইহা আলিগড় আন্দোলন নামে বিখ্যাত হয়।

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ চার বৎসরের জন্য (১৮৭৮-১৮৮২ খ্রীঃ) বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আলিগড় আন্দোলনের ফলে মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইংরাজ সরকারও রাজনৈতিক কারণে মুসলমানগণের প্রতি পূর্বতন মনোভাব পরিবর্তন করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে সৈয়দ আহম্মদ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস হইতে মুসলমান সমাজকে দূরে থাকিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা হইল যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজ এখনই ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হইলে তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে। সুচতুর ইংরাজ অবশ্য আলিগড় আন্দোলনকে কংগ্রেস বিরোধী করিয়া তুলিল এবং সৈয়দ আহম্মদের শিক্ষা বিস্তার নীতিকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহার ফলে অল্পকাল পরে মুসলিমলীগের জন্ম হয়। সৈয়দ আহম্মদ প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন উদারনৈতিক মত পোষণ করিতেন। একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন "হিন্দু ও মুসলমান একটি সুন্দরী রমণীর দুইটি চক্ষুস্বরূপ। একটি চক্ষু আঘাত পাইলে অপরটিও নষ্ট হইবে।"

প্রার্থনা সমাজ ঃ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত পরিভ্রমণে বাহির হইয়া কেশবচন্দ্র বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্-এর নেতৃত্বে বোম্বাই নগরীতে একটি ধর্ম সমাজ স্থাপিত হয়। বোম্বাই নগরীর এই ধর্ম সমাজটি 'প্রার্থনা সমাজ' নামে পরিচিত হয় এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) পরিচালনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মারাঠী ব্রাহ্মণ রাণাডে পুণা এলফিন স্টোন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি সরকারী বিচার বিভাগে যোগ দেন এবং সাবজজ হইতে ক্রমে উন্নীত হইয়া বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। রাণাডে এক পুস্তিকায় 'ঈশ্বর ভক্তের বিশ্বাস' ব্যক্ত করেন। ইহাতে প্রার্থনা সমাজের আদর্শ প্রকাশিত হয়। একেশ্বরবাদ এবং সমাজ সংস্কার, এই দুই নীতির ভিত্তিতে প্রার্থনা সমাজ গঠিত হয়।

বোম্বাই এর প্রার্থনা সমাজ প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' এর অনুবর্তী ছিল। ইহার সভ্যেরা প্রতিমা পূজা সমর্থন করেন না। বেদকে অপৌরুষেয় মনে করেন না এবং অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। জাতিভেদ প্রথা বর্জন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারীশিক্ষা বিস্তার, পর্দাপ্রথা ত্যাগ এবং বাল্য বিবাহ

রোধ, প্রার্থনা সমাজের প্রধান কার্য। তবে প্রার্থনা সমাজ হিন্দুসমাজের সহিত সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করে নাই। অতীতের সহিত বর্তমানের যোগ রক্ষা করা রাণাডের সমাজ সংস্কারের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার মতে ভারতের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার আদর্শে বর্তমান সমাজকে যুগোপযোগী করিয়া গঠন করাই কর্তব্য। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উন্নতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অপরটির উন্নতি অসম্ভব।

অতীতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া সমাজ সংস্কার

মাদ্রাজের তেলেগু ভাষী অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজের আদর্শ বিস্তার লাভ করে এবং মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সিতে ইহার আঠারোটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা প্রার্থনা সমাজে প্রচলিত আছে।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রীঃ): বাঙলাদেশে যখন পৌত্তলিকতা বিরোধী ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন চলিতেছিল, তখন পশ্চিম ভারতেও অনুরূপ সমাজ ও ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। পঞ্জাবে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত মোরভি শহরে শৈবধর্মাবলম্বী সামবেদী ব্রাহ্মণ পরিবারে দয়ানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য নাম ছিল শঙ্কর। বাল্য বয়সেই তিনি প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি যোগ সাধনা করেন এবং বেদ, বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু ধর্মের মর্ম অবগত হন। তাঁহার ধারণা হয় যে, বেদে যে ধর্ম ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম এবং পৌত্তলিকতা কুসংস্কার মাত্র। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌরাণিক ধর্মকে অপসারিত করিয়া বিশুদ্ধ বেদ সম্মত হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দয়ানন্দ ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি প্রচার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ হয়। ইহার পর বৎসর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ বোম্বাই নগরীতে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় আর্যসমাজের আন্দোলন উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা ও উত্তর প্রদেশে আর্যসমাজের কেন্দ্র স্থাপিত হয়।



দয়ানন্দ সরস্বতী

আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা

দুই বৎসর পরে (১৮৭৭ খ্রীঃ) লাহোরে আর্যসমাজের ধর্মমত চূড়ান্তরূপে পরিগ্রহ করে এবং দশটি নীতি গৃহীত হয়—(১) ঈশ্বর সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস, (২) সত্য ও আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর নিরাকার এবং অনাদি ও অক্ষয়। তিনিই একমাত্র পূজনীয়,

(৩) চতুর্বেদ সকল জ্ঞানের আকর। ইহা অপৌরুষেয়। বেদ পাঠ করা প্রত্যেক আর্যের অবশ্য কর্তব্য, (৪) সর্বদা সত্যকে গ্রহণ এবং অসত্যকে বর্জন করিতে হইবে, (৫) ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া সর্বদা ধর্মসম্মত আচরণ করিতে হইবে, (৬) আর্যসমাজের সভ্যগণ সমগ্র মানবজাতির ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইবেন (৭) প্রীতি ও ন্যায় দৃষ্টিতে গুণ বিচার করিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, (৮) সকল প্রকার অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞানের প্রসার করিতে হইবে, (৯) কেবলমাত্র আত্মকল্যাণ চিন্তা না করিয়া সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে এবং (১০) ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রত্যেকেরই আচরণের স্বাধীনতা থাকিলেও জাতির সর্বাত্মক মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে।

আর্যসমাজের দশ নীতি

দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না। যে কোনও বর্ণের হিন্দু আর্যসমাজের সভ্য হইতে পারে। দয়ানন্দ হিন্দু সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যগণকে তাঁহার সমাজের সদস্য হইবার অধিকার দান করেন। যে সকল হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য দয়ানন্দ এক শুদ্ধি যজ্ঞ প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের কলেবর পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং হিন্দুর সামাজিক সংহতি দৃঢ় হয়। আর্যসমাজের সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিন হইল রবিবার। এই সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে সমাজীদের মধ্যে কোন পুরোহিত সম্প্রদায় নাই।

শুদ্ধি যজ্ঞ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬ খ্রীঃ)ঃ সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশব হইতেই এক দিব্য সাত্ত্বিক ভাব তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে কোন স্কুল বা কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াই এই মহাপুরুষ আপনার সাধন শক্তির বলে সকল ধর্ম ও সকল শাস্ত্রের সার উপলব্ধি করিয়াছিলেন।



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণের শিক্ষার বিশেষত্ব ছিল সকল ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার ধর্ম-জীবনে তিনি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুগণকে তিনি যেমন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন তেমনি ইসলাম

সর্বধর্ম সমন্বয়

ও খ্রীষ্টধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের মৌলিক ঐক্য অতি সহজ সরল কথায় বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার ধর্ম বিশ্বাসে কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। একেশ্বরবাদেও তাঁহার যেরূপ আস্থা ছিল প্রতিমা পূজাতেও তেমনি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। সকল ধর্মই যে সত্য ও ঈশ্বর লাভের সহায় ইহা নির্ধারণের জন্য তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন ধর্মের প্রণালী অনুসরণে সাধন ভজন করিয়া উপলব্ধি করেন যে 'যত মত তত পথ।'

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম দুই দিক হইতে আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছিল। খ্রীষ্টান পাদরীগণ এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মও প্রচার করিতেন। ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যাঁহারা লাভ করিতেন তাঁহারাও অনেকেই হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলির প্রতি বিরাগ বশে খ্রীষ্টান হইতে উৎসাহ লাভ করিতেন।

হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় বেশ কিছু প্রতিভাবান বাঙালী এই কারণেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। রামমোহন একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার পর হিন্দু ধর্মের উপর ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণের ধার কমিয়া যায় এবং কেশবচন্দ্রের প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করে। রামকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে অনাস্থা ও আপত্তির তীব্রতা হ্রাস পায় এবং তরুণ শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু স্বধর্ম ত্যাগে বিরত হয়। রামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতের হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি দেশবাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার উপদেশে এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের প্রচারে হিন্দু বাঙালী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল; ধর্ম সমন্বয়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত ধর্মচেতনা ভারতীয় জাতীয়ভাবের উদ্বোধনের সহায়ক হইল। জীব মাত্রকেই শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে মানুষের সেবা করাই হইল ধর্ম পালনের প্রধান অঙ্গ। মানবাভিমুখী এই মত জাতীয় সংগঠন সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায় | বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যখন চুপিসারে বণিকের মানদণ্ড ত্যাগ করিয়া রাজদণ্ড হস্তগত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল তখন তাহা স্বদেশে ও বিদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থিত কর্তৃপক্ষ এই রাজ্যস্থাপনের প্রচেষ্টাকে প্রথমে সমর্থন করে নাই। এদেশে দুর্গ নির্মাণ এবং ইংরাজ সৈন্যদল গঠন করিবার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি অপরাপর বণিকগণের প্রতিযোগিতাকে নিরস্ত করা। লর্ড ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিতে চাহিলে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আপত্তির কারণ ছিল যে জমিদারী গ্রহণ করিলে প্রজারক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার ফলে ব্যবসায়ে মনোযোগ থাকিবে না। লর্ড ক্লাইভ অবশ্য জমিদারী গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রজাশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে ইংরাজেরাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রিচার্ড বেচার নামে কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়া লিখিলেন—"কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে প্রজা সাধারণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছে, ইহার পূর্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। অতি স্বেচ্ছাচারী নবাবের আমলেও যে দেশ অতুল সুখ ও সম্পদের অধিকারী ছিল, তাহা ধ্বংসের সীমানায় পৌঁছিয়াছে।" ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা করিলেও ক্লাইভকে আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার দেশবাসীর গঞ্জনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে প্রতিক্রিয়া

ওয়ারেন হেষ্টীংস ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা স্বদেশে ও বিদেশে কাহারও সমর্থন লাভ করে নাই। বারানসীর রাজা চৈৎ সিংহ এবং অযোধ্যার মণিবেগমকে উৎপীড়ন করিয়া, রোহিলাদের উচ্ছেদের জন্য ইংরাজ সৈন্য ভাড়া দিয়া তিনি কোম্পানীর তহবিল পূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জন্য ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট তাঁহার বিচার করিয়াছিল। এ ব্যাপারে ভারতবাসীর বিরাগ অপেক্ষা ইংলণ্ডের জনমত হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কিছু কম তীব্র ছিল না।

ভারতীয় শাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই সচেতন ছিলেন। বাঙলার নবাব আলিবর্দী ইংরাজকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে দুর্গ নির্মাণের অনুমতিদানে সম্মত ছিলেন না। নবাব মীরকাশেম ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরাজের রণকৌশলে বিভক্ত, পরস্পর

বিচ্ছিন্ন, জ্ঞাতিদ্রোহে মত্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সেনাবাহিনী বারংবার পরাজিত হইলেও ইংরাজ সেনাদল শুধুমাত্র ইংলণ্ডবাসীর দ্বারা গঠিত ছিল না। কোম্পানীর সৈন্যদলের এক বৃহৎ অংশ ছিল ভারতীয় সিপাহী, ইহাদের শক্তি সামর্থ্যের দ্বারাই ইংরাজ সেনাপতির বিক্রম প্রকাশ পাইত। এই সকল সিপাহীদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজের স্বার্থপরতা লক্ষ করিত; খাস ইংরাজ সৈন্য এবং ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণ বৃটিশ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সিপাহীগণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত। এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীগণ মধ্যে মধ্যে বিক্ষোভ প্রকাশ করিত। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলীতে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশের ব্যারাকপুরে এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ছোটনাগপুরে স্থানীয়ভাবে সিপাহীগণ বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় জনসম্প্রদায়ও ইংরাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশের চব্বিশ পরগণায় তীতুমীর ও তাহার শিষ্যসম্প্রদায়, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মালাবারের মোপলা নামে মুসলিম সম্প্রদায় এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশের সাঁওতালগণ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ নিতান্ত স্থানীয় এবং বিচ্ছিন্ন ও সুযোগ্য নেতৃত্ব-বিহীন হওয়ায় ইংরাজশক্তিকে বিশেষ বিচলিত করিতে পারে নাই। ইংরাজ অনায়াসেই ইহাদের দমন করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া বিক্ষোভ দানা বাঁধিতেছিল। এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' রূপে প্রকাশ পাইল।

বৃটিশ শাসনের বিরোধিতা

বিক্ষোভের কারণঃ লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড হেষ্টিং এবং লর্ড ডালহৌসীর কার্যকলাপের মধ্যে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ভারতবাসীর চক্ষে নিরাবরণ হইয়া দেখা দেয়। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারত অধিকার করিবে। বাঙলা এবং অযোধ্যার নবাবের পরিণাম, পেশোয়ার প্রতি ইংরাজের ব্যবহার, টিপু সুলতানের বিনাশ এবং সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকার প্রভৃতি মারাঠাশক্তির বিপর্যয় দেখিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গ সকলেই ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সময় মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ইংরাজ তাহাদের নামমাত্র স্বাধীনতার অস্তিত্বও রক্ষা করিবে না। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক স্বত্ববিলোপ নীতির কঠোর প্রয়োগ দেশীয় রাজ্যের শাসক ও ভাবী উত্তরাধিকারিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক

কোম্পানী প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে পুরাতন, জায়গীরদার বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের তালুকদার ও এই শ্রেণীর ভারতীয় ভূম্যধিকারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি একের পর এক বিলুপ্ত অথবা হ্রস্বায়তন হইবার ফলে সেই সকল রাজ্যে বহু সেনানী এবং সৈন্যদলের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু যুদ্ধ ব্যবসায়ী কর্মচ্যুত হয়। অযোধ্যা প্রদেশে এইরূপে

অর্থনৈতিক

কর্মচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যাধিক্যের জন্যই অযোধ্যার বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। যে সকল দেশীয় রাজ্যের শাসক ইংরাজের অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করিয়া ক্রমে ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া তাঁহাদের রাজ্যের শাসনভার ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ক্রমশ তাহাদের বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে থাকায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন। কর্মচ্যুত সৈনিক এবং বৃত্তির অর্থ হইতে বঞ্চিত রাজন্যবর্গ নিজেদের স্বার্থেই বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে আগ্রহী হন।

ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ইংরাজগণ ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধ হয়। ১৮০২ খ্রীঃ রাজপুতানা, গুজরাট এবং পশ্চিম ভারতে প্রচলিত কন্যা সন্তান হত্যার প্রথা আইনের সাহায্যে নিবারিত হয়।

সামাজিক

১৮১২, ১৮১৫ এবং ১৮১৭ খ্রীঃ শিশু, বিধবা, সন্তান-সম্ভবা বিধবা এবং দুগ্ধপোষ্য সন্তানের জননী এমন বিধবাকে দাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ১৮২৯ খ্রীঃ আইন করা হয় যে সতীদাহের নামে কোন বিধবাকেই দাহ করা যাইবে না। ১৮৪৩ খ্রীঃ দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৮৪৭ খ্রীঃ বাঙলা দেশের কোল, উড়িষ্যার খন্দজাতি এবং অন্যান্য অঞ্চলে আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে চাষের সময় যে নরবলিদানের প্রথা ছিল তাহা নিষিদ্ধ করা হয়। এই সকল নিষেধমূলক আইন প্রবর্তন ব্যতীত বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন, ধর্মত্যাগিগণের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার দান, ইংরাজ শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার প্রভৃতি কারণে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ বহু ভারতীয় ধর্মনাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে। ওহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমানগণের মনে ইংরাজের প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়। অযোধ্যার নবাবকে রাজ্যচ্যুত করায় অযোধ্যার মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়। পেশোয়ার দত্তক পুত্রের বৃত্তি লোপ করায় হিন্দুদের মনে বৈরিভাব সৃষ্টি হয়। লর্ড ডালহৌসী দিল্লীর মুঘল বাদশাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে দিল্লী প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প প্রকাশ করায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভারতবাসী নিজেদের অপমানিত মনে করে।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ১৮৫৪ খ্রীঃ ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ভারতীয় সৈন্যদলকে বিদেশে প্রেরণের চেষ্টা করা হইলে সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হয়। লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন হইলে ভারতীয় সিপাহীকে বিদেশে যাইতেই হইবে। তখন ইংরাজ কোম্পানীর সৈন্য বাহিনীতে বহু উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু সিপাহী ছিল। হিন্দুর পক্ষে তখন সামাজিক বিধানে সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতি নাশ হইত। অতএব জাতিনাশের আশঙ্কায় হিন্দু সিপাহীগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময় বন্দুকের জন্য একপ্রকার নূতন টোটা দেওয়া হয়। এই টোটা বন্দুকে ব্যবহারের পূর্বে দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। সৈন্যদের মধ্যে গুজব প্রচারিত হইল যে এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। সুতরাং ইহাতে মুখ দিলে হিন্দু ও মুসলমান

মুখ্য কারণ:
ধর্মনাশের আতঙ্ক

সকলেরই জাতি যাইবে। সিপাহীরা ঐ টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ করিল।

সিপাহী বিদ্রোহ ও বিস্তার: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাঙলাদেশের বহরমপুর এবং ব্যারাকপুর সৈন্যাবাসে বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। ব্যারাকপুরে

সূত্রপাত

সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে আদেশ অমান্য ও একজন ইংরাজ সেনানীকে আহত করে। মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি দিয়া এবং তাহার সহযোগী সিপাহীগণকে নিরস্ত্র করিয়া বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়িল। মে মাসে মীরাট সৈন্যাবাসে বিদ্রোহ দেখা দিল। সিপাহীগণ বহু ইউরোপীয় সেনানী ও কর্মচারীকে হত্যা করিয়া, তাহাদের বাসস্থান ভস্মসাৎ করিয়া সৈন্যাবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা অগ্রসর হইয়া দিল্লী অধিকার করিল এবং অনেক ইংরাজকে হত্যা করিয়া তাহাদের আবাস ধ্বংস করিল। বিজয়োন্মত্ত সিপাহীগণ মুঘলবংশীয় দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল।



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাবের পরিষদ আহম্মদ উল্লা, আজিম উল্লা, বৃত্তি-বঞ্চিত নানা সাহেব, মারাঠা সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের রাজপুত নায়ক কুয়ঁার সিংহ, মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরুজ শাহ প্রভৃতি সুযোগ বুঝিয়া

বিদ্রোহের নায়ক

বিভিন্ন অঞ্চলেও বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নানা সাহেব এবং আজিম উল্লা খাঁ-এর চেষ্টায় বিদ্রোহ সর্বভারতীয় ও ব্যাপক আকার ধারণ করিল। তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 'চাপাটি' প্রেরণ করিয়া বিদ্রোহের স্বপক্ষে সংগঠন সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে গ্রাম চাপাটি গ্রহণ করিল তাহারা পরোক্ষে বিদ্রোহের সময় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।

বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিবার এক মাসের মধ্যেই



তাঁতিয়া টোপি

সিপাহী বিদ্রোহ উত্তরপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড এবং মধ্য-ভারতের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইল।

বিদ্রোহ বিস্তার

কানপুর, ঝাঁসী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং বেরিলী বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হইল। কানপুরে নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ এখানে বহু ইংরাজকে হত্যা করিল। বেরিলীর সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া প্রাক্তন রোহিলা নায়ক হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। ঝাঁসী রাজ্যের সিপাহীগণ স্থানীয় ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। ঝাঁসীর রাণী তেইশ বৎসর বয়স্কা বিধবা লক্ষ্মীবাঈ তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁতিয়া টোপী বিশ হাজার বিদ্রোহী সিপাহীর পরিচালক হইয়া এলাহাবাদ অধিকার করিলেন। লখ্‌নৌতে বিদ্রোহী-গণের আক্রমণে ইংরাজ চীফ কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স নিহত হইলেন।



রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহ দমন ঃ সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য বড়লাট লর্ড ক্যানিং সামরিক আইন জারী করিলেন। আম্বালা সৈন্যাবাস হইতে ইংরাজ বাহিনী অগ্রসর হইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পঞ্জাব হইতে বহু শিখ সৈন্য আসিয়া যোগ দিলে ইংরাজ সেনানায়ক জন নিকলসন দিল্লী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর কাশ্মীর ফটক তোপে ধ্বংস করিয়া ইংরাজ সৈন্য সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বন্দী করিল। বাহাদুর শাহের পুত্র এবং পৌত্র আত্মসমর্পণ করিলেও যুদ্ধের নীতি লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজ সেনাপতি হাডসন তাঁহাদের স্বহস্তে হত্যা করিলেন।

কলিকাতা হইতে আর একদল ইংরাজ সৈন্য অগ্রসর হইয়া এলাহাবাদ অধিকার করিল। এই সৈন্যদলের নেতা নীল সাহেব নিরীহ গ্রামবাসীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। নেপালের মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার গুর্খা সৈন্য লইয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহী সিপাহীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং ইংরাজগণ লখ্‌নৌ পুনরধিকার করিল। ইংরাজ সেনাপতি কলিন ক্যাম্পবেল বেরিলী পুনরুদ্ধার করিলেন (মার্চ ১৮৫৮ খ্রীঃ)।

তাঁতিয়া টোপী ইতিমধ্যে ইংরাজ-পক্ষভুক্ত সিন্ধিয়ার নিকট হইতে গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি হিউ রোজ ঝাঁসী আক্রমণ করিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষ বেশে সৈন্য পরিচালনা করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ইংরাজ বাহিনী ঝাঁসী এবং গোয়ালিয়র

অধিকার করিল তাঁতিয়া টোপী আরও কিছুকাল সংগ্রাম করিলেন। অবশেষে তাঁহার এক অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বন্দী হইলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ফাঁসী দিয়া হত্যা করিল। নানা সাহেব ইংরাজ সেনাপতি হ্যাভলকের নিকট পরাজিত হইয়া নেপালের অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সিপাহী বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটিল। লর্ড ক্যানিং সমগ্র ভারতে শান্তি ঘোষণা করিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ ঃ সিপাহীগণের অভ্যুত্থান পূর্ব পরিকল্পিত বা সুচিন্তিত ছিল না। এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক সংগঠন ছিলনা। বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ প্রথমদিকে কেবলমাত্র কোম্পানীর সিপাহীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র তাহাই নহে। বিদ্রোহ প্রধানতঃ বেঙ্গল আর্মির সিপাহীগণই করিয়াছিল। মাদ্রাজ এবং বোম্বাইএর সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য জাতীয় আন্দোলন রূপে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। বেঙ্গল আর্মির উচ্চবর্ণ হিন্দু সিপাহীগণ মুখ্যতঃ জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরাজদের দুর্দশার কথা শুনিয়া এই সকল সিপাহীর মনে ইংরাজদের সাহস ও বীরত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা রীতিমত হ্রাস পাইয়াছিল। ভারতে খাস ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা বিশেষ কম থাকার জন্য ভারতীয় বিদ্রোহী সিপাহীগণ সহজেই জয়লাভের আশা করিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্রোহের পরিধি সঙ্কীর্ণ

দেশের বৃহৎ অংশে জনসাধারণের সহিত সিপাহীযুদ্ধের কার্যতঃ কোন সংস্রব বা সম্পর্ক ছিল না। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বা দাক্ষিণাত্যে ইংরাজরাজ্যের কোন অংশে এই বিদ্রোহের প্রভাব আদৌ বিস্তৃত হয় নাই। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মাত্র মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রকাশ ক্ষীণভাবে দেখা গিয়াছিল। হায়দরাবাদের নিজাম, মারাঠা নায়ক সিন্ধিয়া, পঞ্জাবের শিখশক্তি, কাশ্মীরের অধিকর্তা গুলাব সিংহ, নেপালের গুর্খাগণ এই বিদ্রোহের সমর্থন না করিয়া বরং ইংরাজপক্ষকে সক্রিয় সাহায্য দান করিয়াছিল। প্রধানত শিখ এবং গুর্খা সৈন্যের সাহায্যেই ইংরাজ সিপাহীযুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙলা দেশে সিপাহীযুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় বা জনসাধারণ কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ বা সমর্থন সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং মধ্য ভারতের কোন কোন অংশে সিপাহীগণ কিঞ্চিৎ প্রাথমিক এবং সাময়িক সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

সিপাহীগণ দিল্লী অধিকার করিয়া বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিবার পর সিপাহীযুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণী যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কোম্পানীর সিপাহী ব্যতীত উত্তর প্রদেশ ও মধ্য ভারতের এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলের জনসাধারণ এই যুদ্ধে যোগদান করে। অযোধ্যা অঞ্চলে এই যুদ্ধ অনেকটা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের রূপ

পরিগ্রহ করিয়াছিল। অযোধ্যার তালুকদারগণ এবং সাধারণ প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া বহুদিন পর্যন্ত বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং কেহ কেহ ইংরাজগণের অন্যায় উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এইসকল ব্যক্তির মধ্যে বিহার প্রদেশের আরাজেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের তালুকদার কুয়ঁার সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুদিন যাবৎ অসীম সাহসের সহিত ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিপাহীযুদ্ধ প্রায় একবৎসর স্থায়ী হইয়াছিল এবং যুদ্ধ একাধিক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্থানীয় কোন নায়কের রাজ্যাধিকার স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। এই কারণে অনেকে সিপাহী বিদ্রোহকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের মর্যাদা দানের পক্ষপাতী। আবার অনেকের মতে সিপাহীযুদ্ধকে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবদানের কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। তাঁহাদের মতে, এই বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত সমাজ-রীতির আত্মরক্ষার চেষ্টার মধ্যে। ইহার মূলে ছিল ধর্মান্ধতা এবং সমগ্র আন্দোলনে সামন্ততন্ত্রের ও সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রাধান্য ছিল। ভারতবর্ষে তখনও জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয় নাই। বিদ্রোহী নায়কগণের মধ্যেও কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা আদর্শবাদ ছিল না। এই যুদ্ধ ভারতে আধুনিক যুগ প্রবর্তনের মুখে মধ্যযুগের আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা মাত্র। যাহাই হউক, সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার স্মৃতি পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট প্রেরণা জোগাইয়াছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ নানা কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রথমতঃ একমাত্র অযোধ্যা ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলে ইহা জাতীয় বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বৃহত্তর ভারতের জনসাধারণের সহিত এই বিদ্রোহের আন্তরিক যোগ ছিল না। একমাত্র ঝাঁসী ব্যতীত অন্য সকল দেশীয় রাজ্য ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। গোয়ালিয়রের মন্ত্রী দিনকর রাও, নিজামের মন্ত্রী সালার জঙ্গ, নেপালের মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর সিপাহী বিদ্রোহ দমনে ইংরাজপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দিল্লীতে সমবেত সিপাহীগণ বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করায় পঞ্জাবের শিখগণ মুঘল বাদশাহীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় ইংরাজ পক্ষে যোগ দিয়াছিল মুঘল বাদশাহগণ শিখগুরু এবং শিখ ধর্মাবলম্বীগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন শিখেরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। শিখ সৈন্যের সহায়তায় ইংরাজগণ দিল্লী পুনরধিকার করিয়া বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনে বঞ্চিত থাকিয়া ইংরাজ কোম্পানী এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা বিদ্রোহী সিপাহীগণের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

দেশবাসীর সমর্থনের অভাব

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বিদ্রোহী নায়ক এবং সিপাহী দলের মধ্যে একযোগে কার্য করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সিপাহীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে পরস্পরের মধ্যে কোন যোগাযোগ রক্ষা না করিয়াই বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা সংগঠন ছিল না। সংহতি সাধনের অভাবে তাহাদের সম্মিলিত শক্তি কখনই একযোগে ইংরাজদের বিরুদ্ধে কার্যকর হয় নাই। বহু নায়কের উপস্থিতিতে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সিপাহীগণের সকল বীরত্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তাঁতিয়া টোপী এবং রাণী লক্ষ্মীবাঈ সাহসী হইলেও ইংরাজ সেনাপতিগণের ন্যায় অভিজ্ঞ বা সমর কুশলী ছিলেন না। সিপাহীগণের বিভিন্ন দলের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিভিন্ন ধরণের ছিল। ইংরাজগণের ন্যায় তাহাদের লক্ষ একমুখী ছিল না।

বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম

তৃতীয়তঃ বিদ্রোহী সিপাহীগণের উপযুক্ত সমরোপকরণের অভাব ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রের বিদ্রোহীগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, সংবাদ আদান প্রদান এবং রসদ সরবরাহের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। অপরপক্ষে রেল ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যাতায়াত ও যোগাযোগের দ্রুত ব্যবস্থা ইংরাজগণকে যুদ্ধজয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সিপাহীগণের অস্ত্রশস্ত্র বা সামরিক সম্ভার ইংরাজপক্ষের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর এবং নিকৃষ্ট ধরণের ছিল।

উপযুক্ত সমরোপ-করণের অভাব

বিদ্রোহের ফলাফলঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরিণামে ভারতে মুঘল রাজবংশের শেষ প্রতিভূ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ বন্দী হইয়া সুদূর রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৮৬২ খ্রীঃ) ভারতের মুঘল রাজবংশের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিল। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের ও অবসান হইল। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের নেতৃবৃন্দ স্থির করিলেন যে ভারতের ন্যায় এরূপ একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য কোন বণিক কোম্পানীর শাসনাধীনে রাখা আর সঙ্গত বা সমীচীন হইবে না। পার্লামেণ্টে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন গৃহীত হইল। এই আইন বলে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক সমিতি এবং নিয়ামক পরিষদ ভারতশাসন ব্যাপারে যে ক্ষমতা ভোগ করিতেন তাহা এখন একজন বৃটিশ মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইল। এই মন্ত্রী ভারত সচিব নামে পরিচিত হইলেন। কোম্পানীর পরিচালক সমিতির স্থান পার্লামেণ্ট নিযুক্ত ভারত-পরিষদ গ্রহণ করিল। ভারতের বড়লাট বা গভর্ণর জেনারেলের উপাধি হইল 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি।

কোম্পানীর শাসনের অবসান

ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করা হইল। বাহিনীতে খাস ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। কামানগুলির ভার কেবলমাত্র ইউরোপীয় সৈন্যগণের হস্তে অর্পণ করা হইল, যেন ভবিষ্যতে বিদ্রোহ করিলেও ভারতীয় সিপাহীগণের অস্ত্রশক্তি সীমাবদ্ধ এবং নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকে। সিপাহীগণের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবন্ধন জন্মাইতে বা দৃঢ় হইতে না

পারে, তাহার জন্য সকল জাতি ও বর্ণের এবং সকল শ্রেণীর লোকের সংমিশ্রণে এক একটি সৈন্যদলকে গঠন করা হইল।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র: নূতন ব্যবস্থা অনুসারে এলাহাবাদে একটি দরবার আহ্বান করিয়া ইংলণ্ডের মহারাণী ভিকটোরিয়াকে "ভারতেশ্বরী" বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারাণী স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। যে সকল কারণে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সকল কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা পত্রে বলা হইল—বৃটিশ সরকার ভারতে আর নূতন কোন রাজ্যজয় করিয়া বর্তমান রাজ্যের সীমা প্রসার করিবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত যে সকল সন্ধি, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল, বৃটিশ সরকার তাহা পালন করিবে এবং দেশীয় নৃপতিগণের বৃত্তি ও সম্মান রক্ষা করিবে। ভারতীয় প্রজাগণের ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ভারতীয় সমাজের প্রাচীন নিয়ম, রীতি-নীতি ও প্রথাসমূহের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া উপযুক্ত সকল ভারতবাসীকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। বিদ্রোহী সিপাহীগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ পদে যোগ দিলে মহারাণী তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কেবলমাত্র যাহারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিল বা যাহারা ইংরাজ নরনারী হত্যায় লিপ্ত ছিল, তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ডদান করা হইবে।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

এই ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী আশ্বস্ত হইল। বৃটিশ সরকারের নমনীয় শাসনরীতি ভারতে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হইল।

নবযুগের দ্বারে উপনীত ভারত: সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম না করিলে ভারতবর্ষের মুক্তিসাধন অসম্ভব, ইহা প্রমাণিত হইল। লর্ড ক্যানিং এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, 'এই বিদ্রোহে সিন্ধিয়া এবং নিজাম যোগ দিলে ইংরাজকে ভারত ত্যাগ করিতে হইত'। ইহাও স্পষ্ট হইল যে বর্তমান অবস্থায় অস্ত্রবলের সাহায্যে ভারত হইতে বিদেশী শাসন অপসারণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং শিক্ষিত ভারতবাসী ইংলণ্ডের আদর্শে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইলেন। ভারতে এক নব জাতীয়তাবাদের সূচনা হইল।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

প্রথম অধ্যায়

১। ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য জনগণের স্বভাব ও রাজনীতিকে কিভাবে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বুঝাইয়া বল।

২। ভারতের জনসমষ্টি কাহাদের দ্বারা গঠিত? ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্টির পরিচয় দাও।

৩। 'ভারতবাসীগণের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান'—এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও মুদ্রার গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

১। সিন্ধু সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত নগরীগুলির নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

৩। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার অধিবাসিগণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও ধর্ম-কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। এই সভ্যতার বিস্তৃতি কতদূর ছিল?

৫। সিন্ধুসভ্যতার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সম্পর্ক ছিল কি? এ বিষয়ে যাহা জান লিখ।

৬। সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কাহারা? আলোচনা কর।

৭। আর্যগণের ভারতে আগমন ও প্রসার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

১। জৈনধর্মের উৎপত্তির বিবরণ দাও। তীর্থঙ্কর কাহাদের বলে? তাঁহাদের প্রধান উপদেশ কি?

২। গৌতম বুদ্ধের ধর্মোপদেশ কি ছিল? তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা কর।

৩। জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের তুলনা মূলক আলোচনা কর।

৪। জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাসের কারণ নির্ণয় কর।

৫। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৬। টীকা লিখ—চাতুর্যাম, আর্যসত্য, অষ্ট মার্গ, ত্রিপিটক।

পঞ্চম অধ্যায়

১। প্রাচীন যুগে কোন কোন বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান করিয়াছিল ?
২। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও এবং উহার ফলাফল আলোচনা কর।
৩। ভারতের কুষাণ শাসকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ রাজা কে ছিলেন ?
৪। ভারতে পারসিক অভিযান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৫। ভারতে হূন আক্রমণের বিবরণ দাও। কাহারা হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করেন ?
৬। বাহ্লীক গ্রীক কাহাদের বলে ? ভারতের বাহ্লীক গ্রীকগণের বিষয়ে যাহা জান লিখ।
৭। ভারতের শক রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
৮। টীকা লিখ—মিনান্দার, গন্দোফারনেস, রুদ্রদামন।
৯। ভারতে বিদেশী জাতির অভিযানের ফলাফল বর্ণনা কর।
১০। রাজপুতগণের উদ্ভব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
১১। টীকা লিখ—গান্ধার শিল্প, বৌদ্ধ সঙ্গীতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বিম্বিসার হইতে মৌর্যবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মগধের ইতিহাস বর্ণনা কর।
২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরন দাও। তাঁহার সহিত গ্রীকগণের কি সম্পর্ক ছিল ?
৩। অশোকের রাজত্বকালের প্রধান সামরিক ঘটনা কি ? এই ঘটনা দ্বারা অশোকের রাজ্যশাসন নীতি কিরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল ?
৪। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ?
৫। সমুদ্র গুপ্তের কৃতিত্বের বিবরণ দাও।
৬। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
৭। গুপ্তযুগের শাসন প্রণালী বর্ণনা কর।
৮। টীকা লিখ :—রামগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, নবরত্ন সভা।
৯। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
১০। কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া সাম্রাজ্য গঠনের যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১১। প্রতিহার রাজ মিহির ভোজ এবং প্রথম মহেন্দ্রপাল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
১২। শশাঙ্ক কে ছিলেন ? তাঁহার রাজত্ব ও কৃতিত্ব বিষয়ে কি জান।

১৩। ধর্মপাল ও দেবপালের কৃতিত্বের বিবরণ দাও।
১৪। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

১। মৌর্যযুগের শিল্প সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।
২। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিচয় দাও।
৩। গুপ্তযুগে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল ?
৪। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিবরণ দাও।
৫। প্রাচীনযুগে দক্ষিণভারতে স্থাপত্য ও শিল্পকলার যে উন্নতি হইয়াছিল দৃষ্টান্ত উল্লেখসহ তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। কুষাণ এবং গুপ্তযুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং তাঁহাদের রচনার নাম কর।
৭। টীকা লিখ—অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নায়নার ও আলওয়ার।

অষ্টম অধ্যায়

১। আর্য ও বৌদ্ধযুগে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। চম্পা ও কম্বোজ রাজ্যের বিষয়ে যাহা জান লিখ।
৩। শৈলেন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনা কর।
৪। টীকা লিখ—আঙ্কোরভাট, বরবুদুর।

নবম অধ্যায়

১। গজনী ও ঘোর বংশীয় সুলতানগণের উত্তর ভারতে অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। দাস গোষ্ঠির সুলতান কাহাদের বলা হয়। তাহাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ?
৩। আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। পাগলা রাজা কাহাকে বলা হইত ? তাঁহার সম্পর্কে কি জান ?
৫। টীকা লিখ—সুলতানা রজিয়া, আমীর খসরু, অলবিরুণী
৬। ভারতে মুঘল অধিকার কে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ?
৭। ভারতের ইতিহাসে ১৫২৬-২৭ এবং ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ কেন গুরুত্বপূর্ণ তাহা বুঝাইয়া বল।
৮। আকবরের রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর এবং রেখামানচিত্রের সাহায্যে তাঁহার সাম্রাজ্যের আয়তন দেখাও ?
৯। ঔরঙ্গজীব কিভাবে বাদশাহ হইয়াছিলেন ?

১০। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

১১। টীকা লিখ—বৈরাম খাঁ, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, আবুলফজল, মানসিংহ, নূরজাহান, দারা শিকো, হলদিঘাটের যুদ্ধ।

দশম অধ্যায়

১। ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু সমাজে উহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল?

২। দিল্লীর সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমানগণের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। মুঘল শাসনকালে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের কিছু বিবরণ দাও।

৪। সুলতানী আমলের প্রাদেশিক ও ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিষয় কি জান লিখ।

৫। সুলতানীযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখ কর।

৬। মুসলমান আমলের প্রথমভাগে আবির্ভূত কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্যের নাম কর এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। টীকা লিখ—সুফী মতবাদ, মীনহাজ, উর্দু ভাষা, কুতুবমিনার।

৮। মুসলমানযুগের সঙ্গীত ও চিত্রকলা বিষয়ে যাহা জান লিখ।

৯। মুঘলযুগের স্থাপত্য শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০। টীকা লিখ—তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, লালকেল্লা।

১১। মুঘলযুগে প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

একাদশ অধ্যায়

১। ইতিহাসে শিবাজীর নাম বিখ্যাত কেন? তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির বিকাশের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। পেশোয়া কাহার নাম? প্রথম তিনজন পেশোয়ার কীর্তি বর্ণনা কর।

৩। ভারতের ইতিহাসে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও।

৪। টীকা লিখ—সলবাই-এর সন্ধি, নানা ফড়নবীশ, মারাঠায় পঞ্চরাজ্য, চৌথ ও সরদেশমুখী, তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ।

৫। শিখশক্তির অভ্যুদয়ের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৬। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের কৃতিত্বের বিবরণ দাও।

৭। টীকা লিখ—খালসা, অমৃতসরের সন্ধি, রাণী ঝিন্দন, গুলাব সিং।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। ভারতে ইউরোপীয় বণিকগণের আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

২। ভারতে ইংরাজ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি ধারাবাহিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। টীকা লিখ—বন্দিবাসের যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ, ডুপ্লে, রবার্ট ক্লাইভ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। ভারতে বৃটিশ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের কৃতিত্ব বিষয়ে যাহা জান লিখ।

২। লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালে ইংরাজ রাজত্ব কিভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার বিবরণ দাও।

৩। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ব্যাখ্যা কর। কে ইহা প্রবর্তন করিয়াছিলেন ?

৪। লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে ভারতে ইংরাজ অধিকার কিভাবে কতদূর বিস্তৃত হয় ?

৫। লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ব্যাখ্যা কর।

৬। টীকা লিখ—টিপু সুলতান, ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, স্বত্ব-লোপ নীতি।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসন সংস্কারের বিবরণ দাও।

২। লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন প্রবর্তন করেন ?

৩। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে ভারতে যে সমাজ সংস্কার হইয়াছিল তাহার উল্লেখ কর।

৪। ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য লর্ড ডালহৌসীর আমলে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল ?

৫। লর্ড রিপনের আমলে যে সকল আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার হয়, তাহার বিবরণ দাও।

৬। টীকা লিখ—পাঁচশালা বন্দোবস্ত, কর্ণওয়ালিশের আমলে বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

৭। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার বিবরণ দাও।

৮। ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? ব্রাহ্ম সমাজের দুইজন প্রসিদ্ধ নেতার নাম কর এবং তাঁহাদের কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা কর।

৯। ডিরোজিও কে ছিলেন ? বাঙলাদেশের যুবমনে তিনি কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ?

১০। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সৈয়দ আহম্মদ কি করিয়াছিলেন ? উহার ফল কি হইয়াছিল ?

১১। প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? তাঁহার বিষয়ে কি জান ?

১২। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? কি উদ্দেশ্যে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়? আর্য সমাজের আদর্শ কি?

১৩ শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম মত কি ছিল? তাঁহার আবির্ভাবে হিন্দু সমাজ কি ভাবে উপকৃত হইয়াছিল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী যুদ্ধের কারণ ও উহার ফলাফল বিচার কর।

২। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতিও পরিণাম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। টীকা লিখ—নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ, তাঁতিয়া টোপী, কুয়ঁার সিংহ, মহারাণীর ঘোষণা পত্র।